কল্লোল

বর্ষসূচী ।

সন ১৩৩৩ সাল

চতুর্থ বর্ষ

NATIONAL LIBRARY CALCUTTA 27673

বর্ষসূচি

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

উদ্বোধন

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
এসেছে নিষ্ঠুর;
হোক্‌রে দ্বারের বন্ধ দূর
হোক্‌রে মদের পাত্র চূর!
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধর তার পাণি ;—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্তবাণী!
ওরে যাত্রী
গেচে কেটে, যাক্‌ কেটে পুরাতন রাত্রি!

---

* রবীন্দ্রনাথের এই পুরাতন কবিতাটি কল্লোলের নববর্ষের যাত্রায় উদ্বোধনরূপে প্রকাশ করা হ'ল।—সম্পাদক।

জীবন-নাট্য

[শ্রীসত্যভূষণ সেন]

(গল্প)

তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ বেলুচিস্তানের এক পল্লীপ্রান্তে, শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত উন্মুক্ত নীলাম্বরতলে। বেলুচিস্তানের এই অংশে মরুভূমির উষর দৃশ্য যেন শ্যামবনরাজির স্নিগ্ধতায় আসিয়া বিলীন হইয়াছে, অসীম যেন সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, রুদ্র আসিয়া পাণ্ডু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

কয়েক দিন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের দরুণ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সকলেই একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। সন্ধ্যায় শিবির সন্নিবেশ হইলে দলপতি হুকুম দিলেন যে, পরদিনও এইখানেই বিশ্রাম। সামরিক অভিযানে পদব্রজে পথ পর্য্যটন খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়, কিন্তু তপ্ত মরুপথে বাত্যার দুর্য্যোগ এবং বাত্যা বিতাড়িত বালুকারাশির বিরুদ্ধাচরণে যে অবস্থাটা হয়, তাহাকে ঠিক উপভোগ্য বলা চলে না। কাজেই দলপতির আদেশের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে সিক্ত হইয়া সে-দিনকার সন্ধ্যার অবসরটায় যেন একটু আরামের আস্বাদ লাভ হইল।

পরদিন প্রভাতে একাকী তাঁবুর বাহিরে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে অবসরের আরাম উপভোগ করিতেছি। এখানে আর বাত্যাবিক্ষোভ নাই; প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি যেন আমরা দূর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। একদিকে তরঙ্গায়িত ভূপৃষ্ঠে মরুবালুকার সীমাহীন বিস্তার এবং তাহারই সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কঠিন পাষাণময় মরুপর্ব্বতের উষর দৃশ্য দিগন্ত বিসর্পিত; অপর দিকে নীল গিরিশ্রেণীর উপরে স্নিগ্ধচ্ছায়া ঘনশ্যাম বনবিটপীর আভাস এবং তাহারই আশ্রয়ে সংসারের শত কর্ম্মকোলাহল মুখরিত লোকনিবাস। ইহারই মধ্য দিয়া একটি পার্ব্বত্য জলস্রোত বহিয়া আসিয়া বেলুচিস্তানের প্রাকৃতিক ধারার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কোথায় সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার সমতলভূমি; তারপরে উত্তর-ভারতের শুষ্কপ্রদেশ, তারপরে রাজপুতানার মরুপ্রান্তর, তারপরে মরুপর্ব্বতের সমন্বয়ভূমি বেলুচিস্তানের এই দৃশ্য বৈচিত্র্য; ইহার পরেই বা কোথায় যাইতে হইবে কে জানে?

এমন সময় বন্ধু জানচাঁদ নিজ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্ভাষণ করিলেন, কি সেন-সাহেব, কি হচ্ছে?

আমিও নিজ চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া জবাব দিলাম,—

All the world's a stage;
Men and women are merely players,
They have their exits and their entrances.

সে কি! তুমি ডাক্তার মানুষ, তোমার এরূপ মতিভ্রম হ'লে চল্‌বে কেন?

মতিভ্রমেরও মাত্রাজ্ঞান আছে হে। যখন ডাক্তারি করি তখন জীবনটাকে জীবন-হিসাবেই গণ্য করি এবং তা রক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করি।

পাগলেরও আবার ষ-ত্ব ণ-ত্ব জ্ঞান থাকে নাকি—A method in madness?

কিন্তু জীবনটা যদি ডাক্তারির বাইরে চলে যায় তখন যেন জীবন-নাট্যের রঙ্গমঞ্চে এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয়—

সে আবার কি?

জান ত "পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকা গৃহ আর এক দৃশ্য শ্মশান"।

তার মানে?

তার মানে—They have their exits and their entrances.

তা থাক্। তোমার রঙ্গমঞ্চে চা-পান নিষেধ নয় আশা করি। এই বলিয়া তিনি খানসামাকে ডাকিয়া চায়ের হুকুম দিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, চা পান আপাতত স্থগিত রাখ্‌তে হচ্ছে।

জ্ঞানচাঁদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম যে, দূরে একখানা হাওয়া গাড়ী আসিতেছে।

জ্ঞানচাঁদ ছিলেন আমাদের মেসের ম্যানেজার। আমাদের নিয়ম ছিল যে, যদি কোন অতিথি আগন্তুক আসিয়া হাজির হন, সেই অবসরে ছুটির দিনের অজুহাতে আমরা যথা সম্ভব বিলম্ব করিয়াই চা-পান করিতাম। আজ অমনি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; হাওয়া-গাড়ী দেখিয়া আরও একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

জ্ঞানচাঁদ বাইনকিউলারে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওহে, আজকে তোমার রঙ্গমঞ্চে একজন মহিলার প্রবেশ।

আমি বলিলাম, ম্যানেজার হ'লে তুমি, আর রঙ্গমঞ্চ হল আমার!

জ্ঞানচাঁদ জবাবে বলিলেন, ম্যানেজার আমি তা' স্বীকার করি, কিন্তু আমি বাপু, ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক। আকাশ প্রান্তর, গাছ পাহাড় আর এই চায়ের টেবিল পর্য্যন্ত সবই আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট; স্বপ্ন, মায়া, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য— এ-সব আমার ধাতে নাই।

দেখিতে দেখিতে হাওয়া-গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিলেন রেড ক্রশের পোষাক পরিহিতা এক তরুণী। তাঁহার পরিচ্ছদের বেনামীতেও তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া চিনিতে আমার পক্ষে একটুও কঠিন হইল না।

চায়ের টেবিলে বসিয়া সামান্য আলাপ পরিচয় হইল মাত্র। ইনি তিন বৎসর যাবৎ রেড-ক্রশে কাজ করিতেছেন; নাম বলিলেন মিসেস্ সেন, স্বামী সামরিক বিভাগে ডাক্তারের কাজ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আর বিশেষ পরিচয় দিতে আপত্তি আছে দেখিলাম; স্বামীর নাম বলিতে গোঁড়া হিন্দু রমণীর ন্যায়ই সঙ্কোচশীলা।

আমরা সমস্তটা পথ পদব্রজে আসিয়াছি, হাওয়া-গাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই। মিসেস্ সেন আমাদের তিন দিন পরে রওনা হইয়া হাওয়া-গাড়ী পাওয়াতে একদিনেই আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানচাঁদ বলিলেন, আপনার অদৃষ্ট ভাল বলিতে হইবে! অদৃষ্টের কথায় মিসেস্ সেন যেন একটু বিশেষ ভাবে সজাগ হইয়া উঠিলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিলেন, মশায়, আমার জীবনের সামান্য একটি মাত্র ঘটনা থায় সবটার বিচার করবেন না; আমার জীবনের অধিকাংশই যে এখনও আপনার অ-দৃষ্ট সে কথা যেন ভুলবেন না।

মিসেস্ সেনের কথার ভঙ্গীতে বেশ একটু কৌতূহল জাগিয়া উঠিল, কিন্তু এরূপ অল্প পরিচয়ে কৌতূহল দমন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম; পরের কথায় অমনিই আমি থাকি না, আর এ ত একজন মহিলার কথা।

জ্ঞানচাঁদ বলিলেন, আমি অবশ্যই অতটা বিচার-বিবেচনা করি নাই। শুধু একটি মাত্র ঘটনা উপলক্ষ্য করেই কথাটা বলেছিলাম।

মিসেস্ সেন বলিলেন, এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার অদৃষ্ট আপনাদের চেয়ে ভাল; আর সুখ দুঃখের স্রোত ত জীবনে আছেই— আমাদের জীবনটা একটা নাট্য বই ত নয়, অবস্থার পরিবর্তন ত এর মধ্যে থাকবেই।

অমনি জ্ঞানচাঁদের সহিত আমার দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল; আমি বলিয়া উঠিলাম—

All the world's a stage;
Men and women are merely players,
They have their exits and their entrances.

চায়ের টেবিল হইতে উঠিবার সময় মিসেস সেন আমাকে বলিয়া গেলেন, আমি আপনার স্বদেশবাসী এবং স্বজাতি, আপনি বরং আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন; আমার নাম অঞ্জলি। নামটি খুবই পরিচিত বলিয়াই বোধ হইল, খানিকক্ষণ উহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও ইহাকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। উহার মুখের দিকে ওরূপ ভাবে তাকাইয়া থাকাতে মেয়েটি যেন বেশ একটু বিব্রত বোধ করিল বলিয়া মনে হইল।

জ্ঞানচাঁদ বলিলেন, ওহে সেন-সাহেব, আমি ত একটা কথা না বলে পারি না। তোমরা বাঙালীরা এত স্বদেশী আচারের পক্ষপাতী কিন্তু এ-সব বিলাতী নাম তোমাদের কি করে পসন্দ হয়?

আমি বলিলাম, বিলাতী নাম কোথায় পেলে?

জ্ঞানচাঁদ উত্তর করিল, ওঁর নাম বললে না—এঞ্জেলী? বোধ হয় "এঞ্জেল" শব্দের প্রকারভেদ।

আমি বলিলাম, ওহে, ওটা এঞ্জেলও নয় এঞ্জেলীও নয়,—অঞ্জলি; খাঁটি বাংলা শব্দ।

জ্ঞানচাঁদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, খাঁটি বাংলা শব্দ?

আমি বলিলাম, হাঁ, খাঁটি বাংলা শব্দ, কেন কথাটা কি একেবারেই শোন নি?

জ্ঞানচাঁদ বলিল, অঞ্জলি—অন্‌জলি—বিটাঞ্জলি—হাঁ হাঁ, ঠিক সামঝ্‌ লিয়া—এবার বুঝতে পেরেছি।

আমি বলিলাম, ছাই বুঝতে পেরেছ. ওটা বিটাঞ্জলি নয়—গীতাঞ্জলি।

এ-দিকে অঞ্জলি আসাতে আমাদের বন্ধুমহলে একটা কৌতুকের সাড়া পড়িয়া গেল, অবশ্য অঞ্জলির অগোচরে; কারণ আমাদের হাসপাতাল রেজিমেণ্টের মধ্যে আর কোন মহিলা ছিলেন না—Q. A. M. N. S.-এর* দল তখনও আসিয়া পৌছে নাই। কৌতুকের খাঁটি কারণও ছিল যথেষ্ট। আমাদের দলের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র মিষ্টার সেন এবং হঠাৎ যে মহিলাটি প্রথমে আসিয়া আমাদের দলে জুটিলেন তিনি যে বাঙালীর মেয়ে তাহা ত সকলেই দেখিলেন, তাহার উপরে আবার নামের পরিচয় দিলেন "মিসেস সেন" বলিয়া; কাজেই কৌতুকের আর অপরাধ কি? আমি ত সকলের সহিত কৌতুকটা উপভোগ করিতাম নির্ব্বিকার চিত্তেই, তবে সকলের অপেক্ষা আমার দায়িত্ব অধিক বলিয়া আমার দৃষ্টি ছিল যে কথাটা যাহাতে অঞ্জলির কানে না পৌঁছায়; কারণ আর যাহাই হউক বাঙালীর মেয়েরা এ-সব কথা খুব সহজেই বুঝিয়া ফেলে।

অঞ্জলি মেয়েটি দেখিতাম একটু যেন নির্ভরশীলা—অনেক বিষয়েই আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্ত একটু বেশী উৎসুক বলিয়া মনে হইত। অথচ যে মেয়ে গৃহস্থের গতানুগতিক পন্থা এবং আরামের নীড় ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় এরূপ কঠোর কর্ম্মজীবন বরণ করিয়া লয়, তাহার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যের ভাব পূর্ণ প্রস্ফুটিত সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার হেতু নাই; আর সে যে অভাবের তাড়নায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই তাহাও বুঝিতে পারিতাম, তাহার ব্যয়ের বহর দেখিয়া, সঙ্কোচের ভাব তাহার মধ্যে মোটেই ছিল না। নির্ভর মেয়েদের পক্ষে যেমনই নৈসর্গিক তেমনই উহাদের স্বভাবমাধুর্য্যের একটা উপকরণও বটে; আর এই মাধুর্য্যের রমণীয়তা দ্বিগুণ বিকশিত হয় যখন তাহার দীপ্তি ফুটিয়া উঠে—এরূপ স্বাতন্ত্র্যশীল একটা সমুন্নত ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া।

অঞ্জলির বিশেষ ভাবে আমার প্রতি এরূপ নির্ভরশীলতার কারণ যে, আমি তাহার স্বদেশবাসী এবং স্বজাতি তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম; পরিচয়ের প্রথম দিনেই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবার অনুরোধেই ইহার আভাষ বেশ সুস্পষ্ট ছিল। পুরুষের পক্ষেও এরূপ স্বাজাত্যানুরাগের দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতা মোটেই নাই, আমি ত ইহার পরিচয় যথেষ্টই পাইয়াছি। আমি বিদেশে আসিয়া যেখানে যেখানেই কিছুদিন স্থায়ী হইয়া বাস করিয়াছি সেখানেই কোন বাঙালী আসিলেই একবার "মিষ্টার সেনে"র খোঁজ না পড়িয়াছে এমন হয় নাই—আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া না গেলে যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গহানি ঘটিত। এক হিসাবে আমার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে ইহা খুব শ্লাঘার বিষয় হইলেও এরূপ স্বাজাত্যানুরাগ চিরদিন আমি দুর্ব্বলতার বা ক্ষীণপ্রাণতার পরিচায়ক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। আমার ভাব ছিল 'চিরকালই অন্তরূপ—যাহাকে বলে "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। বৈষ্ণব, বাঙালীত্ব, ভারতীয়ত্ব, কুলীনত্ব—এ-সব আমার নিকট অর্থহীন বলিয়াই জ্ঞান হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যাপারকে আমি বরাবরই তাহার স্বকীয় দীপ্তি দ্বারাই বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমার বন্ধুসংঘের মধ্যে যেমন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের লোকই বাদ যায় নাই, তেমনই বিদেশে আসিয়া মেস্ করিয়া থাকিবার সময়ও ইংরেজ, ফরাসী, চীনা, জাপানী, মান্দ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, শিখ, গুর্খা, উড়িয়া, বাঙালী হিন্দু মুসলমান সকলের সহিতই নির্ব্বিচারে পান ভোজন করিয়াছি। কেহ বাঙালী বলিয়া যে তাহার সহিত বিশেষ করিয়া ঘনিষ্টতা স্থাপিত হইয়াছে এমন কখনও হয় নাই; এই চিরানুগত প্রথার প্রথম ব্যতিক্রম হইল অঞ্জলির বেলায়।

* Queen Alexandra Military Nursing Service

স্বদেশে এবং বিদেশে ভদ্রপরিবারে নানা রুচি সম্পন্না বহু রমণীর সহিত মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, কাজেই রমণী জাতিকে অযথা সঙ্কোচ করিয়া চলা আমার অভ্যাস ছিল না। অবিবাহিত যুবক বলিয়া একজন তরুণ বয়স্কা বাঙালী মেয়ের সহিত সামাজিক হিসাবে যে সঙ্কোচ থাকিবার কথা, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহারও অভাব, কারণ অঞ্জলি ছিল অপরের বিবাহিতা পত্নী। আমাকে নানা প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইয়াছে বলিয়া সকলের সহিত যুক্তিযুক্ত অনুপাতে সৌজন্ম এবং সামাজিকতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার ত্রুটি প্রায় হইত না। কিন্তু অঞ্জলির বেলায় একটু ত্রুটি হইয়া পড়িল। অঞ্জলি যে এখানে আসিয়া অবধি আমার উপরে বিশেষ করিয়া একটু নির্ভর করিয়া চলিত তাহা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু প্রতিদানে তাহার সহিত একটু বেশী ঘনিষ্টতা বা সৌজন্ম প্রদর্শন করা হইয়া উঠে নাই; পথে পথে এতগুলি দিন কাটিয়া যাওয়াতে সৌজন্ম প্রদর্শনের সুযোগও হয় নাই

একদিন সে সুযোগ যেন খুব আড়ম্বর করিয়াই আসিল। আমরা এক সপ্তাহের মধ্যেই বেলুচিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পারস্যদেশের মধ্য দিয়া পথ পর্য্যটন করিতেছিলাম; আর দুই সপ্তাহ পরে আমাদের গন্তব্যস্থান পারস্যের পূর্ব্বভাগের অন্তর্গত বীরজাণ্ড্ নগরে আসিয়া উপনীত হইলাম। বীরজাণ্ড্ নগর হইলেও সমৃদ্ধির চিহ্ন এখানে কিছুমাত্র নাই; এই নগরও যেন চতুপার্শ্বস্থ মরুভূমির রিক্ততার সহিতই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এখানে আসিয়া পৌঁছিবার কয়েকদিন আগে হইতেই পথে তুষার ঝটিকা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে অতিরিক্ত উৎসাহে পথ চলিবার ফলে বীরজাণ্ডে আসিয়া আমি একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম দলপতির আদেশে আমার জন্ম ব্যবস্থা হইল তিনদিন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম। যখন এই ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয় তখন জ্ঞানচাঁদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, আরে বিশ্রাম ত বিশ্রাম, আমাদের বন্ধুর সব দিকেই শুভ সংযোগ; আমাদের অসুখ বিসুখ হ'লে দেখ্‌বার কেউ নাই, কিন্তু মিষ্টার সেনের সেবা শুশ্রূষার জন্ম অন্তত একজন "মিসেস সেন" আছেন। কথাটা এমনই সময়োপযোগী হইয়াছিল সে সকলেই মাতিয়া উঠিলেন।

ওয়াটসন্ বলিলেন, Bah, Well said (বাঃ বেশ বলেছেন ত)!

আমি নিজেই বলিয়া উঠিলাম, Bravo Jnan Chand (সাবাস্ জ্ঞানচাঁদ)!

দলপতি বলিলেন, Hear, hear.

দলপতির Hear, hear শুনিয়া কারাপিকার অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, Encore, Encore.

দলপতি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া ধীর গম্ভীর স্বরে, No more please বলিয়া চলিয়া গেলেন; অমনই সমস্ত উল্লাসধ্বনি নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল।

দলপতিও আমাদের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন বটে এবং হাসি তামাসাও তাঁহার সহিত সমভাবেই চলিত কিন্তু যে কোন সময়েই হউক একটা শাসন-বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহার ফল ছিল অমোঘ; সামরিক বিভাগের ইহাই দস্তুর।

বিকাল বেলা অঞ্জলি আসিয়া হাজির হইল; তাহার প্রতি দলপতির আদেশ হইয়াছে যে, আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিন ঘণ্টার জন্ম আমার তাঁবুতে থাকিয়া সে আমার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবে। আমাদের দলপতি কর্ত্তব্যে বা শাসনে শিথিল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আমার জন্ম এতটা বিশ্রাম এবং এরূপ সেবার ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছিল এইজন্ম যে, আমরা বীরজাণ্ডে আসিয়াছি একটা নূতন হাসপাতাল খুলিতে, এখনও কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া আরম্ভ হয় নাই। অঞ্জলিকে এই কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম, আমার অসুস্থতা এমন কিছু নয় যে, কোন প্রকার সেবা-শুশ্রূষার আবশ্যক; দলপতি মহাশয় বোধ হয় ভদ্রতা করে তোমায় পাঠিয়েছেন, শুধু আমাকে সঙ্গদান করবার জন্ম, কারণ আমরা দু'জনাই যে এক দেশের লোক তা ত আর অজানা নাই।

অঞ্জলি বলিল, আপনার অসুস্থতা বিশেষ কিছু নয়

জেনে আশ্বস্ত হলাম কিন্তু দলপতি যখন হুকুম দিয়েছেন তখন আমাকে ত তিন ঘণ্টার জন্ত আপনার এখানে থাকতেই হবে।

আমি বলিলাম, তা ত নিশ্চয়ই। বেশ ত কয়েক দিন বসে বসে গল্প করা যাবে—এমন অবসর ত আর হয় না।

*　　*　　*　　*

অঞ্জলি বলিল, আপনার দেশ কোথায় তা ত বললেন না।

বলেছি ত, সারা ভারতবর্ষই আমার দেশ।

তা না হয় হল; একটা বাড়ী ত আছে?

আমি হাসিয়া বলিলাম, যখন যেখানে থাকি সেই আমার বাড়ী।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার জন্মস্থান কোথায়?

আমার জন্ম হয়েছিল মান্দালয়ে—বাবা সেখানে কাজ করতেন।

আপনার পরিবার-পরিজন সব কোথায়?

তাঁরা আছেন সব মাউতে (Mhow)—বাবা সেখানে কাজ করেন।

আপনার ভাই-বোন্‌দের সব বিয়ে হয়েছে কোথায়?

আমার ভাই কেউ নাই। দুই বোনের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়েছে লক্ষ্মৌতে আর একজনের বিয়ে হয়েছে ঝান্সীতে।

অঞ্জলী এবার একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

আপনার বিয়ে হয়েছে কোথায়?

আমি উত্তর করিলাম, বিয়ে হওয়াটাই যদি ঠিক কথা হ'ত—

বাধা দিয়া অঞ্জলি বলিল, তা নয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আপনি বিয়ে করেছেন কোথায়?

আমি আবার বলিলাম, বিয়ে হওয়াটাই যদি ঠিক কথা হ'ত তা হলে এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি বিয়ে করি নাই।

তা হলে আপনার বিয়ে না করার বিশেষ গুরুতর কারণ আছে হয় ত।

আমি বলিলাম, কারণ এমন গুরুতর কিছু নয় তবে সে অনেক কথা।

অঞ্জলি মৃদু হাসিয়া বলিল, আপত্তি না থাকলে বরং সে 'অনেক কথা'রই কিছু কিছু বলুন না, তাতে অনেকটা সময় কাটবে— এখনও ত আমাকে এক ঘণ্টা বসতে হবে।

আমি বলিলাম, না, আপত্তি করবার মত কিছু নাই। তবে শোন, আমার নিজের কথাই কতকটা বলি তোমাকে। আমাদের দেশে আমাদেরই নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে রামপ্রাণ গুপ্ত একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি জাতিতে বৈদ্য হলেও তাঁর একটি টোল ছিল এবং সেই টোলে তাঁর অধ্যাপনা শুনবার জন্ত এককালে অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল শুনেছি। সেই রামপ্রাণ গুপ্ত মশায় আমার বাবার নিকট আমার সহিত তাঁর মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ প্রস্তাব উপস্থিত করলেন, বাবাও সানন্দে ইহাতে সম্মতি দিলেন; কিন্তু আমার যে একটা মতামত থাকতে পারে সে সম্বন্ধে দুই বৃদ্ধের মধ্যে কারও মনেই কোন সংশয় হয় নাই। মেয়ের মতামতের কথা ত কেউ বলে দিলেও তাঁদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করত না। বিবাহ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য আমি নিজে তখন পর্য্যন্তও সে সব কথা ভাবি নাই, কাজেই আমার নিকট কথাটা উঠলে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখ্‌বার জন্ত কয়েক দিন সময় চাইলাম। বাবা সে কথা আমলেই আনলেন না, তিনি বললেন যে, আমার মত বয়সে কোন সন্তানই ঐ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং বিচার-বুদ্ধিতে পিতামাতার চেয়ে জ্ঞানী হতে পারে না। এত সব কথার পরে আমি কিছু স্থির করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিলাম।

অঞ্জলি ব্যঙ্গস্বরে বলিল, তা হলে আপনি বিবাহে মত দিলেন?

আমি বলিলাম, ঠিক মত না দিলেও ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল তাই।

তারপর?

আমি বলিয়া যাইতে লাগিলাম—

আমি তার পরেই একদিন দেখি বাবা তাঁর নিজের এবং আমার উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা করছেন। বিবাহ সম্বন্ধে ঔচিত্য অনৌচিত্য না ভেবে থাকলেও সামাজিক জাত বিচার এবং আনুসঙ্গিক ঐ সব বিষয়ে আমার মতামত স্থির ছিল।

বাবাকে বললাম, আমি উপবীত গ্রহণ করতে পারব না।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

আমি বলে দিলাম যে, এটা আমার স্থিরনিষ্ঠ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

তারপরে এলেন রামপ্রাণ গুপ্ত মশায় নিজে; তিনি এসে বললেন; উপবীত তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।

আমি বললাম অসম্ভব।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করিল, উপবীত গ্রহণে আপনার এতটা আপত্তি কিসে—জাত-বিচারের সঙ্গে এর কিছু সম্বন্ধ আছে কি?

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, সে কথার আলোচনা অন্য সময়ে হবে, এখন উপস্থিত কথাটাই বলে নেই।

আমি উপবীত গ্রহণ করাটা ওরূপ নির্মমভাবে অস্বীকার করাতে বাড়ীতে একটা হুলুস্থূল পড়ে গেল। বাবা বলতে লাগলেন যে, এত বড় ঘরে কুটুম্বিতার এমন সুযোগ শুধু আমার অর্বাচীনতার জন্যই পণ্ড হয়ে গেল; রামপ্রাণ গুপ্ত মশায় বলতে লাগলেন যে, তাঁর মেয়ের আর বিবাহ দেওয়া হবে কি না হবে সে বিষয়ে সংশয়ের কথা; কারণ একহিসাবে তাঁর মেয়ে ত বাগদত্তা। বাগদত্তা কথাটা অবশ্যই বাহুল্য কথন, বোধ হয় শুধু আমাকে চমকে দেবার জন্যই কথাটা বলা হয়েছিল। তারপরে আমি দেশ ছেড়ে এসে রাজসরকারে কার্য্য গ্রহণ করে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অঞ্জলি বলিল, একেবারে দেশত্যাগ করে এসেছেন সেই জন্যে?

আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তবে আবার কখনও যাব না এমন কথা বলতে পারি না। যখনই ভাবি তখনই রামপ্রাণ গুপ্ত মশায়ের সাম্‌নে গিয়ে হাজির হতে ভরসা হয় না এখনও।

এমন সময় আমাদের বন্ধুর দল সব আসিয়া পড়িলেন; অঞ্জলিও সব কাজ কর্ম্ম গুছাইয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িল।

* * * *

কিছুদিন পরে আবার একদিন নিরালা পাইয়া অঞ্জলি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সে-দিন জাতি-ভেদ সম্বন্ধে কি বলছিলেন বলুন না শুনি।

আমি বলিলাম, জাতি-ভেদের মূল তাৎপর্য্যটা কি?

অঞ্জলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আপনিই বলুন।

আমি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলাম, গুরূপ স্থলে বিবাহে মত দেওয়াই আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল।

অঞ্জলি বলিল, কেন, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে, রামপ্রাণ গুপ্তের মেয়ে আপনার আদর্শ পত্নী হতে পারত না?

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, কিছু বুঝবার আবশ্যকতা হয় নাই বলেই ওকথা বলছি।

অঞ্জলি ঠাট্টাচ্ছলে বলিল, আপনার আদর্শ যে কি তা যে না জানে সে কি করে বিয়ের আগেই আদর্শ-পত্নী হবে?

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, আগে পত্নী হওয়াটা অবশ্যই অভিধানসঙ্গত নয় আর পরিচয়ের আগে আদর্শ অনুযায়ী হওয়াটাও সম্ভব নয় আমার বলবার উদ্দেশ্যও তা ছিল না। কেউ যে আমার আদর্শ মত তৈয়ারী হয়ে বসে থাকবে এমনটা আশা করাও চলে না জানি, কিন্তু আমার আদর্শ মত হওয়ার পক্ষে সম্ভাবনা কার কতটা আছে বা না আছে তা ত অনেকটা বুঝা যেতে পারে।

অঞ্জলি বলিল, যখন সম্ভাবনার কথাই বলছেন, তখন ত মনে হয় আপনিও কতকটা দৈবের উপরে নির্ভর করতে প্রস্তুত আছেন।

* * * *

কিছুদিন পরে পারস্যের উত্তর ভাগে অবস্থিত মেশেদ নগরে এক সামরিক হাসপাতাল খুলিবার কথা হয়। সেই উপলক্ষ্যে অঞ্জলিকে সেখানে পাঠাইবার হুকুম আসে। যথাসময়ে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অঞ্জলি মেশেদ অভিমুখে রওনা হইল। অঞ্জলি চলিয়া যাওয়ার তিন দিন পরে লোক মারফত একখানা চিঠি পাইলাম। তখন প্রভাতের নবঅরুণালোক পূর্ণ দীপ্তিতে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাঁবুর ছায়ায় একাকী বসিয়া মেঘের লীলাচঞ্চলগতি দেখিতেছিলাম; আর ভাবিতে ছিলাম যে, মানুষের জীবনের গতিও কি এই সঞ্চরমান মেঘের

ন্যায় লীলায়িত গতিতে বহিয়া চলিতে পারে, না ঘন তমসাবৃত আকাশের নীচে যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় আমাদের জীবনও কেবলই নানাপ্রকার ঘটনা ও অবস্থার বিরুদ্ধে এক অবিশ্রান্ত সংগ্রামের গতিতে প্রবাহিত হইতে বাধ্য! মানুষ কি কেবলই অবস্থার দাস, না অবস্থানুবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার স্বাধীন সত্বার বিকাশের উন্মুক্ত ক্ষেত্র আছে —এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে চিঠিখানা পাইয়া সমস্ত চিন্তার ধারা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল এবং চিঠির জন্ম কৌতূহলও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত, জানি না। আপনি বয়সে বড় সেই হিসাবে "শ্রীচরণেষু" লেখা সকল অবস্থাতেই চলে। প্রথমেই আপনার নিকট আমার নিজের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। আমিই রামপ্রাণ গুপ্তের একমাত্র কন্যা।

আপনি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার কিছুকাল পরেই পিতার মৃত্যু হয়। আমার বিবাহের ভাবনায় তাঁহার শেষকালটা যে অশান্তিতে কাটিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য; শেষ পর্য্যন্তও তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই যে, আমাকে লইয়া তিনি কি করিবেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস মতে আমি যে বাগ্‌দত্তা। পিতা স্বর্গত হইলে আমার ভার আমার নিজের উপরই পড়িল। আমি বাগ্‌দত্তা বলিয়া পিতার যে বিশ্বাস ছিল আমিও সে বিশ্বাসের সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না; বরং পিতার বিশ্বাসে যেটুকু অনিশ্চয়তা ছিল আমি তাহাও পূরণ করিয়া লইলাম। ঐ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই আমি বর্ত্তমানে "মিসেস সেন" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আসিতেছি।

সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুবর্ত্তিতা যে হিন্দু-রমণীর এক মাত্র লক্ষ্য এরূপ আদর্শ আবহমান কাল হইতে সমাজে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সে আদর্শ পালনে যে কতটা শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন হইতে পারে সে বিচারের দায়িত্ব সমাজ গ্রহণ করে নাই। আমিও প্রাচীন আদর্শে মানুষ হইয়া থাকিলেও আমার পিতা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে "পরবশং দুঃখম্ আত্মবশং সুখম্" বলিয়া যে স্বানু-বর্ত্তিতার আদর্শ শিক্ষা দিতেন, পরোক্ষভাবে হইলেও আমি সে শিক্ষা হইতে একেবারে বঞ্চিত হই নাই। এইটুকু সম্বল লইয়াই আমি মনে মনে শক্তি সংগ্রহ করিলাম। প্রথমে কর্ত্তব্য স্থির করিলাম এই ভাবিয়া যে, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, তাঁহার পদানুসরণ করিতে না পারিলেও পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অবশ্যই পারিব।

প্রথমে উদ্যোগপর্ব্ব স্বরূপ আবশ্যক মত ইংরেজিতে শিক্ষা গ্রহণ করিলাম, পরে যথাসময়ে রোগ-শুশ্রূষার কার্য্যে দীক্ষা লাভ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। সরকারী কার্য্যে স্বাধীনতা নাই জানি, সরকারের প্রয়োজন এবং আদেশ অনুসারে যেখানে সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে জানিয়া সেজন্ম প্রস্তুত হইয়াই কার্য্যে নামিয়াছিলাম। আপনার সহিত যে কয়দিনের জন্ম সাক্ষাৎ হইল তাহা দৈব—এক হিসাবে আমার আকাঙ্ক্ষার ফলও বলিতে পারেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ সময়ে আমার নিজের পরিচয় ব্যক্ত করি নাই কেন তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন—আপনি যখন আদর্শ পত্নী না পাওয়া পর্য্যন্ত বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, সে অবস্থায় আপনার সমক্ষে বাগ্‌দত্তা বলিয়া আমার পরিচয় জ্ঞাপন অনেকটা দাবীর মত শুনাইত নাকি? বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে আদর্শ ধরিয়াছেন তাহা শুধু আপনার পক্ষে নয়, সকলের পক্ষেই আদর্শ হওয়া উচিত, এমন কি আমার পক্ষেও। আমি কিন্তু এতদিন সংস্কারের পরিচর্য্যা করিতে করিতে এখন একেবারে সংস্কারাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। সংস্কারে এবং আদর্শে সমন্বয় সাধিত হইতে পারিলে অবশ্য আমার পক্ষে সোনায় সোহাগা হইত; কিন্তু বিবাহ ত এক পক্ষের ব্যাপার নয়।

আপনি ত সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন, অধুনা বিবাহতত্ত্ব বিষয়েও আপনার চিন্তা ধাবিত হইতেছে। আপনি আমার দুইটি প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিবেন কি? প্রথমতঃ আমার পিতা এত বড় পণ্ডিত এবং সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি হইয়াও এরূপ নির্ব্বিচারে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া রহিলেন কি করিয়া আর এই যে এত বড় প্রাচীন সনাতন হিন্দুসমাজ, ইহার মধ্যেই বা এরূপ বদ্ধ সংস্কার কি করিয়া

সম্ভব হইল ? দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, আপনার আদর্শ পত্নী আপনি কোথায় বা কি অবস্থায় লাভ করিবেন তাহা আপনিই জানেন অথবা এখনও জানেন না, কিন্তু আপনারই আদর্শ শিরোধার্য্য করিয়া আমি যাহাকে আমার আদর্শ স্বামী বলিয়া গণ্য করি তিনি যদি আমাকে গ্রহণে অক্ষম বা অসম্মত হন তাহা হইলে আমার স্থান কোথায় ? ব্যক্তিগতভাবে কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করিবার অধিকার আমার নাই জানি। আপনি বহুজ্ঞ বলিয়া আমার সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছি।

আমি শারীরিক সুস্থ আছি! আশা করি আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

অঞ্জলি

চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম।

এই কি রামপ্রাণ গুপ্তের কন্যা!

কোথায় সেই প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন বৃদ্ধ যাঁহার মতামত-সমূহ কোন্ বিগত শতাব্দীর উপযুক্ত বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছি আর কোথায় তাঁহার কন্যা যে আসিয়া এমন প্রশ্ন উপস্থাপিত করিতেছে তাহার সমাধানের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত আধুনিকতা আমার মধ্যেও নাই! বৃদ্ধের কন্যার সহিত বিবাহ প্রস্তাব কালে যে কন্যার ব্যক্তিত্বের কথা গণনার মধ্যেই গ্রাহ্য করি নাই, সেই কন্যাই ওরূপ আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও কি করিয়া এরূপ প্রবল স্বাধীন কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় পদক্ষেপ করিল আর সে যাহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়া রাখিয়াছে কিছু কালের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাহার সঙ্গ লাভ করিয়াও কোন প্রকারও দাবীর আভাষ মাত্রও না জানাইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে চির-বিচ্ছেদের পথে বাহির হইয়া পড়িবার মত এমন সুপুষ্ট ব্যক্তিত্বই বা সে কোথা হইতে লাভ করিল ইহাও এক মস্ত সমস্যা।

* • • *

ইহারই কিছুকাল পরে সেনাবাসে সংবাদ আসিল, মিসেস্ সেন বলিয়া যে বাঙালী নারী সাধারণ-শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন, তিনি তাঁহার সুনিপুণ কার্য্যদক্ষতায় সেবাকারিণীদিগের অধিনায়িকার পদলাভ করিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল পরে অঞ্জলির নিকট হইতে সে দিনই তার পাইলাম, আপনার আশীর্ব্বাদের জয় হউক।

———

ধরণী

[শ্রীঅজিতকুমার দত্ত]

ওগো ধরণী, নীরব ধরণী, ব্যথিতা ধরা!
তব সবুজ আঁচল-আড়ালে বেদনা-ভরা—
বুকের কাঁপন পেয়েছি শুনিতে আজিকে নীরব রাতে
আজি মৃদু-কম্পিত বাতে,—
আজি তোমার মনের গোপন কথার মৃদুল আভাষটুক্
শুনি নিশীথরাত্রে আপন বক্ষে দুরু-দুরু ধুক্ ধুক্।

ওগো ধরণী, কুমারী ধরণী, কন্যা ধরা!
আজি গ্রহের সভায় তুমি যে স্বয়ম্বরা,
হাজার গ্রহের আলোক ভেদিয়া তোমার যাত্রাপথ।
তব রূপ-গৌরব রথ
কত শত সূর্য্যের গর্ব্ব টুটিয়া উল্কার মত ছোটে,
সেই গ্রহের বেদনা তোমার আলোয় গোলাপ হইয়া ফোটে।

ওগো ধরণী, জননী ধরণী, মানব-মাতা!
মগ- বিশ্বলোকের সকল মায়ের ব্যথা
তোমার চোখের সুনীল সায়রে পড়িল যে আজ ধরা
শত অশ্রু-কমল-ভরা!
আজি তোমার সজল বিশাল নয়ন আকাশে ফেলেছে ছায়া,
তাই আকাশের বুকে তারায় ফোঁটায় অশ্রু লভিল কায়া!

স্মৃতি-চিহ্ন

[শ্রীবিমল সেন]

(গল্প)

এক

—হেহুয়া ?… হেদোমে যায়গা তো এথানে কি কর্ত্তে আয়া রে বাবু ? এ তো বিডন ষ্ট্রীট। এই সোজা—নাক্ বরাবর চলা যাও, তʼাহলে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট মে গির্‌নে সেকেগা। বাস্, ঠিক ইস্‌কো সাম্‌নেই তোমার হেহুয়া। মস্ত বড় একঠো পুকুর হায়। ..বুঝা ?

প্রশ্নকারী হিন্দুস্থানী ভাই কিছু বুঝতে পারল কিনা সে-ই জানে—মাথা নেড়ে 'নাক্ বরাবর'ই চলতে লাগল। অখিল বাবু আবার মাথা নীচু করে ত্বরিৎপদে বাড়ীর দিকে চল্লেন। অফিস থেকে ফিরছিলেন, তাই মুখখানা তাঁর শুকিয়ে উঠেছে। কোন এক সরকারী অফিসে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের তিনি চাকরি করেন। চুলগুলো অনেক দিন থেকে 'কাট্‌ব, কাটব' করে আজও কাটা হয় নি। তাই সেগুলো মস্ত বড় বড় হয়ে অযথা বাড়ীর সর্ষের তেল নষ্ট করছে। দাড়িটাও আজ তিন দিন ধরে কামাবার সময় পান নি। চার বৎসর পূর্ব্বে কালো একটা কোট করিয়েছিলেন—সেই কোট তাঁর গায়ে। পরণে বঙ্গলক্ষীর মোটা ধুতি! পায়ে কালো এ্যাল্‌বর্ট স্লিপার। তাঁর বয়স তেতাল্লিশের কিছু উপরে।

অখিল বাবু অত্যন্ত সাদাসিধে—ভাল মানুষ। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। বুড়ো হতে চলেছেন—তবু দিনরাত ফুর্ত্তি আমোদ নিয়েই আছেন। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে ফুটবল নিয়ে ছুটাছুট করতে, তাশ-পাশা খেলতেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। বৃদ্ধদের গুরু-গম্ভীর মুখের ভাব, আর সর্ব্বদা সাংসারিক কথাবার্ত্তা তাঁর ভাল লাগত না। সব সময়ে তিনি দিলদরিয়া মেজাজে থাকতেন। বাড়ীতে যার তিন তিনটে 'সোমত্ত আইবুড় মেয়ে, তার মুখে সর্ব্বদা যে কি ক'রে হাসি লেগে থাকে—পাড়ার লোকেরা অনেক দিন মাথা ঘামিয়েও তা বুঝে উঠতে পারে নি।

ঠিক সন্ধ্যে বেলায় তিনি বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে তখনও আলো দেওয়া হয় নি। ঘরে প্রবেশ করে বল্লেন, এ কি আজ আলো-টালো জ্বালা হয় নি যে? কিন্তু উত্তরের জন্য একটুও প্রতীক্ষা না করে পাশের খাটটায় বসে পড়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বড় মেয়ে শোভার দিকে চেয়ে আবার বল্লেন, আজ সুনীলের আসবার কথা আছে; না রে শোভা ? ..এলে হয়, ছোঁড়া যে আড্ডা'বাজ !

একটু থেমে নিজের মনেই আবার বল্‌তে লাগলেন, ছেলেটার উপর এমনিই মায়া দাঁড়িয়ে গেছে যে এক রোববার না এলে কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে যায়।

শোভা (তার বয়স ষোল বৎসর। কিন্তু পাড়ায় চৌদ্দ বছর বলে প্রচার করা হয়েছে) অদূরে বসে আলো জ্বালবার ব্যবস্থা করছিল। পিতার এই কথা ক'টি শুনেই সে বিনা কারণে রাঙা হয়ে উঠতে লাগল। পাশে তার মেজ বোন আভা বসে বসে দিদির দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হাস্‌ছিল।

অখিল বাবু এ-সব লক্ষ্য না করেই বলে যেতে লাগলেন, সুনীল একদিন একজন মস্ত বড়লোক হবে। ওর উপর আমার অনেক আশা আছে। যদি ভগবান দিন দেন; যদি —আজ আসবে বলে গেছলো তো ? ঠিক জানিস তো মা ?

শোভা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে, হ্যাঁ, বলে তো গেছলেন।

—ও, তা হলে সে ঠিক আসবে। কথার নড়চড় তার কখনও হয় না।

বলেই অখিল বাবু উঠে দাঁড়ালেন। জুতো, জামা খোলা হয়েছিল—দরজার দিকে এগিয়ে হাঁকলেন—কই গো! ওই জাঙ্—ঐ যাঃ, আঙুরের ঠোঙাটা কি হল ? ও আভা, খাটের উপর দেখ্ তো, আঙুরের ঠোঙাটা আছে নাকি! চার আনার আঙুর কিন্‌লুম, তা ট্রামেই ফেলে এলুম বুঝি! বেশ ত। দেখ্ ত মা, খাটটা ভাল করে—

বলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিতভাবে খাটের উপরকার জিনিষ-পত্র ওলট পালট করতে লাগলেন। কিন্তু 'ঠোঙা' আর পাওয়া গেল না। তবু অখিল বাবুর আদেশে মেয়েরা সমস্ত ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল।

এমন সময় গৃহিণী এসে সেখানে দাঁড়ালেন। দোহারা চেহারা, গায়ের রং ফর্সা নয়। কালো পেড়ে একটা ময়লা সাড়ী তাঁর পরণে। বয়স বত্রিশ হবে। গৃহিণী কথাবার্ত্তা একটু কম বলেন। বাড়ীতে সকলে তাঁকে ভয় করে চলে। তিনি এসে একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে বল্লেন, কি খোঁজা হচ্ছে?

—এই দেখ তো! চার চার আনার আঙুর কিনলুম, ভাবলুম—

কিন্তু একটু বলতেই তাঁকে বাধা দিয়ে গৃহিণী বল্লেন—বেশ হয়েছে। ফেলে এসেছ ট্রামে; এখন ঘরের কোণে খুঁজলে কি হবে? হাত মুখ ধুয়ে এসো গে—কিছু মিষ্টি আনিয়েছি, একটু মুখে দাও।

বলে তিনি রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন। সন্ধ্যার সময় সুনীল এল। চমৎকার ফর্সা রং। সুগার চকচকে পাঞ্জাবী তার গায়ে। পরণে ফরাসডাঙ্গার ধুতী। চুলগুলো পিছন দিকে ফেরান। তার বড় বড় সুন্দর চোখে মোটা ফ্রেমের 'পাওয়ারলেস্' চশমা। পায়ে শাদা ক্যাম্বিশের 'টেনিস্ সু'। তার বয়স এই তেইশ বৎসর।

সে আসতেই সমস্ত বাড়ীটায় হুলুস্থূল পড়ে গেল। ছোট মেয়ে একটা পাখা নিয়ে ছুটে এসে বাতাস করতে লাগল। আভা পানের বাটা নিয়ে মশলা দিয়ে ভাল করে পান সাজতে বসে গেল। আর শোভা আড়াল থেকে সুনীলকে প্রাণভরে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে চা তৈরি করতে ব্যস্ত হল।

গৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছিলেন। সুনীলের কাছে এসে, পার্শ্বে বসে স্নেহের স্বরে বল্লেন, একেবারে সন্ধ্যে করে এলে যে সুনীল? আবার এক্ষুণি তো 'যাই যাই' করবে। সাত আট দিনের পর যদি এইটুকু সময়ের জন্যে আস,—তাহলে কি মনটা ভাল লাগে, বাবা?…এ ক'দিন শরীর বেশ ভাল ছিল তো?

সুনীল বল্ল, হ্যাঁ মাসি-মা, শরীর ভালই ছিল। আজ আমাদের কলেজে টেনিস-ম্যাচ্ ছিল, তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।

অখিল বাবু এতক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিলেন। ম্যাচের কথা শুনতেই তিনি বল্লেন, ম্যাচ্ ছিল নাকি?…কি 'রেজাল্ট' হল?

—আমরাই জিতেছি। একটা মেডেলও পাওয়া যাবে।

এ-কথা শুনে গৃহিণী যেন আনন্দে গলে গিয়ে বল্লেন, আর এত মেডেলও পেলে, বাছা! টেনিস্ খেলে, তাস খেলে, ক্যারম খেলে, থিয়েটার ক'রে—আচ্ছা সব সুদ্ধ কত-গুলো মেডেল তোমার হয়েছে?

সুনীল একটু লজ্জিত ভাবে বল্ল, তা' সব সুদ্ধু বারো-চোদ্দটা হবে।

গৃহিণী যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, তা' পাবে না কেন, বাছা? গুণ থাকলেই পায়! তোমার গুণ কত!… বেঁচে থাক, মায়ের কোল আলো কর।

তারপর ঘুরে একটু জোরে বল্লেন, অ শোভা, তোর চা হল?…আজ কিন্তু গানটা সব শিখে নিস্। ভুলে যাস নি আবার।

শেষে আবার সুনীলের দিকে ফিরে বল্লেন, সেদিন অর্দ্ধেক গান শিখিয়ে চলে গেলে—সে তো ওর সেই দিনই হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে খালি ছট্ ফট্ করছে, কবে সুনীল-দা' আসবে, কবে গান সবটা শিখব… মেয়ের আমার গান শিখবার ভারি সখ।

সুনীল এ-কথা শুনে আড়চোখে ওপাশের দরজার দিকে একবার দেখে নিলে। সেখানে শোভা বসে চা তৈরি করছিল।

এর কিছুক্ষণ পরই শোভা এক পেয়ালা চা আর একটি ডিসে করে কিছু কচুরি সুনীলের সম্মুখে রেখে দিলে। আসতে আসতে দুজনের চোখের দৃষ্টি মিলিত হল। এবং দুজনের ঠোঁটের কোণ দিয়ে একটা হাসি খেলে গেল। আর ওদিকে অখিল বাবু এবং গৃহিণী এটা লক্ষ্য করে অত্যন্ত গোপনে একটু হেসে চোখ ঠারলেন।

সুনীল কচুরি মুখে দিতেই গৃহিণী একটু হেসে জিজ্ঞেস

করলেন, ওগুলো কেমন হয়েছে, সুনীল?…শোভা তৈরি করেছে!

কিন্তু সুনীলকে কিছু বলতে দেবার পূর্ব্বেই শোভা একটু রাগের, একটু লজ্জার হাসি হেসে বল্‌লে, তুমি ওকথা কেন বল্লে মা? ও নিশ্চয়ই ভাল হয় নি।

—দেখেছ, বাবা সুনীল? শোভা সেই থেকে ভয়েই মরে যাচ্ছে তুমি খেয়ে না জানি কি বল—কেবলি বল্‌ছে, ভাল হয় নি, ভাল হয় নি। বলে তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সুনীলের মনের ভিতরকার ভাবটুকু যেন খুঁজতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু সুনীল শুধু বল্‌ল, বেশ হয়েছে।

চা খাওয়া শেষ হলে গৃহিণী সবার অলক্ষ্যে অখিল বাবুকে একটা ইঙ্গিত করে বল্লেন, প্রকাশদের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলায় তোমায় যেতে বলে গেছলো না?…যাও, একবার ঘুরে এসো।

শোভার দিকে ফিরে বল্লেন, তুই এখন গান শিখবি বুঝি? তা হারমোনিয়মটা নিয়ে ঐ ঘরে বোস্‌গে যা'… আয়, তোরা আমার মশ্‌লাটা একটু বেটে দিবি।…গান আজ সবটা শিখিয়ে দিও বাছা!

বলে তিনি মেজ এবং ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। আর অখিল বাবু উঠে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, প্রকাশদের বাড়ী থেকে কখন যেতে বলে গেল?

গৃহিণী তড়াক্ করে ফিরে দাঁড়িয়ে, ভ্রূ কুঁচ্‌কে বল্লেন, আঃ যেতে বলবে কেন?…যাও, একটু ঘুরে টুরে এসো গে না! ওদের একটু নিরিবিলি গানটা শিখ্‌তে দাও। ওখানে তুমি হাঁ করে বসে থেকে কি করবে?

অগত্যা অখিল বাবু বেরিয়ে গেলেন। আর শোভা হারমোনিয়ম নিয়ে ওপাশের ছোট ঘরে গান শিখ্‌তে বসল।

দুই

আজ প্রায় তিনমাস এইভাবে কাটছে। অখিল বাবুর সামান্য আয়—তাতে তিনটির কেন, একটি মেয়ের বিয়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। তার উপর মেয়েরা তাঁর সুন্দরী নয়। সব ক'টিই কালো—তবে নাক মুখের গড়ন মন্দ নাও বলা যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যে কত কঠিন—তা' অখিল বাবু সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও গৃহিণী এ কথা এক সময়ের জন্যেও ভুলতে পারতেন না। অত বড় মেয়ে হল, অথচ কোন স্থানেই সুবিধা হচ্ছে না।

এমনি সময়ে সুনীল তাঁদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া সুরু করলে। সে অখিল বাবুদের গ্রামের ছেলে। তার পিতা মস্ত বড় চাকুরে। সুনীল যতই আসা-যাওয়া করতে লাগল, ততই অখিল বাবু এবং গৃহিণী মনে মনে একটা স্বপ্ন গড়তে লাগলেন। যদি শোভাকে তার হাতে দেওয়া যেত! যদি সুনীলের সঙ্গে শোভার বিয়ে হ'ত! কিন্তু, কালো মেয়েকে সুনীলের পিতা কখনও ঘরে নেবেন না—এটাও তাঁরা বেশ জান্‌তেন। তাই সোজাসুজি সুনীলের পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব না করে তাঁরা অত্যন্ত গোপনে আর এক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন—যা' বাইরের লোকেরা শুনলে ভাল বলত না। এই অন্য পন্থাটি আর কিছুই নয়—সুনীলকে অতিমাত্রায় স্নেহ আদরের ভিতর দিয়ে প্রত্যেক রবিবারে তাঁদের বাড়ীতে টেনে আনতেন; আর সে এলে শোভার সঙ্গে তার অবাধ মেলা মেশার সুযোগ দিতেন। আশা, এইভাবে যদি সুনীলের মনটা শোভার দিকে ঝুঁকে পড়ে; যদি বাপ্‌কে বলে, আমি ওকে ছাড়া আর কোন মেয়েকে বিয়ে করব না—তা'হলে তা'দের বিয়ে দিতে আর কোন গণ্ডগোল হয় না। এই আশার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁরা সুনীলের সামনে শোভার গুণের অসংখ্য প্রশংসা করতেন। আর শোভাকে যখন তখন কথার ভাবে বেশ বুঝিয়ে দিতেন যে, সুনীলকেই তাঁরা জামাই করতে চান—করবেনও।

শোভার তখন সেই বয়স, যখন মানুষ আপনাকে কেবল নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিতে চায়। একটু কিছু অবলম্বন পেলে নিজের সমস্তটুকু দিয়ে আঁকড়ে ধরে। সে উঠতে বসতে বাবা-মা'র কাছে সুনীলের প্রশংসা শুনত। সর্ব্বদাই শুনত ছোট বোনেরা তাকে ঠাট্টা করছে—সুনীল-দা' আসে নি বলে তোমার মন খারাপ হয়েছে বুঝি, দিদি? কখনও বলত, জামাই বাবু আজ আসবে তো দিদি?—

এ-সব শুনে শুনে শোভার মনেও একটা আশা হয়েছিল, সুনীলের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। সে-ই তার বর। সুনীলের সুন্দর চেহারা, তার চোখ দুটো বড় মোহন। তার অসংখ্য গুণ। সে এসে তাশ খেলে সবাইকে হারিয়ে দিত। ক্যারম খেলতে তার সঙ্গে কেউ পারত না। তার থিয়েটার করা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত; সর্ব্বোপরি তার গলার সুর কি মিষ্ট! শোভা তার বুকের দুরন্ত ক্ষুধা নিয়ে এ সব দেখত; আর এক এক পোঁচ গভীর ক'রে নিজের বুকে সুনীলের নাম লিখে রাখত।

কিন্তু সুনীল ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। সে ধনীর ছেলে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ে; তার আশা সে বিলেত যাবে, পাশ-করা একজন আলোক প্রাপ্তা, ডানা-কাটা পরি বিয়ে করবে। এদের বাড়ীর উপর যদিও তার একটা আকর্ষণ এসেছিল; কিন্তু সে আকর্ষণটা এসেছিল, শুধু এদের প্রত্যেকের কাছে খুব বেশি আদর যত্ন পেত বলে। শোভাকে ভাল না লাগলেও সে আসত—রবিবারের বিকালটা একটি তরুণীর সঙ্গ পাবার লোভে। আর কিছুই নয়। শোভাকে বিয়ে করবার কথা সে কোনদিন মনের কোণেও স্থান দেয় নি।

আজ গান শিখতে বসে প্রথমেই শোভা একটু অভিমানের স্বরে বল্‌লে, একটু সকাল সকাল এলে কি খুবই কাজের ব্যাঘাত হত?

সুনীল বল্‌ল, ঐ যে বল্‌লুম, কলেজে টেনিস ম্যাচ ছিল। সেই জন্যই তো দেরি হয়ে গেল। তা' একটু দেরী হলেই বা? কি হয়েছে তাতে?

শোভা মুখ ফিরিয়ে নিলে। কি হয়েছে তাতে! অভি-মানে তার চোখ ছল ছল করে উঠল। বল্‌ল—হবে আর কি! তুমি যেদিন আস, এমনি সন্ধ্যে করেই তো আস! কেন, এখানে একটু থাকলে তোমার কি হয়?

না, না; তবে সন্ধ্যের পরেই না ফিরলে বাড়ী যেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই!

শোভা হারমোনিয়মের একটা পর্দ্দা টিপতে লাগল। কি একটা কথা যেন তার ঠোঁটের কোণে এসেছিল, কিন্তু বলতে পারছিল্ না।

সুনীল্ কিছুক্ষণ শোভার দিকে চেয়ে থেকে তারপর বল্‌ল, কই শোভা, আজ কপালে টিপ পর নি যে? টিপ পরলে তোমায় ভারি সুন্দর দেখায়।

শোভা আনন্দে গলে গিয়ে মুগ্ধ বিভোর চোখে একবার সুনীলের দিকে চেয়ে মাথা নত করলে। সলজ্জ হাসি হেসে বলল, আভাটা বড় ঠাট্টা করে যে!

গান শিখতে বসে বেশীর ভাগ সময় তাদের এই ভাবে কেটে যেত। আর ওদিকে গৃহিণী কল্পনার চোখে এ সমস্তই যেন দেখতে পেয়ে মনে মনে আকাশ কুসুম রচনা করতেন।

তিন

—হ্যাঁ দিদি, সুনীল দা' এতদিন আসে না যে?…তুমি টিপ পরতে চাও না বলে বুঝি? বলে দুষ্ট আভাটি আঁচলে মুখ ঢেকে খিল খিল করে হাসতে লাগল।

—দেখ্‌ আভা, চুপ করে থাক্ বলছি, বোকা মেয়ে কোথাকার!

মনটা আজ শোভার একেবারেই ভাল ছিল না। এত-দিন সুনীল আসে নি, আজকের রবিবারও গেল!

'বোকা মেয়ে' তবু শুনল না। বলিল, এ-সব তুমি সহ্য কোরো না, দিদি। বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল করে এ-সবের শোধ তুলে নিও।

এইবার শোভা আভাকে দুটো চড় কষিয়ে দিলে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দারুণ অভিমানে চোখ দুটো তার জলে ভরে এল। ভারি রাগ হচ্ছিল তার।—একবার এলে হয়; তাকে সে ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না, কথা বলবে না, ফিরেও চাইবে না। তাকে সে—তাকে সে—

আভা বল্‌ল, সুনীল-দা' এতদিন এল না—অসুখ বিসুখ করে নি তো?…মা বলছিল, 'তোরা একখানা চিঠি লিখেও তো খবরটা জানতে পারিস।'…চিঠি লিখ্‌বে দিদি?

—দ্যাৎ, আমি চিঠি লিখব কি! লজ্জিতভাবে শোভা বল্লে।

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই আবার জিজ্ঞেস করলে, মা বলছিল নাকি?

—হ্যাঁ, বলছিল বৈ কি! বলছিল—ওকে আজই এক-খানা চিঠি লিখে দিতে বলিস!

কিন্তু শোভা রাজি হল না। তার বড় লজ্জা করতে লাগল।

—তুমি লেখ না, দিদি। আমি কাগজ কলম এনে দিচ্ছি।…এতে তোমারি তো ভাল হবে! আর মা তো বলেছেনই।

শোভা আপত্তি করলেও সে-দিন দুপুর বেলায় দুই বোনে মিলে সুনীলের কাছে চিঠি লেখা হল। তারপর, যখন তাদের ছোট বোন চিঠিখানা আঁচলের ভিতর লুকিয়ে রাস্তার মোড়ে চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়ে এল—শোভা তখন দুরু দুরু বুকে ভাবল, এতে আর দোষের কি হয়েছে! মা ই যখন বলেছেন!

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সুনীল হঠাৎ সে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। রবিবার ছাড়া অন্য কোন দিন সে আসত না। শোভার মন আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। ভাবল—চিঠি পেয়েই অমনি ছুটে এসেছে; আজ না জানি কত কথাই বলবে। কিন্তু সুনীলের মেজাজটা আজ ভাল বলে বোধ হচ্ছিল না।

অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর শোভা যখন তাকে চা দিতে এল, তখন সে ঘরে আর কেউ ছিল না। শোভা একবার সুনীলের দিকে চেয়ে মাথা নত করল। সুনীল চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়েই বল্ল, আচ্ছা শোভা, হঠাৎ তোমার অমন ছেলেমানুষী খেয়াল কি করে হল, বল ত?

শোভার মুখ হঠাৎ কালো হয়ে উঠল। সুনীল কাকে ছেলেমানুষী বলছে? আস্তে বল্ল, কি ছেলেমানুষী কর্‌লুম?

—চিঠি লিখতে গেলে কেন? ঐ চিঠি বাবার হাতে যদি পড়ত তো কি মনে কর্‌তেন, বল ত? ছি, অমন কাজ কর্‌তে আছে। বাড়ীর কেউ টের পেলে আমায় খেয়ে ফেলত!

শোভার মনে হল, যেন তার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মুখে তার কথা ফুটল না।

সুনীল আবার বলল, কক্ষণো অমন কাজ কোরো না! এতে যে হাতে কলমে প্রমাণ হয়ে যাবে তা বোঝ না?—যাও!

শোভা টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার পর এক সময়ে সুবিধা পেয়ে গৃহিণী অনেক ভণিতা করে শেষে ধীরে ধীরে সুনীলকে বল্লেন. আমাদের অনেক দিনকার সাধ, ওকে আমরা তোমার হাতেই সঁপে দিয়েছি বাছা! এতদিন তো দেখছ, ওকে তুমি ভাল করেই চেন! রংটা একটু ময়লা হলেও অমন মেয়ে আজ কাল আর তুমি পাবে না। আর ওর জীবনটাও ধন্য হয়ে যাবে। আমাদের অবস্থাও তো তুমি জান—তোমাকে আমাদের রক্ষে করতেই হবে বাছা!

এ-কথা শুনে সুনীল বিস্মিত হয়ে বল্‌ল, আমার সঙ্গে? সে যে অসম্ভব, মাসি-মা! আমি পাঁচ ছ' বছরের ভেতর তো বিয়েই কোরব না। তারপর, আমি এই সামনের বছর বিলেত যাচ্ছি! বিয়ের আমার এখুনি কি হয়েছে?

—তা' বাছা, সেই বিয়ে তো করবেই; না হয় দুদিন আগেই করলে! ওকে তোমায় নিতেই হবে, বাছা।

এদের এত বড় দুঃসাহস সুনীল সইতে পারল না। তবু নম্রভাবেই বল্‌ল, তুমি পাগল হয়েছ, মাসি-মা? শোভার সঙ্গে হবে আমার বিয়ে? তাও কি কখনও হয়!

গৃহিণীর মুখ যেন একটু শুকিয়ে এল। এমন কথা যে সুনীলের মুখে শুনবেন, এ তিনি আশা করেন নি। তিনি যে ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন, এতদিনে তাঁর একটু আশাও হয়েছিল—হয় তো সুনীলের মন শোভার দিকে টলেছে। যা' হক, তিনি আজ আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌লেন না। আর ওদিকে শোভার চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগল। চায়ের বাটিতে সে তিনবার চিনি দিয়ে ফেল্লে।

চার

তারপর প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এ-সব ক্ষেত্রে সচরাচর আমরা যা দেখতে পাই—শোভার বেলাও তাই হয়েছে। অখিল বাবু একদিন সুনীলের পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতেই তিনি প্রথমে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, তা' কি করে হয়, অখিল? সুনীল তার বৌ-দিদির কাছে বলেছে যে, ও পাশ-করা, খুব সুন্দরী মেয়ে বিয়ে কর্‌তে চায়। তা' ও বিলেত-টিলেত যাবে; একটু সুন্দরী, একটু লেখা-পড়া-জানা মেয়ে ওর দরকার বৈ কি. তুমিই বল না কেন?

ফলে সেইদিনই অখিল বাবু এতদিনকার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

সুনীল তারপর থেকে আর সে বাড়ীতে যায় নি। তবে সেই ঘটনার চারমাসের পর সে শুনেছিল যে, তাদেরই গ্রামের একটা ভবঘুরে অকেজো ছেলের সঙ্গে শোভার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে সে মনে মনে একটু হেসেছিল—শোভাদের সেই এক সময়ের দুঃসাহসের কথা ভেবে!—এই দু'বছরের মধ্যে সুনীল তার মেডিক্যাল কলেজের পড়া শেষ করেছে। আবার একটা বিলিতী খেতাবের জন্তে সামনের বছর তার বিলেত যাওয়াও স্থির হয়ে গিয়েছে। বিলেত যাবার পূর্ব্বেই তার বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার; তাই অনেক খুঁজে, অনেক মেয়ে অপছন্দ করে, শেষে একস্থানে পাত্রী স্থির করা হল। মেয়েটি সেবার আই, এ, পাশ করেছে! দেখতে ডানাকাটা পরিই বটে! খুব বড়লোকের মেয়ে সে- অনেক টাকা ব্যয় করে তাঁরা মেয়ের বিয়ে দিলেন।

সুনীলের বিয়ে তাদের গ্রামে বসেই হল। তার পিতা ধনী লোক। বিয়েতে তিনিও অনেক টাকা ব্যয় করলেন। বিদেশ থেকে বাজনা এল; আলোয় এমন করে সমস্ত বাড়ীটা সাজান হল যে, সারা গ্রামের বৃদ্ধেরা বল্লেন, এমন ঘটার বিয়ে গ্রামে পূর্ব্বে কখনও হয় নি। গ্রামের মেয়েরা বল্লেন, আর এমন সুন্দর বৌও গ্রামে আর নেই। ঠিক যেন লক্ষ্মী ঠাকরুন।

গ্রামের ভিতর শোভার ছিল রান্নায় সবচেয়ে বেশি সুনাম। তাই সুনীলের মাতা তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। শোভা প্রথমে অনেক কিছু ভেবে ও-বাড়ীতে যেতে চায় নি। কিন্তু শেষে স্বীকৃত হল। আজ তিনদিন ধরে সে এই বিয়ে-বাড়ীতে আছে। এখানে এসে সে কাজ কর্ম্মের মাঝে আপনাকে যেন হারিয়ে ফেলেছে। সর্ব্বদাই সে কাজে ব্যস্ত। সব সময় সকলের মুখে শুধু শোভার নাম লেগে রয়েছে। আর শোভা চরকিবাজির মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বিয়ের পর সে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে—এত পরিশ্রম তার সইবার কথা নয়। তবু সব সময়ে তার মুখে হাসি লেগে থাকত। খাটতে খাটতে তার মুখ শুকিয়ে গেছে, তবু মনের মাঝে যেন তার একটুও গ্লানি নেই।

নতুন বৌটি সত্যিই খুব সুন্দরী। শোভা একটু সময় পেলেই তার কাছে গিয়ে বসত। তার সেই ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মতন অতুল সৌন্দর্য্য দেখে কিছুক্ষণের জন্তে তার মুখে কথা ফুটতো না। শেষে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, হেসে, ঠাট্টা করে এই দু'দিনের মাঝেই সে বৌটির মনে একটু স্থান অধিকার করে নিয়েছে। সুনীলের সঙ্গে তার দিনের মধ্যে হাজারবার দেখা হয়ে যেত। সুনীলের মন আজকাল আনন্দে একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তাকে দেখতে পেলেই শোভা আপনার হাতের কাজ নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ত যে, সুনীল বেশ বুঝতে পারত শোভা তাকে দেখতেও চায় না। প্রথমদিন বিকেল বেলায় হঠাৎ সুনীল একেবারে শোভার সামনে এসে দাঁড়াল। শোভা তখন কি একটা কাজে আটকে ছিল, সরে যেতে পারল না। সুনীল একটু মুচকি হেসে বল্‌ল, কেমন আছ শোভা? অনেক দিনের পর দেখা হল', না?

শোভা কোন কথা বল্লে না।

সুনীল আবার একটু হেসে বল্‌ল, তুমি এ বাড়ীতে যে বড়? আমি তো ভেবেছিলুম, আসবে না।

শোভা এইবার মাথা তুলে সোজা সুনীলের দিকে চেয়ে বল্‌ল, কেন, না আসবার কি হয়েছে?

—আমার বিয়েতে তুমি এলে, এ কিন্তু বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। সেইদিন থেকে আমাকে তো তোমরা দুচক্ষেও দেখতে পার না!

শোভা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল।

সুনীল আবার বল্‌ল, বৌ দেখেচ?

—দেখেছি।

—কেমন হয়েছে?

শোভা অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌ল, বেশ হয়েছে, খুব সুন্দর, ডানা কাটা পরিই হয়েছে।

—সুনীল শোভার দিকে একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে

বল্‌ল, ডানা-কাটা পরি হয়েছে—না ? বলে শোভার দিকে চেয়ে আর একবার একটু হেসে সে চলে গেল।

পাঁচ

বিয়ের গোলমাল অনেকটা কেটে গিয়েছে। তবু বাড়ীতে এখনও অনেক লোক। শোভার কাজও কমেছে, তাই কাল সে চলে যাবে। আজ তার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। তার মুখের হাসি আজ যেন একটু ম্লান হয়ে পড়েছে।

দুপুরে আহারাদির পর সে একটু সময় পেয়ে বৌ এর সঙ্গে গল্প করবার জন্যে তার ঘরের কাছে গিয়ে দেখল ঘরের দরজা বন্ধ। হয় তো সুনীলও সে ঘরে আছে। একবার একটু দেখবার জন্যে সে পাশের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বুকটা তার ধড় ফড় করছিল। দেখতে পেল—বৌ সুনীলের বুকের উপর এলিয়ে আছে। সুনীল মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে অবিরাম কি সব বলে যাচ্ছে।

সুনীলের সেই নয়নাভিরাম স্ত্রী তার বুকে, ওই ফুলের মত বৌ। শোভা ক্ষণকালের জন্যে চোখ ফেরাতে পারল না। তারপর, হঠাৎ সুনীল আবেগ ভরে তাকে বুকে চেপে ধরল—আর তার সেই কোমল, সুন্দর ঠোঁটে অজস্র চুম্বন এঁকে দিতে লাগল।

শোভা আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। ত্বরিৎপদে নীচে নেমে এল।

সেইদিন সন্ধ্যায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। খিড়কীর পুকুর-পারে দাঁড়িয়ে দুজনে গল্প করতে করতে হঠাৎ শোভা ঠাট্টাচ্ছলে বৌকে একটা ধাক্কা মেরেছিল। স্থানটা জল এবং কাদায় পিছল হয়েছে। বৌ ধাক্কা সামলাতে না পেরে পা ফস্‌কে পড়ে গেল—এবং একটা ইঁটে লেগে তার ঠোঁটের খানিকটা কেটে গেল। রক্তে তার সমস্ত কাপড় ভিজতে লাগল। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে বৌ মুহুর্মুহু মুখে কাপড় চাপতে লাগল। শোভা কুটিল দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখল। বুঝি একবার তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরিয়েছিল। বুঝি একবার তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অত রক্ত দেখে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভয়ে তার চোখে জল এল। ছুটে গিয়ে বৌকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্‌ল, একি হোল ভাই! এ যে অনেকখানি কেটে গেল।

যন্ত্রণায় বৌ অস্থির হয়ে পড়েছিল। কোন কথা বল্ল না। শোভা ভাবছিল এখনি বাড়ীর সকলে টের পাবে; যখন শুনবে তার জন্যেই বৌ-এর এই দুর্দ্দশা তখন যে সবাই তাকে আর আস্ত রাখবে না। তাদের এত সাধের বৌ, ডানা-কাটা পরি। ব্যস্তভাবে জল দিয়ে বৌ এর ঠোঁটের রক্ত ধুয়ে দিতে লাগল। এক লহমায় ভিতর এ দারুণ সংবাদ বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পৌঁছল। অমনি বাড়ীর যে যেখানে ছিলেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে এলেন। কর্ত্তা এলেন, গৃহিণী এলেন, সুনীল এল। সকলেই বুঝতে পারলেন যে, শোভা দোষী—অমনি সত্যি সত্যিই সকলে তাকে যেন মারতে এল। কেউ বল্লে—ডাকাত মেয়ে! কেউ বল্লে—কি খুনে! সমস্ত বাড়ীটাই হুলুস্থুল পড়ে গেল। তাদের অত সাধের বৌ, তার এ কি হল! শুধু সুনীল মাঝে মাঝে শোভার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল, যেন তাকে তাজা খুন করবার মৎলব সে আঁটছে। শোভা চুপচাপ মাথা নত করে বসে রইল।

পরদিন। এরই মধ্যে সারা গ্রামে এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথার সৃষ্টি হয়ে সবার কানে ছড়িয়ে পড়েছে।

হিতাকাঙ্ক্ষীরা এসে বৌকে দেখে একবার 'আহা' করে যাচ্ছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে শোভাকেও দুটো রূঢ় কথা শুনিয়ে দিয়ে যেতে কসুর করছেন না। শোভার শ্বশুর বিনোদ মুখুয্যে স্বয়ং এসে এ দুর্ঘটনার জন্যে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন—এবং আজই শোভাকে নিয়ে যেতে চাইলেন।

সুনীলের রাগের চেয়েও দুঃখ হয়েছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। ক্ষত শুকিয়ে গেলেও একটা বিশ্রী দাগ থেকে যাবে। শোভার চলে যাবার কিছু পূর্ব্বে সুনীল তার ঘরে বসেই এই সব কথাই ভাবছিল, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেল। সুনীল চেয়ে দেখল শোভা। তাকে দেখে সুনীলের রাগে

জ্বালা করে উঠল। সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। এ ব্যাপারটা একটু নতুন। এতদিন শোভা তার দিকে ফিরেও চায় নি। নিকটে এসে সে যখন দাঁড়াল, তখন তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে! তার কুটিল দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যেন আগুন ছুটে বেরুচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুনীলের দিকে চেয়ে থেকে সে ডাকল, সুনীল-দা'!

সুনীল ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে একবার চেয়ে দেখল।

আমি আজ যাচ্ছি'

সুনীল বিরক্ত ভাবে বল্‌ল বেশ ত! কি হয়েছে তাতে?

— তে মায় আজ কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই!

সুনীল আর একবার চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। শোভা আরও একটু নিকটে সরে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, তোমার ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গিয়েছে, না? অমন সোনার মুখখানা আমি বিকৃত করে দিলুম! আমাকে খুন করলেও বোধ হয় তোমার রাগ যায় না। কেমন?

সুনীল বল্‌ল, না। তবে তুমি যে এমনি একটা কিছু করতেই বিয়েতে এসেছিলে—তা' আমি বুঝতে পারি নি

শোভা আবার ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে ভ্রূকুটি করে বল্‌ল তা' ব'ট! কিন্তু কেন আমি ইচ্ছে করে এ কাজ করলুম, তা' জানো, সুনীল-দা? দেখ, দুনিয়ার কারো ষোল আনা সুখ হয় না, সব দিক দিয়ে সুখী খুব কম দেখতে পাওয়া যয়। তাই তোমার এই সুখের ভিতর একটু ব্যথা এসে গেল।—বুঝ্‌ল সুনীল দা?

সুনীল কটমট করে চেয়ে রইল।

শোভা বল্‌ল, আর দেখ, পৃথিবীর সব লোকই কোন একটা কাজের প্রতিদান চায়—পায়ও। আমি চিরকাল তোমার ধ্যান করে কাটালুম; আর তুমি আমায় একেবারে মনে রাখবে না—ভুলে যাবে? তাও কি কখনো হয়? সে যে ভগবানের নিয়মের বাইরে। তাই আমি এই কাজ করে যাচ্ছি। বৌকে মাঝে মাঝে আদর করবে তো! তখন এই কালো কুচ্ছিত মেয়েটাকে একবার মনে কোরো। মানুষের সব আশা কি সফল হয়, সুনীল-দা? তুমি আশা করছিলে, বিলেত যাবে—তা' সফল হতে চল্‌ল। আশা করেছিলে, ডানা কাটা পরি বিয়ে করবে, লেখাপড়া-জানা মেয়ে বিয়ে করবে—তাও সফল হোল। কিন্তু তার মধ্যে একটু খুঁৎ যে থাকবেই।

শোভা হাঁপিয়ে পড়েছিল। রাগে, ঘৃণায় তার দেহের ভিতর যেন ভূমিকম্প হচ্ছিল। একটু থেমে সে আবার বল্‌ল, তোমার বৌ-এর এই যে অঙ্গহানি হ'ল, দেখতে সে কুচ্ছিত হয়ে যাবে তা' বলে তুমি কি তাকে ফেলে দিতে পারবে? তা' পারবে না। কেন না এখানে প্রাণের টান এসেছে—তুমি ভালবেসেছ। ভালবাসা হলে ধলা কুচ্ছিতের জ্ঞান থাকে না—কালোই তার কাছে সুন্দর, বৌ-এর ঠোঁটের দিকে চেয়ে আমার এ-কথাটাও মাঝে মাঝে মনে কোরো।...যাই বুড়ো বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বলে সে ত্বরিৎপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঝড়ের রাত্রি

[শ্রীমায়া বসু]

(গল্প)

(১)

আমার বাবা ছিলেন এটর্ণি; অবস্থা তাঁর বেশ ভালই ছিল। আমি যখন ষোল বৎসরের, তখনও আমার বিবাহ হয় নাই। হঠাৎ আমার বিবাহের কথাবার্তা হইতে লাগিল, কোনও এক প্রসিদ্ধ কলেজের পালি ভাষার অধ্যাপকের সহিত। পাত্রপক্ষ দেখিয়া গেলেন, শুনিলাম আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। শুনিলাম, পাত্র নাকি সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু, তাই বয়স্থা ও সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক, যে তাঁহাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে। আমি বাবার ঘরের বড় আর্সির সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাতা কাটিতেছিলাম, কথাটা শুনিয়া [illegible]

কৌতুক অনুভব করিয়া খুব একচোট হাসিয়া ভাবিতে লাগিলাম সেই সন্ন্যাসীটির কথা! নিজের প্রতিচ্ছবির পানে চাহিয়া বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়া ভাবিলাম, রোগের উপযুক্ত ঔষধই তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, সন্ন্যাসীর ধ্যান আমার চেষ্টা করিয়া ভাঙ্গিতে হইবে না—আপনিই ভাঙ্গিবে। শুধু আমায় একটু অগ্রসর থাকিতে হইবে।

বিবাহ স্থির হইয়া গেল। মহাসমারোহে গাত্রহরিদ্রা সম্পন্ন হইল, বিবাহের দিনও আসিয়া পড়িল। শুভদৃষ্টির সময় সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেমন দমিয়া গেলাম। স্বামীর আয়ত চোখের দৃষ্টি যদিও আমার মুখের উপরেই নিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে কৌতূহল ছিল না! সে যেন অলৌকিক, অপার্থিব উদাসদৃষ্টি! বিবাহ হইয়া গেল;—বাসর-সঙ্গিনীরা বাক্যহীন বরের জন্য যত প্রকার সনাতন শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহা চালাইতে লাগিলেন। বর কিন্তু বোধ হয় শিখ সেনাপতি বান্দার শিষ্য, কিছুতেই তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্য টলিল না। সুন্দর কান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল, তবু তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন। অবগুণ্ঠনের ভিতর আমি রুদ্ধ রোষে পুড়িতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দিদি আসিলেন; স্বামীর কানের অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, এঁরা মানুষ নাকি? কান দুটোর একি অবস্থা। ঋতেশ বাবু, আপনি ওঁদের এত অত্যাচার সহ্য করলেন কেন? উল্টে ওঁদের কান মলে দিতে হয়।

স্বামীর মুখের উপর সামান্য একটু হাসির ঝিলিক মারিল; বলিলেন, ওঁরা যদি এতেই একটু আনন্দ পান,—তবে হানি কি? একদিন ভিন্ন রোজ ত নয়!

জলখাবারের থালাখানা সম্মুখে রাখিয়া দিদি বলিলেন, আমি কে বলতে পারেন?

স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি আপনি আমার বড় শালি।

দিদি খুসী হইয়া বলিলেন, কানমলা ঢের খেয়েছেন এবার একটু মিষ্টিমুখ করুন। আয় বিভা!

জলখাওয়া শেষ হইয়া গেলে দিদি বলিলেন, এইবার ভাই বিভাকে কোলে করতে হবে।

স্বামী হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আপনি আমায় পঞ্চাশ ঘা ঘোড়ার চাবুক গুণে মারুন, আমি সইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু ও অত্যাচারটি করবেন না।

পাঁচ সাতজন স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া বলিল, চালাকি নাকি? তোল্ ত বিভাকে। বর না চোর; সব সময়ে চালাকি চলবে না।

দিদি পথরোধ করিয়া বলিলেন, না. আপনারা কোন বিষয়েই উপদ্রব করতে পাবেন না?

যাঁহারা উঠিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই নিকট আত্মীয়া, দিদির কথায় অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নির্জ্জন হইলে দিদি বলিলেন, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সাহস হচ্ছে না—

স্বামী বাধা দিয়া বলিলেন, ওকি, আপনি গুরুজন, অত কুণ্ঠিত হয়ে কথা কইছেন কেন? যা জানতে ইচ্ছে হয় স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করুন।

শুনেছিলাম আপনি নাকি সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছে করে ছিলেন?

স্বামীর মুখে প্রগাঢ় ক্ষোভের ছায়া পড়িল, বলিলেন, ইচ্ছে ত করেছিলাম, কৈ আর হ'ল।

দিদি একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এতটুকু বয়সে আপনার এ বাসনা হল কেন? চিরদিনই কি—

স্বামী বাধা দিয়া বলিলেন, না। তা যদি বলি, তাহলে তাহা মিথ্যে কথা কওয়া হয়। আমি কোন দিনও ধর্ম্মের ধার দিয়েও যেতাম না,—কোনদিন বোধ হয় ভুলেও ঈশ্বরের নাম করি নি। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে একবার কাশীতে গিয়ে এক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তিনিই আমার মনে ধর্ম্মের আলো ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আমি তখনই সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু জানি না কে বাবাকে সংবাদ দেয় তিনি এসে আমায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন। বাড়ীতে এসেও আমি মায়ের কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু মা রাজি হলেন না। শেষে আমায় বিবাহের জন্যে ধরলেন, মাকে যথাসাধ্য বুঝিয়েও কোন উপায় করতে পারলেম না। অমায় এক ডেলা আফিং দেখিয়ে বললেন, তাঁর কথা না শুনলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। ফল এই হ'ল যে, আমি আজীবন অনুশোচনা করব,—আর আপনার বোন আমার অভিসম্পাৎ দেবে।

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে চাহিয়া দেখিলাম দিদির মুখ ভয়ে বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। আমি হাসিয়া ভাবিলাম, সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙ্গা কি এতই শক্ত! বিশ্বামিত্রের মত কঠোর তপস্বীর ধ্যান ভাঙ্গিয়েছিল যে সেও ত নারী!

পরে বুঝিয়াছিলাম মনুষ্যচরিত্র বুঝিতে দিদি আমার অপেক্ষা কত দক্ষ!

(২)

পরদিন শ্বশুরবাড়ী গেলাম। শাশুড়ীর তিন পুত্র, আমি মেজ-বউ। বড়-জা আমার অপেক্ষা অনেক বড়, তিনি তিন সন্তানের মা! ফুল-শয্যা হইয়া গেল, স্বামী নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে একপাশে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া শুইয়া রহিলেন। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিবার পর আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, বৈদ্যুতিক বাতিকে অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া মৃগচর্ম্মের উপর পদ্মাসনে বসিয়া আমার স্বামী যোগ-সাধনায় মগ্ন। চোখের সম্মুখে একটা বড় ঘড়ি ছিল, দেখিলাম তখন রাত্রি দুইটা।

আমি প্রথমটা একটু হাসিলাম, ভাবিলাম বেশিদিন এ যোগ-সাধনা করিতে হইবে না, আমি অচিরেই ইহাকে নষ্ট করিয়া দিব। ভোর চারিটার সময় তিনি ধ্যান ভাঙ্গিয়া কি একখানা বই বাহির করিয়া প্রদীপের সলিতা উস্কাইয়া দিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি অনুমানে বুঝিলাম তাহা বেদ। তিনি পালি ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পরম পণ্ডিত।

পূর্ব্বদিকে আলো ফুটিয়া উঠিতেই তিনি বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, জয় জগদীশ্বর! তাহার পর সেই মাঘের শীতে স্নান সারিয়া মিনিট কুড়ি পরেই ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বদিকের জানালার কাছে পূজায় বসিলেন। আমি তাঁহার রকম দেখিয়া চমক খাইয়া গেলাম। বেলা হইয়া যাইবার ভয়ে আমি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলাম। মনে করিয়াছিলাম, আমাদের কথাবার্ত্তার ইতিহাস শুনিবার জন্য সকলেই পীড়াপীড়ি করিবে, কিন্তু কেহই আমায় সে বিষয়ে একটি প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিল না। বড়-জা আমায় কাছে বসাইয়া বলিলেন, শোন ভাই, তোমায় গোটাকত কথা বলি। মেজ ঠাকুরপো কি ধরণের মানুষ কাল রাত্রে দেখেছ ত?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বড়-জা আমায় কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, ওর ব্যবহারে অভিমান করে থাকলে তোর চলবে না বিভা, ও সন্ন্যাসী—তাকে টেনে নাবিয়ে সংসারী করতে হবে এই জন্যেই তোকে দেখে বেছে আনা হয়েছে, কেমন পারিব ত?

আমি মাথা নত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলাম, আমি কি করব, দিদিমণি?

দিদিমণি বলিলেন, ভগবান তোকে রূপ দিয়েছেন অসামান্য বুদ্ধিও দিয়েছেন; ছটোকে চালিয়ে নিতে পারলে পুরুষের মন টলাতে কতক্ষণ লাগবে বিভা—লজ্জায় এক-পাশে সরে থাকলে তোর চলবে না; তুই-ই হলি বর আর ওই হ'ল ক'নে, তোকেই এগিয়ে গিয়ে তার লজ্জা ভেঙ্গে দিতে হবে।

শাশুড়ীকে আসিতে দেখিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন, বউ-মা, ঠাকুর জন্যে কি কুটলে? কাজের বাড়ীতে কি এসব পোষায়! বলব কি বল, বললে নিজে রেঁধে খাব।

তাহলে কি কুটব বলুন? বলিয়া বড় জা শাশুড়ীর মুখ পানে চাহিলেন।

একটু ঝালের ঝোল আর একটা আলু ভাতে দাও। বেশী আর রাঁধবার সময় কৈ। তুমি কোট, আমি আসছি। বলিয়া শাশুড়ী চলিয়া গেলেন।

দিদিমণি হাসিয়া বলিলেন, মেজ-ঠাকুরপো নিরামিষ খায় কিনা, তাও আবার মা-ছাড়া কেউ ছুঁতে পাবে না।

সেদিন ছিল বৌভাত; লোকজন খাইবার পর আমি শাশুড়ীর ঘরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

পরদিন রাত্রে শুইতে গিয়া দেখিলাম, স্বামী মেঝের উপর একখানি কম্বল পাতিয়া, একখানি গায়ে দিয়া শুইয়া আছেন। খাটে উঠিয়া শুইতে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, অথচ কম্বল-শয্যার দিকেও পা বাড়াইতে ভয় করিতেছিল। অবশেষে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া আমি কম্বলের

একাংশেই গিয়া বসিলাম। স্বামী ঘুমান নাই, চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, চমকিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন, এখানে কেন বিভা, তুমি খাটে শোও।

আমি নিঃশব্দ নতমুখে রহিলাম, উঠিয়া গেলাম না।

স্বামী উঠিয়া বসিলেন; এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, তোমার কাছে আমি একটা ভিক্ষা চাইছি যদি তোমার সাধ্য হয় আমায় বঞ্চিত কোর না। স্বামীকে ভিক্ষা দিচ্ছ মনে কোর না, মনে কোর কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে ভিক্ষা দিচ্ছ।

আমি সশঙ্কদৃষ্টি ধীরে ধীরে তুলিয়া বলিলাম, কি?

স্বামী বলিলেন, আমার মা বাপ, ভাই ভাজ সকলে আমার মতের বিরুদ্ধে তাঁরা আমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। আমার যা ইচ্ছে তা তোমার দিদির কাছে বলেছিলাম, শুনেছিলে তুমি? আমি তাই তোমায় বলছি, তুমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমায় নাবিয়ে দিও না, কারণ সে শক্তিটা তোমার সব চেয়ে বেশি। তুমি আমার সঙ্গে অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার কোর, কোন বিষয়েই তুমি আমার সংসর্গে এসো না—আমার সংস্রব এড়িয়ে চোল। এইটেই তোমার কাছে আমার ভিক্ষা,—পারবে দিতে?

হায় ভগবান একি করিলে! এই চিরসন্ন্যাসীর সহিত আমায় দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া দিলে কেন? বাঁধিলেই যদি তবে ইহার সমান হৃদয়-বল দিলে না কেন? মাথার ভিতর কেমন একটা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম,—ইহা আমার পূর্ব্ব বন্ধু মূর্চ্ছা রোগ;—কিছুদিন হইতে সারিয়া গিয়াছিলাম বটে কিন্তু আজ আবার তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না, স্বামীর পায়ের কাছে ঘুরিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল,—ঠিক মনে হইল, এই মাত্র যেন একটা সুখ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলাম।

স্বামী উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি ফিট হয়? না, এই প্রথম হ'ল?

আমি শ্রান্তভাবে বলিলাম, আগে হ'ত। কবিরাজী চিকিৎসায় প্রায় বছর দেড়েক থেকে সেরে গিয়েছিলাম, তারপর এই আজ প্রথম হয়েছে।

স্বামী গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি এত কোমল,—তুমি পারবে না। প্রারব্ধ বলবান আমি কি করব! আমার উন্নতি চেষ্টা বৃথা।

বাঁশির শব্দে যেমন খল সর্প তাহার কুটিলতা ভুলিয়া যায়, স্বামীর কাতরতা পূর্ণ স্বরও ঠিক আমাকে তেমনই অভিভূত করিয়া ফেলিল; মনের ভিতর কি এক প্রেরণা অনুভব করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, আমি তোমার ইচ্ছের বাধা দেব না—তোমায় সঙ্কল্পচ্যুত করব না। যদি কোনদিন ভুলে যাই, তুমি মনে করিয়ে দিও।

স্বামী করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার জন্যে কিন্তু আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে। আমি স্বেচ্ছায় যা নিয়েছি তোমায় পরেচ্ছায় তাই বহন করতে হবে!

আমি কম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, রাত হয়েছে তুমি শোও। আমি শোব কোথায়? তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, খাটে শোও না। শোবে না? তবে না হয় মায়ের কাছেই,—কিন্তু এই শীতের রাতে কাজ নেই, তুমি খাটেই শোও।

উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম।

(৩)

পিত্রালয়ে মাসখানেক থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম। স্বামী দিদিমণির নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দিদিমণি প্রথমে অনেক বুঝাইলেন, শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া শাশুড়ীকে বলিয়া দিলেন। তিনিও অনেক বুঝাইলেন, শেষে সেই মুলতুবী আফিং য়ের ডেলাটির কথা তুলিলেন।

স্বামী বলিলেন, তখন কেন যে ভয় করেছিলাম জানি না, কিন্তু এখন আমি মোটে ভয় করি না। তুমি মরতে জান, আমি জানি না?

দিদিমণি কি একটা ইঙ্গিত করিলেন, শাশুড়ী থামিয়া গেলেন। স্বামীর শয়নকক্ষের পাশের কক্ষখানি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি দিনের পরদিন রাতের পর রাত, তাহাতে বাস করিতে লাগিলাম। কোনদিন একটি কথা একটি আহ্বান শুনিতে পাইলাম না। ঘরে যে মানুষ বাস করে তাহার আভাষ জানিতে পারিতাম, শুধু ভোরবেলা বেদমন্ত্রের শব্দে! তাহার পর সমস্তদিন সমস্ত রাত্রি কক্ষটি

নীরব নিস্তব্ধ। মনের ভিতর একটা আকুল বাসনা আছড়া-পিছড়ি করিত একটিবার তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্ত, তাঁহার সস্নেহ আহ্বান শুনিবার জন্ত, তাহার সংসর্গে থাকিবার জন্ত! সমস্ত প্রাণটা উন্মুখ হইয়া উঠিত একটিবার তাঁহার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে, তাঁহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িতে। মূর্চ্ছারোগ আবার স্থায়ী ভাবে ধরিয়া গিয়াছিল; প্রায়ই রাত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতাম; মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর যখন স্মরণ হইত, আজ এই পীড়ার সময় আমায় দেখিবার কেহ নাই কেহ একবিন্দু জল আমার মুখে দেয় না; কাহারও একখানি সস্নেহ কর আমার ব্যথা হরণ করে না, কাহারও চিন্তাক্লিষ্ট উৎসুক চক্ষু আমার মূর্চ্ছিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে না; অথচ আমি সধবা, স্বামী আমার পাশের কক্ষেই অবস্থান করিতেছেন, মাঝে শুধু একটা দ্বারের ব্যবধান, তখন আমার দুই চোখে যত জল ঝরিত বুঝি তত জল গঙ্গায়ও নাই।

ভাসুরের সহিত তিনিও আহারে বসিতেন, সুতরাং সেখানেও আমার কোন প্রয়োজন হইত না! এই সময় এবং কলেজের সময়টুকু ছাড়া তিনি তাঁহার ঘরে বসিয়া শাস্ত্রালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। চোখের দেখা মিলিত বটে কিন্তু মুখের কথা ছয় সাত মাস বাস করিয়াও শুনিলাম না। ক্রমশঃ আমি যেন ক্লান্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। দিদিমণি আমায় অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, শেষে শাশুড়ী স্বয়ং আমায় বুঝাইতে লাগিলেন, নৌকার হাল আমাকে ধরিতে হইবে, তাঁহার সন্ন্যাসী-পুত্রের যোগ নষ্ট আমাকেই করিতে হইবে। এ কথার উত্তর তাঁহাকে কি দিব? মাথা হেঁট করিয়া শুনিয়া যাইতাম। পিত্রালয়েও সকলে অনেক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, দিদি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আমার প্রকৃত অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিতেন। আমি যথাসাধ্য গোপন করিতাম বটে কিন্তু সত্যগোপন রহিল না, সকলেই জানিল আমি স্বামী পরিত্যক্তা!

মা আমার অদৃষ্টের কথা শুনিয়া ধরা শয়ন করিলেন, দিদি আমায় বুকে টানিয়া লইলেন, বাবা চোখ মুছিলেন—দাদা গালি দিলেন। আমি কাহারও কাছে শান্তি না পাইয়া শূন্য হৃদয়ে দূরে দূরে ঘুরিতে লাগিলাম। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে আমি যেন বেদধ্বনি শুনিবার জন্ত কান পাতিয়া থাকিতাম পরিচিত পদশব্দের জন্ত চকিত হইয়া উঠিতাম; বাল্যের সুখনীড়, কৈশোরের স্বপ্নপুরী আজ আমাকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কোথায় কোন্‌খানে একটা ফাট্ ধরিয়াছে, কোন্‌খানে যেন একটা বৃহৎ ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে,—আমি দূরে সরিয়া গিয়াছি; নিজেকে পূর্ব্বের মত কিছুতেই আবার এ সংসারে মিশ খাওয়াইতে পারিলাম না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন খালি হইয়া গিয়াছিল। মায়ের স্নেহ, বাবার আদর, দাদার যত্ন দিদির সহানুভূতি সে শূন্যতাপূর্ণ করিতে পারিল না, কোন সুখেই আমি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিলাম না; সকল সময়েই বুক চাপিয়া ধরিত একটা অতৃপ্তি, একটা ক্লান্তিকর অবসাদ!

মনে হইল, এখানকার এই সস্নেহ ব্যবহার অপেক্ষা বুঝি আমার সেই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া পাশের কক্ষের নিয়মিত চলাফেরার শব্দ শোনাও ভাল; বুঝি তাহাতেই আমার তৃপ্তি!

কোন খানেই শান্তি না পাইয়া আমি অধীর হইয়া উঠিলাম, আমার চারিদিকে সব শোভা সম্পদ শুখাইয়া শুষ্ক শীর্ণ জরাজীর্ণ হইয়া গেল!

(৪)

আবার শ্বশুর-বাড়ী আসিলাম সেই বৈচিত্র্যহীন শান্তিহীন জীবন যাত্রার কিছুই বৈলক্ষণ্য হইল না। এমনই করিয়া সুদীর্ঘ দুটি বৎসর মন্থর গতিতে কাটিয়া গেল। আত্মীয় স্বজন সকলেই আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে হতাশ হইয়া থামিয়া গেলেন স্বামীর কৃচ্ছ্র সাধন আরও বাড়িতে লাগিল, নিরামিষ ত্যাগ করিয়া হবিষ্যান্ন ধরিলেন, রাত্রের আহার ত্যাগ করিয়া যৎসামান্ত ফলমূল খাইয়া কাটাইতে লাগিলেন। আমার সম্বন্ধে সকলেই হতাশ হইল।

কিছুদিন হইতে দেবরের বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, বিবাহ হইয়া গেল। বধূ আসিলে মামীশাশুড়ী শাশুড়ীকে বলিলেন, মেজ বউমার মত বউ আনবার পর এ বউ আনলে কি বলে? শাশুড়ী আমার দিকে চাহিয়া চোখ মুছিয়া

বলিলেন, এমন যে রূপের ডালি বউ আনলাম খুকু আমার সোনার প্রতিমার দিকে চেয়েও দেখলে না, সিংহাসনের ঠাকুর আমার সিংহাসনেই তোলা রইল! সুন্দর বউ আনবার সাধ আমার মিটে গেছে।

স্বামী মা আমার মুখ পানে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। আমি শুষ্ক হৃদয়ে উঠিয়া গেলাম। বাড়ীতে বহু আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াছিলেন, ঘরের অকুলান হওয়ায় আমার ঘরেই ঠাকুরপোর ফুলশয্যা হইল। আমি কোথায় শুইব বারন্দায় দাঁড়াইয়া তাহাই আলোচিত হইতেছিল। স্বামী ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, বৌ-দি শোবার জায়গা যদি না থাকে, আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

দিদিমণি আনন্দে আমায় জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস বুঝি আমার অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। আমি কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। নববধূর মত কুণ্ঠিত চরণে ভিতরে গেলাম। তিনি বলিলেন ওখানে শোবার জায়গা নেই, তুমি খাটে শোও। ও ত বারমাস সাজানই আছে, একদিন তবু ব্যবহার হোক।

আমি শালখানা গায়ে দিয়ে মেঝের উপর শুইয়া বলিলাম, যখন সাজানই আছে, তখন তাই থাক। আমি বেশ শুয়েছি।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, সে কি! মাটীতে শুলে অসুখ করবে যে, ওঠ—সারাদিনের পরিশ্রমে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, আমি শ্রান্ত কণ্ঠে কহিলাম, আমি বারমাস মেঝেতেই শুই, আমার অভ্যাস আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

স্বামী নিজের দুইখানি কম্বলের একখানা আমার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এইটের আধখানা পেতে আধখানা গায়ে দিয়ে তুমিও শোও আমিও তাই করি। বলিয়া তিনি তাহাই করিলেন। তাহার পর গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া অগ্রহায়ণের দীর্ঘ যামিনী কাটিয়া গেল।

দেবরকে দেখিলাম স্ত্রীর সহিত কথা কহিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। একবাড়ী লোকের মাঝে একটু ফাঁক পাইলেই, অমিতার নিকট আসিয়া বসিতেছিলেন। হাসি কথায় তাহারা সর্ব্বদা বিভোর। কুটুম্বেরা বিদায় হইলে আমি আবার নিজের ঘরে থাকিতে লাগিলাম, পাশেই ঠাকুরপোর ঘর;—রাত্রি একটা বাজিয়া যাইত তখনও তাহাদের চাপা হাসি ও কথার শব্দ পাইতাম। নিজের অভাব যেন আরও তীক্ষ্ণভাবে মনে পড়িয়া যাইত। বধূ চলিয়া গেল। আবার আসিল সর্ব্বদা তাহাদের প্রফুল্লমুখ দেখিয়া মনে পড়িত আমার বিবাহের পর প্রথম আগমনের নিরানন্দ দিনগুলি কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

সেদিন শ্রাবণের একটা অন্ধকার রাত্রি;—আমি জানালার কাছে আসিয়া বসিলাম। বৃষ্টির বেগ তখন মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল টিপ টিপ করিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িতেছিল মাত্র। পূর্ব্বাকাশে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ ঝিলিক মারিতেছিল, মাতাল হাওয়া আমার দ্বার জানালায় ঘা মারিয়া ঝন ঝন শব্দে বাজাইয়া দিতেছিল। পথে লোক চলাচল বড় ছিল না; কচিৎ একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী বা ট্যাক্সীক্যাব্ নীরব পথকে মুখর করিয়া তুলিতেছিল। নিস্তব্ধ সুপ্তিমগ্ন অন্ধকার গৃহখানা যেন দুইহাত বাড়াইয়া আমার গলা টিপিয়া হত্যা করিতে চাহিতেছিল মনে পড়িল বিবাহের পর, প্রথম বর্ষার কত নিদ্রাহীন সশঙ্ক রজনীর কথা। যখন আজিকার এই সহনীয় একাকীত্বই কত বড় দুঃসহ ছিল, সেদিন বর্ষার রাত্রে সভয়ে আমি শয্যার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দুখানি অভয় বাহু ও নিরাপদ বক্ষাশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতাম! সেদিনের অবস্থা ভাবিয়া আজ এতদিন পরেও আমার চোখ ছাপাইয়া জল আসিল। বাড়ীর সম্মুখে একটি মেস ছিল;—তাহার ত্রিতলের কক্ষে অন্ধকারে বসিয়া কোন্ বিরহ সন্তপ্ত যুবক গাহিতেছিল;—

নিদ নাহি আঁখি পাতে!
তুমিও একাকী আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলন পিয়াসে, ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে,—
পল্লীর বধূ বিরহী পিয়ার মিলন পিয়াসে সন্ত্রাসে।
আমার যে সাধ বরষার রাত কাটাব তোমারই সাথে
গগনে বাদল, জীবনে বাদল, নয়নে বাদল ছাইয়া
এস গো, আমার বাদলের বধু চাতকিনা আছে চাহিয়া।
বিফলে রজনী যেতেছে বহিয়া, স্বজনী জাগে তোমারি লাগিয়া;
কোন্ অপরাধে হে নিঠুর নাথ! রয়েছ আমারে ত্যজিয়া!

জানি না সে তাহার কোন্ প্রিয়ের উদ্দেশে এ অর্ঘ্য নিবেদন করিতে ছিল—আমার হৃদয়-বীণার ভাঙ্গা তারে বড় করুণ বড় মর্ম্মস্পর্শী রবে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার বুকভাঙ্গা সুর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, আমারও শূন্য শয্যা! আমি লুটাইয়া পড়িলাম,—ওগো প্রিয়! ওগো দয়িত! কোন্ অপরাধে,—ওগো কোন্ অপরাধে আমি তোমার সঙ্গবঞ্চিতা, —তোমার পরিত্যক্তা! ০

(৫)

বৎসর কাটিয়া গেল অমিতা আমাদের একটি ক্ষুদ্র শিশু উপহার দিল। এই শিশুটিকে অবলম্বন করিয়াই আমি আমার ব্যর্থ জীবনটাকে গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিলাম। অমিতা ছেলের ভার বহিতে পারিত না, আমার কাছে খোকাকে দিয়া বলিয়া যাইত, নাও তোমার ছেলে মেজ-দি। আমি বাবা, ও ছেলেকে নিতে পারি না।

আমি তাহাকে তুলিয়া লইতাম; আদর করিয়া দুধ খাওয়াইয়া তাহাকে শান্ত করিতাম। সেদিন খোকাকে কোলে লইয়া আমি বারন্দায় বেড়াইতেছিলাম, কলেজ হইতে ফিরিয়া স্বামী তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমার নিকট হইতে খোকাকে লইয়া তিনি আদর করিয়া আবার আমার কোলে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, বাচ্চাটা তোমার কাছেই বেশির ভাগ থাকে, না?

বোধ হয় ছ'মাস পরে এই আমাদের কথা—মৃদুস্বরে বলিলাম, আমার কাছে থাকতেই খোকা ভালবাসে।

শিশুর চুলগুলি লইয়া নাড়িতে নাড়িতে তিনি বলিলেন, যত্ন পায় কি না। বৌ-মা ছেলে মানুষ উনি কি আর ছেলের যত্ন করতে পারেন! ওঁর এখন খেলে বেড়াবার বয়স— আমি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম; মনে হইল সকলের বেলা উচিত বিচার কর, শুধু আমি ছাড়া! আঠার বৎসর বয়সে অমিতার খেলিয়া বেড়াইবার বয়স, আর ষোল বৎসর বয়সে আমি সন্ন্যাস লইয়াছি,—তাহা আমার বয়সের উপযুক্ত হইয়াছিল!

তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন কিনা জানি না; বলিলেন, আমরা কিন্তু বেশ আছি কোন বাধা নেই—বন্ধন নেই, এই বেশ, নয়?

আমি কথা কহিলাম না, হৃদয় মথিত করিয়া শুধু একটা নিঃশ্বাস পড়িল। তুমি ত আছ ভাল কিন্তু আমার এ ব্যথাতুর নারীহৃদয় যে আশ্রয় অবলম্বন শূন্য রিক্ততায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, বুঝি আমার অন্তরের বেদনা আমার মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার ভারি কষ্ট হয়, না?...এমনি একটি খোকার জন্যে,—আমি নির্ব্বাক ভৎসনায় তাঁহাকে নীরব করিয়া দিয়া বলিলাম, যাও, তুমি কাপড় ছাড়োগে।

আমি খোকনকে দুধ খাইয়ে পাশের সিঁড়ি বহিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেলাম।

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। বৈশাখ মাসে দেশ হইতে পিসশাশুড়ী তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে আসিয়াছিলেন। বর বরণের সময় সকলের সহিত আমিও গিয়া দাঁড়াইলাম। শাশুড়ী বরণডালা চাহিলেন দিদিমণি বলিলেন, তোর পাশেই ত আছে দে না বিভা।

আমি তুলিতে যাইবামাত্র পিসশাশুড়ী চীৎকার করিয়া নিষেধ করিলেন। আমি থতমত খাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

পিসি-মা দিদিমণিকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কি আক্কেল গা বাছা তোমার! বিয়ের জিনিষে কি মেজ বউমাকে হাত দিতে আছে! জন্মকাল মাটীর ভাঁড়ের মত সিকেয় তোলা রইল, সোয়ামীর ছায়া দেখতে পেলে না, ওকে কি শুভ কাজে হাত দিতে বলে! আর তোমাকেও বলি মেজবৌমা, তোমারই বা কি আক্কেল; কি বলে ছুঁতে গেলে!

নরলোকে এ ব্যথা কাহাকে জনাইব, কোন্ জন্মার্জ্জিত পাপে যে আমার এ শাস্তি তাহা ত আমিও জানি না! দয়াময়, কেন এমন করিলে? আমি যেন ঠিক ঈশ্বরের চরণে ব্যথা জানাইবার জন্যই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ঠিক উপরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন স্বামী, তাহার সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই তিনি ইঙ্গিতে আমায় ডাকিলেন। ইঁহাদের সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে যাইতে পারিলে তখন আমি বাঁচি, আমি দ্রুত চলিয়া গেলাম।

সিঁড়ির পাশেই তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন; বাহু প্রসারণ করিয়া আমায় টানিয়া লইলেন, তাহার পর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, চোখে এতজল কেন বিভা! পিসি মা বলেছেন তুমি স্বামী সোহাগিনী নও, সেটা এত বেজেছে তোমায়, আর ত তুমি দুর্ভাগিনী নও বিভা, আর কেঁদ না, চুপ করো!

সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মাঝে আমি আজ প্রথম তাঁহার সস্নেহ স্পর্শ পাইলাম, তাঁহার আদর উপভোগ করিলাম, বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার অশ্রুবন্যা তাঁহাকে ভিজাইয়া দিল। আমি তাঁহার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া দরবিগলিত ধারে কাঁদিতে লাগিলাম। জীবনের মাঝে সেই আমার প্রথম ও শেষ শুভ-মুহূর্ত্ত,—জগদীশ্বর! তখনই যদি আমার বক্ষস্পন্দন বন্ধ করিয়া দিতে, তোমার কতটুকু ক্ষতি হইত, তোমার বিশ্বের পরিচালনায় কোন্ ব্যতিক্রম ঘটিত!

স্বামী আমায় তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন, আমার জলসিক্ত চক্ষু দুটিতে দুটি চুম্বন দিয়া বলিলেন, আমার ভ্রম ভেঙ্গে গেল বিভা; যার সঙ্গে যা দেনা-পাওনা তা নিষ্পত্তি না করে নিলে পুণ্যের পথে এগোন যায় না। কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ তাকে নীচে নাবিয়ে দেয়। আমায় তুমি কোন দিনও এতটুকু অনুযোগ করনি কিন্তু কত সহাই তুমি নিঃশব্দে সয়েছ তা আজ বুঝতে পেরেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে অনেক অন্যায় ব্যবহার করেছি কিন্তু এই শেষ—আর করব না।

দুজনেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। সহসা দ্বার জানলা বন্ধ হওয়ার শব্দে দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম, স্বামী বলিলেন, একি ঝড় নাকি? কাল-বৈশাখের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হল?

কি বিপদ, বিয়ে বাড়ী,—

বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, রুদ্ধ দ্বার জানলা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, ভয়ঙ্কর একটা শব্দ শুনিতে লাগিলাম, গোঁ গোঁ গোঁ!

প্রায় আধঘন্টা কাটিয়া গেল, স্বামী বলিলেন, বসে থাকলে চলবে না। আমি নীচে যাই দেখি কি হচ্ছে। আমার বাহু বন্ধন ছিঁড়িয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

দ্বারের বাহিরে পা রাখিতেই একটা কর্ণ বধিরকারী প্রচণ্ড শব্দে দেহ যেন অবশ হইয়া গেল। পাশের বাড়ীর বড়ালদের ত্রিতলের নূতন ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে আমাদের বারান্দার ছাদে এবং তাহারই চাপে আমাদের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে!

ঈশ্বর, যে উদ্যত বজ্র আমার বুকের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলে তাহা দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মাথায় নিক্ষেপ করিলে না কেন? ওগো প্রাণাধিক! জীবনের মাঝে একদিন যদি তোমার বক্ষে স্থান দিয়াছিলে তবে আরও দুই মুহূর্ত্ত বাহুডোরে বাঁধিয়া রাখিলে না কেন? তুমি যে বলিয়াছিলে, আর আমায় ত্যাগ করিবে না, তাহা কেন ভুলিয়া গেলে প্রিয়তম!

বেদুঈন

[শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত]

ধবল কঙ্কাল যেথা দিকে দিকে রয়েছে ছড়ায়ে
অন্তহীন বালুকা জড়ায়ে,
দিবানিশি জ্বলিতেছে লক্ষ চুল্লীশিখা,
পথে পথে দৈন্য যেথা, গ্লানি, বিভীষিকা,
নিসঃহায় প্রাণ,
মরুভূ-ঝটিকা গর্জ্জে' দিকে দিকে ক্ষিপ্ত, বহ্নিমান্ !
কোটি কোটি বিষতীব্র ভুজঙ্গম ফণার ঘূর্ণনে
মরীচিকা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,—
মোহের মাধুরী মাখা মৃত্যুর পাথার !
—শ্যামা বসুন্ধরা ত্যাজি সেই পথে তুমি কেন যাও বার বার
ওগো বেদুঈন !
— মোদের নগরী পল্লী আমাদের সুসজ্জিত, শান্ত রাত্রি দিন
ঝলমল প্রাসাদ বিপণি,
লীলাকক্ষ, নৃত্য গীত, প্রমোদের ধ্বনি,
বিভ্রম, বিলাস,
মনোহরা এ ধরণী,—পুষ্পকুঞ্জ, জোৎস্নানিশি, সুরভিত এই মধু মাস,
এ বিচিত্র গৃহাঙ্গন, এই অন্তঃপুর,
শান্ত সুমধুর,
প্রেয়সীর হাসি অশ্রু মাখা ;
—যৌবনের এ জয়-পতাকা,
মোদের এ বর্ষ, ঋতু, উষা, বিভাবরী
তোমারে করে না মুগ্ধ,— কোন্ দূর দিগন্তের দীর্ঘ পথ ধরি'
ধূ ধূ ধূ ধূ বালুকার বিজন সঙ্কটে,
চক্রবালতটে
উঠিতেছ আস্ফালিয়া তুমি !
—তোমার চরণতলে নাচিতেছে যোজনান্ত তপ্ত মরুভূমি
উন্মাদ, উত্তাল !
বালুকার পারাবার, আকাশের আরক্ত মশাল
বক্ষে তব আসিতেছে ছুটে !
শ্যেনতীক্ষ্ণ তীব্র স্বচ্ছ তোমার ও-আঁখির সম্পুটে
পলে পলে ঘুরে যায় ধূম্রাকাশ গিরি, বালিয়াড়ি।

তন্দ্রাহারা যাত্রী ওগো,—শ্রান্তিহীন মরু-পথচারী,
　　　　হারায়েছ দিশা
অনন্ত নৃত্যের লোভে,—অফুরন্ত উল্লাসের তৃষা
　　　চিত্তে তব নিরন্তর উঠিতেছে দহি',
　　　　হে দূর-বিরহী!
—মৌন গৃহতলে বসি নিরালা,—একাকী,
শতাব্দীর সভ্যতার পিঞ্জরের পাখী
আছি মোরা আর্ত্ত ম্লান আঁখি দুটি তুলে'!
　　　—সীমাহারা নীলিমার কূলে
　　　যেতে চাই ছুটে,
অসংখ্য শৃঙ্খলাঘাতে বিদ্রোহীর বকে শুধু রক্ত ওঠে ফুটে!
　　　ভাঙে না এ প্রাচীরের কারা,
জেগে আছে চিরন্তন ব্যর্থ বিধি বিধানের এই মিথ্যা বিরাট পাহারা!
　মনে মোর ঘুরে মরে লক্ষ্যহারা, বাধাবন্ধহীন
　　　মরুভূর কোন্ বেদুঈন!

পদ্মের পঙ্ক

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র]

১

সরস্বতী পূজার কীর্ত্তন বায়না করিবার ভার এবার সুরেশের উপরেই পড়িয়াছিল। ল-পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, কেনা কাটাও সব এক রকম সারা হইয়াছে, এই গানের ব্যবস্থাটা করিতে পারিলেই তাহার কলিকাতার কার্য্য সমাপ্ত হয়। কিন্তু সমস্যা হইয়াছিল এই যে, এ ব্যাপারটি প্রতিবারেই অন্য লোকে সম্পন্ন করিয়াছে। তাহার এ বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। কোথায়, কাহার দ্বারা, কি ভাবে এই দুরূহ ব্যাপারটি সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া সে আকুল হইতেছিল।

আবাল্য সুহৃদ কমলের নিকট যাইয়া সুরেশ উপস্থিত হইল। সে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা মেসে থাকিয়া এম, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সমস্ত শুনিয়া কমল বলিল, চল না হে, ব্যাপারটা কি দেখেই আসা যাক। একটা নূতন রকমের অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে।

সুরেশ বলিল, সত্যিই যাবি? মন্দ হয় না।

সুরেশের যৌবনচিত্তে কবিত্বের যে হাওয়া বহিত, সমস্ত অন্তর দিয়া সে তাহা উপভোগ করিত। যে সব চিত্রে কবি প্রেমের করুণ ছবি আঁকিয়া পাঠকের হৃদয় জয় করিয়াছেন, সুরেশের চিত্তে সে চিত্রগুলি সুগভীর রেখাপাত করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া সেই পুরাতন কাহিনীগুলির উপর নূতন করিয়া চোখের জল ঢালিয়া সেগুলিকে সজীব রাখিত। কমলের সহিত এই খানেই তাহার সত্যকার মিলন। তাহারও উদার অন্তঃকরণ সমস্ত বিপরীত যুক্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া এই সকল ব্যথিত বঞ্চিত প্রেমিকদের সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

কমলের কথায় সুরেশের মাথায় চট্ করিয়া সাবিত্রী, শান্তা, বিজলী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি উঁকি ঝুঁকি মারিয়া গেল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত সমস্যা মন হইতে দূর হইয়া এক অতি

অস্পষ্ট অথচ রমণীয় ছবিতে, তাহার মন ভরিয়া উঠিল। কমলকে ধাক্কা দিয়া সে বলিল, তা হলে শীগ্‌গীর্ ওঠ্।

কমল কহিল, এক্ষুনি? এই দুপুর বেলা?

সুরেশ বলিল, না, এখন কেন, রাতদুপুরে বেরিও।

কমল্ জামা পরিতে পরিতে বলিল, বাজে কাজে অতগুলো টাকা অপব্যয় না করে, দিব্যি পুরী বেড়িয়ে আসা যেত। গান ত গাইবে ছাই! ওদিকে সমুদ্রের সে কি অপরূপ রূপ! জানিস, সেই নির্ব্বাক রহস্যময় অনন্ত জলরাশি—

সুরেশ হাসিয়া বলিল, হাঁ, একশ বার তুমি দেখে এসেছ কি না, তাই আমাকে দিব্যি বুঝিয়ে দিচ্ছ কেমন সুন্দর সমুদ্রের রূপ!

আঃ, ঐ তোর দোষ! চোখে না দেখলে বুঝি আর দেখা হল না? তবু ত পুরীর সমুদ্র কই কাৎলা থেকে চুনোপুঁটি সবাই একটু একটু দেখিয়েছেন। কিন্তু ভাই, তুই যে বলিস্ চোখ বুজলেই তুই বিমলা অভয়া অচলা সুচরিতা ইত্যাদি দেখতে পাস্, সে কিন্তু ভাই তোর একেবারে দিব্যদৃষ্টি।

আচ্ছা আচ্ছা। চল্, আজ স্থূলদৃষ্টিতে কিছু দেখে নেওয়া যাক্।

২

ঘণ্টাখানেক পরে মাণিকতলার মোড়ের কাছে আসিয়া কমল সুরেশকে কহিল, কি হে, অনন্তের পথ ধরেছি না কি? শেষ কি পাওয়া যাবে?

সঙ্গের লোকটাকে সম্বোধন করিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, ওস্তাদ, আর কতদূর যেতে হবে?

লোকটি কর্কশ কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, এই যে বাবু, এসে পড়েচি, এই গলিটা পেরিয়েই।

তাহার মুখ বসন্তের গভীর দাগে অত্যন্ত শ্রীহীন, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পানের রস কস্ বাহিয়া চুয়াইয়া পড়িতেছে। পরিধানে অত্যন্ত মলিন একখানি চওড়া পেড়ে ধুতি। তাহার উপরে ততোধিক ময়লা এবং ছিন্ন একটা ছিটের পাঞ্জাবী, গলায় ময়লা কম্ফার্টার জড়ানো। হাতে একখানি বেহালা।

অল্প পরিসর-অপরিচ্ছন্ন গলিতে একটা দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ওস্তাদ বিনয় সহকারে বলিল, বাবু, একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি এসে ডেকে নিচ্ছি।

সে চলিয়া গেল। সুরেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কমলকে বলিল, জায়গাটা কি নোংরা!

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, এই ত ঠিকই গোবরে পদ্ম-ফুলই ত আমরা চাই। লক্ষ্য ভুলে যাচ্ছ যে হে।

আসুন বাবু—ওস্তাদ হাতদুখানি অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে রাখিয়া সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া আহ্বান করিল।

কমল ও সুরেশ তাহার অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। একটা কক্ষের দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ওস্তাদ পুনরায় অভ্যর্থনা করিল, ভিতরে আসুন বাবু।

পায়-সু খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়েই বিস্মিত কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিল, এক পার্শ্বে মেঝেতে পুরু গদীর উপর শুভ্র চাদর। চতুর্দ্দিকে মোটা মোটা তাকিয়া বালিশ এবং তাহার প্রত্যেকটির উপরে অড়ে ঝালর লাগানো—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটি একটি চৌকোনা বালিশ। সম্মুখের দেয়ালে মস্ত একখানি আয়না। তাহারই পাশে দেয়ালে সন্নিবদ্ধ তাকের উপরে পেয়ালা পিরিচ, ছোট ছোট বাক্সরে পাত্‌লা কতগুলি মদের গ্লাস, খালি ফুলদানী। একধারে আলনায় কোচান শাড়ীর সারি। দেয়ালে দেয়ালে নগ্ন নারীমূর্ত্তির অশ্লীল ছবি। একপাশে একটি হারমোনিয়ম কাপড় দিয়ে ঢাকা। তাহার পাশেই বাঁয়া-তব্‌লা।

ওস্তাদের অনুরোধে সুরেশ ও কমল সেই বিছানার একধারে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিল। একটা লোককে ডাকিয়া সে বলিল, খোল্‌টা নিয়ে আয় ফেলো। আর ওকে একটু শীগ্‌গীর করে আসতে বল।

সে লোকটা একটা খোল আনিয়া তাহার আবরণ খুলিতে খুলিতে বলিল, আস্‌ছে।

অনেকক্ষণ—কতক্ষণ সুরেশ বা কমলের তা খেয়াল ছিল না—অধীরভাবে বসিয়া থাকিবার পর অকস্মাৎ পার্শ্বের একটা দরজা দুম করিয়া খুলিয়া গেল। বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়িকা শ্রীমতী রাণী থিয়েটারী ভঙ্গীতে প্রবেশ করিলেন. হস্তের

আধ ময়লা রঙিন্ কাপড় বাঈজী ধরণে পরা, গায়ে হাতকাটা বুকখোলা একটা জামা, হাতে গিল্টির চুড়ী, কানে একরাশ মাকড়ি। চেহারা অত্যন্ত কঠোর—কমনীয়তার লেশও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোথায়ও নাই। তাহার উপর পুরু করিয়া পাউডার মাখিয়া, দুই ভ্রূর মাঝখানে চোখের কোণে কাজল দিয়া শ্রীহীনতা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুরু ওষ্ঠের ভিতর হইতে মসীবর্ণ দাঁত দেখা যাইতেছে। লজ্জায়, নূতন রকম আশঙ্কায় সুরেশ মাথা হেঁট করিয়া বসিল। কমল সুরেশকে আরও ঘেঁসিয়া বসিয়া তেমনি দৃষ্টি নত করিল।

রাণী অকারণে একবার ঘরের এপাশ ওপাশ নৃত্যের ভঙ্গীতে হাটিয়া আসিল। বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, হাত দুটি জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিল, নমস্কার বাবুরা। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নাকি সুরে হাঁকিল রামখেলান্, রামখেলান্।

গাট্টা গোট্টা রামখেলান্ আসিতেই বিবি হিন্দীতে হাঁকিল, উধারকা জান্‌লা খোল্ দেও। ঝাঁকো বাতি দেনে বোলো—জল্‌দি।

সে চলিয়া যাইতেছিল, আবার অপূর্ব্ব সুরে বলিল, হারমোনিয়ম্ দেও ইধার!

হারমোনিয়ম্ খুলিতে খুলিতে উঃ আঃ শব্দ করিয়া সুরেশের দিকে চাহিয়া গায়িকা বলিল, ধূমপাড়ার রাজ বাড়ীতে প্রায় ছমাস ছিলুম। রাজভোগ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেছি। ইস্! এ রামখেলান্, দোসরা—হারমোনিয়ম্ দেও।

ওকে? বিধু? দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? যা, যা, পান নিয়ে আয়।

পান আসিল, সুরেশ ও কমল জানাইল তাহারা পান খায় না।

রাণী ব্যস্ত হইয়া বলিল, সেকি বাবুরা, আমার মাথার দিব্যি, একটা খেতেই হবে। এ বাজারের পান না, আমার নিজের হাতে সাজা পান।

সুরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া মাথা নাড়িল। কমল ওস্তাদের দিকে চাহিয়া রুদ্রস্বরে কহিল, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর যা করবে কর না কেন?

রাণী সেদিকে কর্ণপাত করিল না। দরজার দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, বিধু, আবার দরজায় দাঁড়িয়েছিস? কেন্ লা? যা, যা, ওখান থেকে। গান শুনবি? তা মর্ পোড়ারমুখি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

কমলের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার গান শুনলে ও জমে যায়, নড়বে না কিছুতেই। বিধুর দিকে ফিরিয়া বলিল, কাল-সন্ধ্যের সময়, মাইরি বলছি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকিস নে।

সুরেশ ও কমল বিরক্ত হইতেছিল বুঝিয়া ওস্তাদ একটু তাড়া দিয়া বলিল, সুর দাও।

রাণী সুর দিল এবং যতক্ষণ লোকটা বেহালার সুর বাঁধিল ততক্ষণ অনর্গল বকিয়া চলিল, সুরেশদের দেশে সে একবার মুজ্‌রো করতে গিয়েছিল; বাসপাতার জমিদার নরেনবাবুকে সে খুব জানে, তার ভবানীপুরের বাড়ীতে সে কতবার গেছে ইত্যাদি আরও কত কি বলিল সুরেশ সব শুনিল না।

গান থামিতেই খোল বাজিয়েটি সুরু করিয়া দিল, এমন গাইয়ে সারা শহর চুঁড়লেও আর মিলবে না, এমন অল্প বয়সে এমন ওস্তাদ আর নেই, সে বাজী রেখে বলতে পারে। বাবুদের এতবড় কাজে একটু বেশী খরচ করে যদি একে নিয়ে যান তবে লোকে একখানা কেত্তনওলী দেখ্‌বে আর বাবুদের মুখও উজ্জ্বল হবে!

কমল তাড়া দিয়া বলিল, থাম, থাম। ওস্তাদের দিকে চাহিয়া বলিল, তাহলে কথাবার্ত্তা তোমার সঙ্গেই হবে।

গায়িকা হাসিয়া বলিল, এখানেই হোক না বাবু।

না, না, সে ওর সঙ্গেই হবে। সুরেশকে বলিল, চল যাই।

রাণী অমনি বলিল, যাই বলতে নেই ভাই, বল আসি।

সুরেশের হাত ধরিয়া দুড় দুড় করিয়া কমল নামিয়া গেল এবং রাস্তায় পড়িয়াই কহিল, যেমন দেখ্‌তে, তেমনি গাইতে।

সুরেশ বলিল, বিশ্রী, বিশ্রী, কি অসভ্য!

কমল বলিল, ও নিশ্চয়ই খেমটার মুজ্‌রো করে বেড়ায়, লোকটা একটা ধাড়ি গাধা,—এক নাচওয়ালীর কাছে নিয়ে

এসেছে। ওর কাজ কেত্তন গাওয়া? ওকে নিয়ে গেলে ও 'আয়ে সেঁইয়া' যদি না ধরে' বসে আমায় তখন বলিস্।

ওস্তাদ আসিতেই উভয়ে গম্ভীর হইল। কমল বলিল—ওকে আমরা নেব না।

বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া ওস্তাদ বলিল, বেশ। আসুন আমি অন্য ভাল গাইয়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বহু ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রি প্রায় আটটার সময় চীৎপুরের মোড়ে আসিয়া সুরেশ বলিল, ভাই, আর না। রাত্তির আটটা বাজে। কমল সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, হাঁ, এ ট্রামটা ধরা যাক্।

সঙ্গের লোকটি অবনত হইয়া, হাতজোড় করিয়া অত্যন্ত কাতরতার সঙ্গে বলিল, বাবু, অনেক কষ্ট আপনাদের আমি দিয়েছি। কিন্তু আর একটু কষ্ট সইতেই হবে। সারদার গান শুনেই আপনাদের কান খারাপ হয়ে গেছে। সে যে যেতে পারবে না সে ত আগে জানতুম না। আর একটি গান শুনে বাবু আমাকে দয়া করুন।

তাহার কাতরতা দেখিয়া কমল বলিল, চল। খুব শীগ্‌গির কথাবার্ত্তা শেষ করবে।

একটু ঘুরিয়া গ্রে ষ্ট্রীট হইতে তাহারা একটা গলিতে প্রবেশ করিল। সেই একই রকম অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন গলির পর গলি, কদর্য্য চেহারা, অভদ্র বেশ, অসংযত বাক্য সুরহীন কর্কশ কণ্ঠ একটানা চলিয়াছে। উভয়েই বিরক্ত, শ্রান্ত। কিন্তু উপায় নাই।

একটা ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ওস্তাদ বলিল, বাবু, দয়া করে একমিনিট সবুর করুন। এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিল।

বাড়ীটির সম্মুখে সারি সারি ক'খানা মেটে বাড়ী। সবগুলির সম্মুখেই কুমড়ো ফালির মত ছোট একটু একটু বারান্দা, রুদ্ধদ্বার সেই গৃহগুলি পশ্চাৎ করিয়া সুরেশ বলিল, ওরে ও যে আবার হিন্দী গাইছে। আর গলায় যা নমুনা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এখনও ত পালালে অনেকটা কষ্টের হাত থেকে বাঁচা যেত।

কমল হাসিয়া বলিল, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। সবুর কর যদি মেওয়া ফলে। আমি ভাই, এইখানে একটু বসি।

সুরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, দূর, এইখানে কেন? এই ত দিব্যি একটু রোয়াক পাওয়া গেছে। নাই বা হল মার্ব্বেলের? তবু একেই আমি সাদরে বরণ করছি। গরজ কত বড় বালাই তা না হলে তা কেমন করে বুঝবে?

উপরের গান থামতেই কমল বসিয়া বলিল, prelude ত শেষে হল। এইবার ভয়দা হচ্ছে।

অবসাদ, ক্লান্তি, লজ্জা, সঙ্কোচ সব জড়াইয়া সুরেশের চিত্ত মূর্চ্ছাহতের মত অসাড় হইয়া গিয়াছিল। একটু নড়িয়া চড়িয়া, বা নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করিবার মত শক্তি যেন তাহার আর ছিল না। মনে মনে বেশ বুঝিতেছিল, যে কার্য্যের জন্য বাহির হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করা তাহার দ্বারা সম্ভব হইবে না, এ শুধু পণ্ডশ্রম হইতেছে। প্রথম যে একটা অসঙ্গত এবং অসম্ভব খেয়াল লইয়া বাহির হইয়াছিল তাহা মনে করিতেও এখন লজ্জা বোধ হইতেছিল এবং নিজেকে মূর্খ বলিয়া পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতেছিল; তবু জোর করিয়া চলিয়া যাইতেও পারিতেছিল না। নিজেকে এক রকম এই লোকটার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ইহারই নির্দ্দেশমত এই সকল অসম্ভব স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সে আসিয়া ইহাদের উপরে লইয়া গেল। সিঁড়ি ভাঙিতে পা যেন আর চাহিতেছিল না। ঘাড় হেঁট করিয়াই সুরেশ চলিতেছিল, কোমলকণ্ঠের 'আসুন' আহ্বানে সচকিত হইয়া মুখ তুলিতেই বিস্ময়ে তাহার সমস্ত অবসাদ ঘুচিয়া গেল। তেমনি নির্ব্বাক হইয়া আরও হয় ত কতক্ষণ সে চাহিয়াই থাকিত, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সেই রমণী কমলকে তেমনি একটি ছোট্ট 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিল এবং কমলও তাহার পৃষ্ঠদেশে অল্প ধাক্কা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন!

সুরেশ ঢুকিতেই যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করিয়া প্রভাবতী বলিল, নমস্কার! অনুগ্রহ করে বসুন।

সুরেশ প্রতি নমস্কার করিল। কমল একটু হাসিয়া মাথাটা নাড়িল। প্রভার বয়স কুড়ি কি বাইশ। তাহার

রূপ দেখিয়া দুই জনে মুগ্ধ হইয়া গেল। সুন্দর মুখে ডাগর চোখ দুটি কালো তারা। দৃষ্টি স্থির, নম্র। সুগঠিত নাসিকার নিম্নে পাতলা ওষ্ঠ দুখানি টুকটুকে রাঙা। পান দোক্তার রস বর্জ্জিত, পরিষ্কৃত দন্তগুলি মুক্তার সারির মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। চাঁপাফুলের মত রং। সর্ব্বোপরি অটুট স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক লালিত্য ইহাকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সমস্ত জুড়িয়া এমন একটা শান্ত সংযত ভাব, দৃষ্টি এমন স্নিগ্ধ, ভঙ্গী এমন সহজ যে চাহিয়া চাহিয়া সুরেশের দুই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। তাহার বেশের পরিপাট্য দেখিয়াও সুরেশ ও কমল উভয়েই খুসী হইয়া উঠিল। ফিকে রেন্‌বো রঙের সিল্কের শাড়ী হাল ফ্যাসানে ঘুরাইয়া পরা, হাতকাটা স্কোয়ার-নেক ব্লাউসের সহিত কাঁধের উপর অঞ্চল সোনার ব্রোচ দিয়ে আঁটা। গলায় পাতলা সরু একটি হার, তাহার প্রান্তে একটি প্লেন লকেট। হাতে তিনগাছি করিয়া সোনার চুড়ী। কানে হীরক দুল। বাঁকা সিঁথি করিয়া চুলগুলি ছোট মাথাটির একধারে অতি সুচারুরূপে সাজান এবং খোমটার কেবল সম্মুখে একটি বড় লাল গোলাপ এমন পরিপাটি করিয়া বসান যে, যদিও কোনও ভদ্রমহিলার মাথায় সুরেশ কখনও গোলাপ ফুল দেখে নাই, তবুও মনে মনে রুচির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। পুনঃ পুনঃ ইহার আপাদ মস্তক বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার এতক্ষণের পুঞ্জীভূত গ্লানি দূর হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ কমলের হাত ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল।

চাহিয়া দেখিল কক্ষের আসবাবপত্রও গৃহস্বামিনীর সুরুচি এবং সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিতেছে। মাঝখানকার ছোট গোল টেবিলটার উপর কারুকার্য্যময় একখানি আবরণ এবং তাহার উপর মাত্র একটি বড় ফুলের তোড়া জাপানী ফুলদানিতে বসান। একটা হারমনিয়ম কোণের কাছে বাঁকা করিয়া পাতা। দূরের বড় টেবিলটার উপর শুভ্র পাথরের ছোট ছোট মূর্ত্তি—ইটালীয়ান মূর্ত্তির মত সুন্দর। উপরের দেয়াল হইতে ঝুলান আয়নাখানির উপর সেগুলি প্রতিফলিত। দেয়ালের ছবিগুলি সুদৃশ্য এবং মূল্যবান বলিয়াই মনে হয়। তাহার ফাঁকে মহার্ঘ্য ফ্রেমমণ্ডিত একটি যুবকের আলোকচিত্র। মেঝের উপরকার বিছানা ধব্ ধব্ করিতেছে। তাহার কতকাংশ জুড়িয়া সবুজ কোমল একখানি কার্পেট পাতা।

ওস্তাদ একটা বিড়ি টানিয়া লইতেছিল। প্রভাবতী দাঁড়াইয়াই ছিল। কমল সহজ সুরে বলিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন. বসুন।

শাড়ীটা একটু গুছাইয়া প্রভা তাহাদের সম্মুখে কিছু দূরে সসম্ভ্রমে বসিল। নীচের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত বিনীত স্বরে বলিল পান আনতে বলব কি ?

কমল বলিল, না, পান-সিগারেট আমরা খাই নে। আমরা একটু ব্যস্ত আছি। আপনি একটু শীগগীর শীগগীর করুন।

অমনি প্রভা হারমনিয়মে সুর দিল, সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদ বেহালার কান মোচড়াইল, কেলো খোলে চাটি দিল।

সুরেশ নিজের অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রাণপণে দমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, কেন সে কমলের মত অমন সহজভাবে একটিও কথা বলিতে পারিতেছে না। তখনই তাহাকে ঈষৎ চাপ দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কমল কহিল, কি রে ঘেমে উঠছিস নাকি ?

বলিয়াই সে গায়ের কাপড়টা দিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া মনোযোগী শ্রোতার মত বসিল। প্রভা কথা বলিতেছিল ভারী গলায়—যেন সর্দ্দিতে গলাটা ধরিয়া গিয়াছে। কিন্তু গান ধরিল যেমন মিহি তেমনি চড়া সুর। সুরেশ তাকিয়া ঠেস দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতে লাগিল এবং যখনই চোখোচোখি হইল তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। বিভোর হইয়া সে সেই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিল। হঠাৎ কমল বলিল, চমৎকার! আর কেন? সুরেশের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, তোমার কথাবার্ত্তা বল।

সুরেশের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, দুই কানের ভিতর দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে, একটু উঠিয়া বসিয়া বিছানার উপর আঙ্গুল দিয়া কি যেন কি লিখিতে লিখিতে সে বলিল, আচ্ছা, আসছে সতেরই তারিখে আপনি যেতে পারবেন ?

প্রভা প্রথমে একদিকে মাথা নাড়িয়া জানাইল, পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, পারব।

সুরেশ চুপ করিয়া গেল। কমল কথা বলিবে না জানে, কেননা এই সকল কাজ-কর্ম্ম টাকা-কড়ির আলাপ সে একেবারেই করিতে জানে না, এই তাহার বিশ্বাস। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, তা হলে অন্যান্য কথাবার্ত্তা এর সঙ্গেই হতে পারবে ?

বিনীতকণ্ঠে ওস্তাদ বলিল, "না বাবু, এখানেই করুন।

প্রভাও অবনত মস্তকে মাত্র চোখদুটি তুলিয়া কহিল, আমার সঙ্গেই বলুন।

সুরেশ আবার একটু নড়িয়া চড়িয়া তোড়াটার দিকে চাহিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে কজন যাবে ?

সমস্ত ধরে এগার জন।

দশজনে হয় না ?

প্রভা চুপ। সুরেশ বলিল, ঠাকুরের দরকার কি ? আমাদের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম, খাওয়া দাওয়া ত আছেই, আপনাদের সেই রান্নাতে চলবে না ?

চলবে না কেন ?

তাহলে ঠাকুর নেবার দরকার নেই ?

না ; রাঁধবার আবশ্যক না হলে ঠাকুরের আর প্রয়োজন কি ?

তা হলে দশজনই হচ্ছে ?

হচ্ছে।

দুদিন গান করতে আপনি কত নেবেন ?

কি উপলক্ষ্যে গান ?

সুরেশ এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছিল। এ সকল কথাবার্ত্তার খুব যে দরকার ছিল তাহা নহে। কতগুলি লোক যাবে, কোথায় কে কি ভাবে থাইবে, এ সকল প্রশ্ন পূর্ব্বে তাহার মনে উদয় হয় নাই। একস্থানে শুনিয়াছিল রন্ধন করিবার জন্য পাচক একজন সঙ্গে যায়। তাই শুধু মাত্র কথা বলিবার জন্যই পাচক ঠাকুর লইয়া এতগুলি কথা বলিয়া গেল। বাড়ী হইতে মাত্র টাকার অঙ্কের একটা আভাস পাইয়া আসিয়াছে। প্রয়োজন মত কম বেশীতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। উপলক্ষ্য না বলিবারও তাহার কোনও কারণ ছিল না, তবুও সে বলিল, উপলক্ষ্য ?— উপলক্ষ্য জেনে কি হবে ? ধরে নিন্ যে, কোনও একটা উপলক্ষ্য !

প্রভার অধরোষ্ঠ বোধ হয় শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল— অন্তত সুরেশ তাহাই মনে করিল। প্রভা নিজের ওষ্ঠ দংশন করিয়া মাথা অবনত করিয়া বিনয়নম্র হাসিতে বলিল, উপলক্ষ্যটা জানা যে আমার দরকার। নতুবা একটু অসুবিধা এই যে—

কমল তাড়াতাড়ি বলিল, শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধ।

সুরেশ কমলের উপর চটিয়া গেল। পূজা উপলক্ষ্যেই গান, শ্রাদ্ধ বলিয়া রহস্য করিবার কমলের কি প্রয়োজন ছিল ? যে সুরে সুরেশ বলিতেছিল, কমলের শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধ বলিয়া এই আকস্মিক চীৎকার তাহার সহিত যেন আদৌ খাপ খাইল না এবং প্রভা স্পষ্টই অনুভব করিল যে, অকস্মাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় মুহূর্ত্তপুর্ব্বের সেই করায়ত্ত সুর এখন একেবারেই দুর্ল্ভ হইয়া পড়িল। সুরেশ গম্ভীরমুখে বলিল, ধরুন শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে—একটু হাসিয়া রমণী বলিল, ধরবার ত কথা নয়, আমার সত্যি জানা আবশ্যক। সে যাই হোক, প্যালা কি রকম পাওয়া যাবে ? কলকাতাতে এক রকম আর আপনাদের বাঙালদেশে—" অকস্মাৎ চকিত হইয়া শাড়ীর ভিতরে হাতদুখানি যুক্ত করিয়া অনুতপ্ত, লজ্জিত, মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, মাপ করবেন আমাকে। কিছু মনে করবেন না। আমি—

সুরেশ বলিল, মনে করবার ত কিছু নেই এর ভেতর। সে জন্য কুণ্ঠিত হবেন না। তবে প্যালা কি রকম পাওয়া যাবে সে বিষয় আমি ত কিছু বলতে পারছি নে। সে অবশ্য অনেকটা নির্ভর করে আপনারই ওপর।

হাঁ, আমার অদৃষ্টের ওপর।

সুরেশ কুণ্ঠিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি দিতে হবে আপনাকে ?

প্রভা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ক' দিন গাইতে হবে ?

দুদিন।

প্রভা মুখ নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, দুশো টাকা।

সুরেশ একটু চমকিত হইল—এত বেশী ত কেহ চাহে নাই। সঙ্কোচের সহিত বলিল, যাতায়াত খরচা ধরে ?

আজ্ঞে না, সমস্ত বাদে।

য়োহান্ বোয়ার

আচ্ছা, যদি একদিন গাইতে হয় ?

একশো টাকা। আমাকে রোজ একশ টাকা করে দিতে হবে। তারপর হঠাৎ হাত জোড় করিয়া মিনতির সুরে কহিল, আজ্ঞে তার কমে আমি যেতে পারব না। আমাকে মাপ করবেন তা হলে। আমার—

সুরেশ বলিল, কমে যেতেই হবে এমন কথা ত বলি নি। সুতরাং মাপ করবার কথা ত আসছে না।

না, তাই বলছিলুম।

সুরেশের মুখে সহস্র কথা আসিয়া বাঁধিয়া গেল। কিছুতেই আর একটি কথাও ফুটিল না। সেইখানে সেইরূপ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আর কি বলা যায়, আর কি বলা যায়।

কমল হাঁক দিল, Get up.

সুরেশ বলিল, আচ্ছা, আমরা কি স্থির করি একে দিয়ে খবর দেব।

উভয়েই উঠিল, প্রভাবতীও উঠিয়া দাঁড়াইল। যুক্ত করে কহিল, নমস্কার।

চকিতে তাহার দিকে চাহিয়া সুরেশ কহিল, নমস্কার। কমল মাত্র মাথা দুলাইয়া প্রতিনমস্কার করিল।

একটা আলো ধরি।

না, না, প্রয়োজন নেই। এই ত দিব্যি উঠে এলাম।

সে কি হয়, সিঁড়িটায় বড্ড অন্ধকার। বলিয়া সমস্ত ঘরে রূপের একটা তরঙ্গ তুলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই একটা হারিকেন লণ্ঠন হাতে করিয়া সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া বলিল, আসুন।

সুরেশ ও কমল ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। দরজার বাহির হইবার পূর্ব্বে উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সুরেশ দেখিল রেলিং-এ চিবুক রাখিয়া তাহার উপর দিয়া সুগঠিত দক্ষিণ বাহু গলাইয়া দিয়া নত হইয়া প্রভা আলো ধরিয়াছে। অতি নিকটের সেই তীব্র আলোক-সম্পাতে তাহার অবনত আরক্ত সুন্দর মুখ আরও রমণীয় দেখাইতেছে। সুরেশ রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

৪

ট্রামে বসিয়া কমল বলিল, খাসা মেয়েটি। কি সুন্দর দেখতে! যা কাব্য টাব্য আছে তোর এইখানেই কর ভাই। খানায় করিস্ নে।

থাম্, থাম্। কিন্তু সত্যি ভাই, কি সুন্দর। চোখ দুটো চমৎকার। রুচিও খাসা।

কমল বলিল, আর হেল্‌থ ?

নিশ্চয়ই। শাড়ীটা কেমন সুন্দর করে পরেচে। হাতের তাগাটা ঐ যে মেম সাহেবরা প্রেন এক রকম তাগা কনুইয়ের ওপর পরে না, কতকটা যেন তাই।

হাঁ, হাঁ। আর ভাই, মাথায় ফুলটা ভারী সুন্দর বসিয়েছে কিন্তু।

চুলটা কেমন বেঁধেছে তা দেখেছিলি ?

না দেখলে কি তুমি রাস্তায় এসে আমাকে বাঁচাচ্ছ ? যাই হোক, আমা হেন কাঠকেও মেয়েটা impress করলে হে!

* * *

সেই হইতে সুরেশের মন রঙিন্ হইয়া রহিল। সে নানাভাবে বহুদিক দিয়া শুধু এই চিত্রটিকে দেখিল এবং তাহার তরুণ কল্পনার ভাণ্ডারে যতগুলি রং আছে সমস্ত ঢালিয়া ইহারই চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুচ্ছটা রচনা করিল। তেমন কিছু সে বলে নাই, তাহার অন্তর-জগতের কোনও একটু রহস্যও সে প্রকাশ করে নাই সত্য, কিন্তু অবসরই বা তাহার মিলিয়াছিল কোথায় ? বাড়ী-চড়াও হইয়া যদি একজনকে কেবল টাকা আর কাজের কথাই বলা হয়, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কেবলই তাহার দাম করা চলে, তবে কেমন করিয়া সে বলিবে—আমার টাকার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তবু অন্তত তোমরা আমাকে পণ্যদ্রব্য করে বিচার করো না।

ক্রমেই সুরেশের কল্পনা বিশ্বাসে পরিণত হইল। ইহার বাহিরের জীবনের গতির সহিত অন্তরতম ভাব-ধারার যে সামঞ্জস্য নাই, সেখানে অহরহ যে একটা ভীষণ অথচ করুণ যুদ্ধ চলিতেছেই তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। নারী-হৃদয়, নারী-হৃদয় যে সে এত শুনিয়াছে, ইহারই ঐ কোমল বক্ষের ভিতর তাহাই ত অর্দ্ধমৃতভাবে এখনও বাঁচিয়া আছে এবং প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যায় সেই আহত হৃদয় যে আঘাত পায় তাহা হইতে নিজেকে বাঁচাইবার উপায়

নাই বলিয়াই সে দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া মরিতেছে। কবে কোন্ অশুভক্ষণে, কোন্ কুগ্রহের নিষ্ঠুর তাড়নায় ঝড়ের মুখের অসহায় কুটোর মত হয় ত সে কক্ষ-ভ্রষ্ট হইয়া সেই যে পথ হারাইয়াছে, তারপর হইতে হৃদয়হীন মমতাশূন্য মানবরূপী রাক্ষস তাহাকে সেইখানেই চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। কেউ একখানি সহানুভূতিপূর্ণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলে নাই—তুমি এই ধরে' উঠে এসো।

আচ্ছা, সে নিজে যদি সেই হাতখানি বাড়াইয়া দেয় তবে কেমন হয়! ভাবিতেই উৎসাহে তাহার মন ভরিয়া গেল। বেশ হয়। এই যে এতদিন ধরিয়া এত কাব্য এত রস নিয়ে রাত নেই দিন নেই মগ্ন হয়ে আছে, নারী-হৃদয়ের ব্যথার কথা ভাবিতেও কত কাল্পনিক বেদনা অনুভব করিয়া কাতর হইয়াছে, সে সকলই কি সত্যের কঠিন পরীক্ষায় একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে? এইটুকু কি তাহার মূল্য?

শুধু মাত্র ত একটু পথ দেখাইয়া দেওয়া? বলিয়া দেওয়া, এই ভাবে চল, জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি ভাবে চলিবে? একবার হাসিয়া ভাবিল, যদি ইহাকে ভালবাসিয়া ফেলিত তবে নিজের সমস্যা পূরণ করিলেই সব চুকিয়া যাইত। সত্যি যদি এই নারীকে সে ভালবাসিত তবে কি করিত? বিবাহ করিত?—দূর, ও সকল বাজে ভাবনায় লাভ কি! কত ভাবেই ত জীবন-যাত্রা সহজ হইতে পারে। কমলকে বলিয়া ইহাকে ডাক্তারী পড়াইবে। দিব্যি পাস করিয়া যখন এ প্রাকটিস্ করিতে বসিবে, কত পসার, অর্থ মান প্রতিপত্তি হইবে। চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইবে! সঙ্গে সঙ্গে ইহার সব কিছুর মূল বলিয়া তাহার নিজের নামটাও সকলের মুখে মুখে ফিরিবে। নামের জন্য অবশ্য সে কাঙাল নয়। বর্ত্তমানের এই ঘৃণিত লাঞ্ছিত জীবন, বঞ্চিত তৃষিত হৃদয়ের স্থানে সম্মান যশ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরিপূর্ণতায় সার্থক সেই জীবন লাভ করিয়া অন্তরে কাহার ছবি আঁকিয়া সে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য দিয়া ভক্তি ঢালিয়া দিবে? কিন্তু ডাক্তার করিতে যে অনেক বাধা অতিক্রম করিবার, অনেক সময়ের প্রয়োজন। হইবেই এক রকম। যত বাধা, যত বিপদই সম্মুখে থাকুক না কেন, সে যদি এই নারীকে তাহার এই তরুণ জীবনে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সফলতা হইতে বঞ্চিত দেখিয়াও এই কর্দ্দমেই তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া যায়, তবে ধিক তাহার শিক্ষায়, শতধিক তাহার জীবনে।

* * * *

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই সুরেশের প্রথম মনে পড়িল প্রভাকে। এবং দেখিল সারা রাতই এলোমেলো ভাবে তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে। সারাদিন সমস্ত কার্য্যের ভিতর এই চিন্তাই তাহার মনে চাপিয়া রহিল। স্নান আহার কাজ কর্ম্ম সব কিছুর মধ্যেই গোপনে কোথা দিয়া যেন এই চিন্তা-স্রোত একটানা বহিয়া চলিয়াছে। যখনই মুহূর্ত্তের অবসরে অন্তরের পানে তাকাইয়াছে তখনই ইহার সহিত চোখাচোখি হইয়াছে।

সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারে গোলদীঘির ভিজে ঘাসের উপর বসিয়া বসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, একবার যাইয়া একটা সংবাদ লইলে কেমন হয়। কিন্তু আজন্মের সংস্কার, শিক্ষা, অজ্ঞাত আশঙ্কা যেন সহস্র বাহু হইয়া তাহাকে বাধা দিতেছিল।

বসিয়া বসিয়া সুরেশ ভাবিতে লাগিল হয় ত এতক্ষণে সেখানেও গৃহ-দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অনিচ্ছায় প্রসাধন করিতে সারা দেহমন বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, তবু না করিয়া উপায় নাই। হয় ত তাহার অন্যমনস্ক মনে যাহার মূর্ত্তি জাগিতেছে তাহাকে আর একবার দেখিবার জন্য মন আকুল হইয়া উঠিতেছে এবং তখনই নিজের অসম্ভব ইচ্ছা এবং স্পর্দ্ধা দেখিয়া নিজেই আবার বিদ্রোহী মনকে শাসন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে।

চট্ করিয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া শ্যামবাজারের একটা চলন্ত ট্রামে সে লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। একবার কমলের কথা মনে হইল। সে অসন্তুষ্ট হইবে না ত! কেন হইবে? সে ত হেয় কিছু করিতেছে না। মনের কাছে সাফাই হইয়া সে বসিয়াই রহিল।

'দেখা হইলে প্রথমে কি বলিবে? কি করিয়া তাহার সঙ্কোচ সরাইয়া তাহার অন্তর জগতের অবরুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিবে? ব্রীড়াসঙ্কুচিতা নতমুখী প্রভাকে মনে করিয়া

তাহার হাসি পাইল। যে সংসারের সমস্ত লজ্জার সঙ্গে কারবার একেবারে চুকাইয়া দিয়াছে তাহার কি না সুরেশকে লইয়াই লজ্জা! তবু সে লজ্জা সে কেমন করিয়া দূর করিবে! সোজা জিজ্ঞাসা করিবে, এই জীবন তাহার কেমন লাগে? এই রূপ যৌবন, সর্ব্বোপরি এই সুকুমার নারী-হৃদয় নির্দ্দয় ভাবে বলি দিয়া যে হাসির পসরা সাজাইয়াছেন তাহার ভিতরকার অশ্রুপুঞ্জ ত আমার কাছে লুকাইতে পারেন নাই? এ মর্ম্মান্তিক লুকোচুরির কোনও প্রয়োজন নাই। বরং মিথ্যার এই আড়ম্বরপূর্ণ আবরণ ছিন্ন করে' নিজের সত্য, মুক্তরূপ নিয়ে বেরিয়ে আসুন।

প্রভা কি বলিবে? কান্না ছাড়া বলিবার আর তাহার কি আছে? কিন্তু কেবলই যদি কাঁদে তবে সেই বা কি করিবে? হয় ত আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় যাব? আমার স্থান কোথায়? আমি যে সব হারিয়েছি। তাহাকে বুঝাইবে, ঐখানেই তাহার ভুল। মানুষের জীবন, নারীর হৃদয় ত একটা তুচ্ছ খেলানা নয় যে, অসতর্কতায় হারাইয়া গেল। নিজে স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করিলে কাহারও সাধ্য নাই সেই চিরন্তন থেকে বঞ্চিত করে। মূর্খ, হৃদয়হীন যারা তারা চোখ বুজিয়া চীৎকার করিতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাহারও নিজস্ব অধিকার হইতে কেউ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না মানুষ আর আদিমমানুষ নেই। ভাবিতে ভাবিতে সুরেশের মস্তিষ্ক গরম, উত্তেজনায় সমস্ত শরীর স্ফীত হইয়া উঠিল।

গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় পার হইয়া যায় দেখিয়া সুরেশ ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িল। গলিটার নাম মনে আছে, কিন্তু কোথা দিয়া গিয়াছিল ঠিক নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির করিল। গলিতে প্রবেশ করিতেই বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এই বাড়ীটে না? এইটেই ত মনে হইতেছে। দরজার কাছে একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া। সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, এই বাড়ীতে প্রভা বলে কেউ থাকেন?

প্রভা! নাঃ, এ ত পাঁচুর বাড়ী। কেত্তন টেত্তন মুজরো করে?

হাঁ, হাঁ করে।

কিন্তু সে ত পাঁচুই বাবু। তার নাম প্রভা কবে থেকে হল আবার। এই যে এই পথ দিয়ে উপরে যান।

সুরেশ প্রবেশ করিল। মনে করিল, পাঁচু নাম তার কথ্খন না। ও জানে না।

আজ উপর নিস্তব্ধ। গানের সুর পাওয়া যাচ্ছে না। কম্পিত বক্ষ অসংযত চরণ সুরেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল, গান গাইবার পাট উঠে গেছে।

কি বলিবে মনে মনে একটু গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। অধিক সময় থাকা হইবে না। আজ যে মোটেই শীত নেই—গরমই বোধ হচ্ছে যেন।

দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই প্রভা হাসিয়া 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। সুরেশ জুতা না খুলিয়া সোজা ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু এ কি বেশ! কোথায় সে সিল্কের শাড়ী! আধ হাত চওড়া লাল পাছাপাড় একটা শাড়ী অতি এলোমেলো ভাবে পরা। আঁচলটা ঘুরাইয়া কোমরে জড়ান। গায়ে জামা নাই। মাথায় গড়ে' ফুলের মালা ঘুরাইয়া বসান, হাতে ফুলের বালা, তাহা গলায় ফুলের কণ্ঠী। এত ফুলেও এমন উচ্ছৃঙ্খল বীভৎস দেখাইতেছে যে, সুরেশ নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হাসিয়া প্রভা বলিল, ফুল দেখছেন? বাবুরা সখ করে' পরিয়েছেন। আমার লছমী বাবু ফুল বড় ভালবাসেন।

অমনি শয্যার উপর হইতে বোধ হয় লছমী বাবুই হাসিতে গিয়া বিকট রব করিয়া উঠিলেন। সুরেশ বাঁ দিকে চাহিয়া দেখিল সেই ঢালা বিছানার উপর দুইজন মাড়োয়ারী যুবক বসিয়া আছে। তাহাদের মুখের প্রতি রেখায় যেন বর্ব্বরতার ছাপ দেওয়া রহিয়াছে। একজনের টুপীটা বিছানার উপর, অপর জনের মাথায়ই রহিয়াছে। লছমী বাবুর কপালে সিঁদুরের মোটা ফোটা, কর্ণের অগ্রভাগে স্বর্ণ কুণ্ডল, মুখ চোখ মদের নেশায় আরক্ত এবং বীভৎস। বাম হস্তে একটি অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট, তাহার খানিকটা পানের রসে সিক্ত। তাহার সম্মুখে একটা কাঁচি মার্কা সিগারেটের বাক্স চাপা দেওয়া। পাশেই একখানা প্লেটে কতকগুলো মাংস ভাজা, এবং সেই প্লেটেরই এক

পাশে চর্ব্বিত হাড়গোড়। লোকটা হেঁট হইয়া কেবলই সম্মুখে পশ্চাতে ছলিতেছে, মুহূর্ত্ত স্থির নাই। মাথাটা তুলিয়া হাসির সঙ্গে পানের রস শুভ্র বিছানার উপর ছড়াইয়া বলিলেন, বৈঠিয়ে বাবু-সাব! অপরজন একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সুরেশের আকাশকুসুমের বড় বড় ফুলগুলি যেন অকস্মাৎ আগুনের ফুলকি হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। এবং তাহারই দহনে সে পুড়িয়া মরিতে লাগিল। প্রভা বলিল, বসুন। এবং সুরেশ যন্ত্রচালিতের ন্যায় সম্মুখের একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তাহলে' বায়না করা স্থির হল বাবু?

অধোবদনে সুরেশ উত্তর করিল, অত টাকা দিয়ে আমরা নিতে পারব না।

তীক্ষ্নস্বরে প্রভা বলিল, অত টাকা, পাঁচ ছয় দিনে ছশো টাকা তাও বলছেন, অত টাকা! সস্তা মেয়েমানুষ খোঁজেন ত অন্যত্র যান।

মাতাল লছমী বলিয়া উঠিল, হাঁ হাঁ।

প্রভা কহিতে লাগিল, আপনাদের আশীর্ব্বাদে রোজ রেতে আমার একশো টাকা আসে। তাও কি ছাই যাব বল্লেই যেতে পারি।' এই লছমী বাবু ত যাব শুনে চটেই আগুন।

বিকট হাসিতে মুখ ভরিয়া লছমী কহিল, কভি নেহি যানে দেগা।

আমার কাছে বাবু সোজা কথা। পয়সা দেব একটি পালা গাইতে হবে অক্রুর সংবাদ, তাও আবার কাঁদিয়ে চলাঢলি করিয়ে দেওয়া চাই। সে আমার পোষাবে না, সাফ কথা, কি বল? বলিয়া লছমীর দিকে তাকাইতেই সে মাথা দোলাইয়া বলিল, ব্যস!

সুরেশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রভার পার্শ্বে জানলার ফাঁকে মেজের উপর একটা মদের বোতল। তাহারই ছিপির উপর দক্ষিণ হস্তের চাপ দিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া স্খলিত স্বরে প্রভা কথা বলিতেছিল। সে যে অত্যন্ত মাতাল হইয়াছে, দৃষ্টিপাত মাত্রই তাহা বুঝা যায়। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে অপমানে সুরেশের মাথা আরও অবনত হইয়া পড়িল।

প্রভা আবার কহিল, আপনার যদি নিতান্তই মেয়েমানুষ নেবার দরকার হয় তবে ঠিক করে' দিতে পারি। দেখতে শুনতে মন্দ না, বয়সও তেমন হয় নি, গাইতেও পারে চলনসই।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, না, আমার দরকার হবে না।

প্রভা হাসিয়া একটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, কেন? সখ মিটে গেল?

সুরেশ জবাব করিল না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল, পশ্চাৎ হইতে বিকট হাস্যের রব উত্থিত হইতেছে।

রাস্তার শীতল বায়ুস্পর্শে সুরেশ অনুভব করিল যে, অত্যন্ত গরম বোধ করিতেছিল এবং তখনও তাহার ঘর্ম্ম হইতেছে, সে দ্রুত চলিতে লাগিল পথের দুই পার্শ্বে মুখে রং মাখিয়া অদ্ভুত বেশে স্ত্রীলোকের সারি দাঁড়াইয়া আছে। সুরেশ ঘাড় হেঁট করিয়াই চলিতেছিল। কিন্তু তাহার কানে আসিল কে যেন বলিতেছে, আমাদেরও রূপ যৌবন আছে গো, তাকিয়েই দেখ না।

আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। কোন্ দিকে কতক্ষণ এইরূপ চলিয়াছিল ঠিক ছিল না, হঠাৎ সম্মুখে দেখিল শীতের শীর্ণকায়া গঙ্গা আলোয় আলোয় উজ্জ্বল। তীরে জুতা জোড়াটি রাখিয়া, ফ্লানেলের পাঞ্জাবী পশমী শাল গায়েই সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যখন বাসায় ফিরিল তখন তাহার আর্দ্রবস্ত্রাবৃত দেহ প্রবল শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

———

শরৎচন্দ্র

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আর্য্য থিয়েটার যাঁহার চেষ্টা এবং আগ্রহে চলিত, বলা বাহুল্য যে, তাঁহার অভিনয় করিবার সখ ছিল অদম্য; কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি লইয়া প্রকাণ্ড বিপদ ছিল। একমাত্র 'কাটা-সৈন্ত' সাজিয়া পড়িয়া থাকিলে কোন গোল না হইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে কেমন যেন মান্যের হানি হয়। অগত্যা প্রায়ই অভিনয়ের আদিতে কিম্বা অন্তে মঙ্গলাচরণ কি স্বস্তিবাচনের ধরণে তিনি হর-পার্ব্বতীর হর সাজিয়া বাহির হইতেন। হরের সর্ব্বাঙ্গে খড়িমাখা ঠোঁট দুটি টুক্ টুকে লাল এবং মিটি-মিটি চাহনি। হর একেবারে নির্ব্বাক থাকাটা দলের সকলের পছন্দ হইত না। সেবার অনুরোধ উপরোধের ঠেলায় দুই চারিটা কথা বলিতে স্বীকৃত হইলেন। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। তিনমাস রিহার্সেল দিয়া হর কণ্ঠস্থ করিলেন, হরিবল প্রমথ মণ্ডল।

অভিনয়ের সময় ড্রপ উঠিল; কিন্তু চার পাঁচ মিনিট হর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—সেই সঙ্গে গ্রীন্‌রুমের সকলে নিস্পন্দ নির্ব্বাক উৎকণ্ঠার সময় অতিক্রম করিতে লাগিল। ড্রপ পড়িবার জন্য কাঁপিয়া উঠিল—সুবর্ণ সুযোগ বুঝি বা উত্তীর্ণ হইয়া যায়!—এমন সময় বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে হর বলিলেন—হরি বল প্রথম। প্রম্‌টার চীৎকার করিয়া বলিল, প্রথম নয় প্রমথ। হর অটল গাম্ভীর্য্যে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—তার পরের কথা ব'লে দে;—কিন্তু প্রম্‌টার অশুদ্ধি শোধনের জন্য বলিল,—প্রমথ বলুন। তখন হরের কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল;—পার্ব্বতী ক্ষোভে লজ্জায় বিদগ্ধ-প্রায়। কম্পমান হরের বীর পদভরে চৌকি মড় মড় করিতে লাগিল। নন্দী তাঁহাকে হাত ধরিয়া নেপথ্যে টানিয়া লইয়া গেল। বাহিরে দুষ্ট ছেলের দল অজস্র ক্ল্যাপে আসর মাতাইয়া তুলিল।

এই থিয়েটারের দু একটি প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র তাঁহার লেখার মধ্যে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। পাঠকগণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বুঝিবেন, যুবক সম্প্রদায় এ থিয়েটারটিকে কি চক্ষে দেখিতেন।

রাজুর দল কিন্তু মরে নাই—আবার ধীরে ধীরে দুই তিন বৎসরে তাহা গড়িয়া উঠিল। শরৎ সে দলের প্রধান না হইলেও অন্যতম পাণ্ডা ছিল। বাঙ্গালীটোলার পূর্ব্ব-উত্তর পাড়ার নাম আদমপুর - তাই নাম হইল "আদমপুর ক্লাব"।

রাজা শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন এই দলের প্রাণ স্বরূপ। সঙ্গীতে কুমারের অসীম ব্যুৎপত্তি ছিল এবং থিয়েটারের সখও ছিল অসাধারণ। নিজের দলের সর্ব্ববিধ সৌষ্ঠব সাধনের জন্য সময়ে সময়ে সদলে কলিকাতায় গিয়া রাত্রির পর রাত্রি অভিনয় দেখিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া প্রচণ্ড উদ্যমে অভিনয় সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় দিনাতিপাত করিতেন।

এই ক্লাব ছিল ভাগলপুরে সেকালের আর্টের চরমপন্থী। ইহার বিরুদ্ধে দিন কতকের মধ্যেই অসি ধারণ করিয়া উঠিল—দি বেঙ্গলী টোলা থিয়েট্রিক্যাল ক্লাব। বলা বাহুল্য যে, আর্য্য থিয়েটারের ভগ্নাবশেষ লইয়া ইহা মাথা খাড়া করিল। অপর পক্ষকে অবহেলা এবং অবজ্ঞা করিয়া তাহার নাম দিল, a dam poor club. ঈর্ষা কুৎসা এবং এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় এই দুইদল, যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে—বিদ্যুৎভরা দুইখানা মেঘের মতই যেন নিত্য উদ্যত বজ্র হইয়া থাকিত। সুবিধা এবং সুযোগ ঘটিলে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া দিত না।

দুইদলের মোহ এবং উত্তেজনায় অনেক যুবক আর কিছু করিয়া উঠিবার কোন ফুরসৎ না পাইয়া জীবনের খরস্রোতে যে কেমন করিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল—সে কথা মনে করিলে অবাক হইতে হয়।

গোঁড়ামি বোধ করি, উভয়দলের মধ্যে সমানভাবে কাজ করিত। একদল চাহিত সমাজের সকল আইন-কানুন বাধা-বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মুক্ত হয়। অপর দল প্রথম দলের কথা মনে করিয়াই যেন সমাজের সকল আবর্জ্জনাকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া থাকিতে চাহিত। যে সংস্কার সমাজ প্রয়োজনবশে দূর করিয়াছিল তাহাকেও নূতন করিয়া

কায়েম করিয়া তুলিতে এ পক্ষের কোন বাধা ছিল না। দুইদলের প্রত্যেকের জানা যেন শেষ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই ধরিয়া লইয়াছিল যেন বিরোধই স্বাভাবিক—মিল কিছুতেই হইতে পারে না। আমি তুমির এই উৎকট এবং বিকৃত প্রাবল্যে সমাজের যে কি সমূহ ক্ষতি হইতে পারে - এইকথা চিন্তা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তও যেন দুইদল হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল !

দীর্ঘদিন ধরিয়া বিরোধ করিতে করিতে সমাজের মানসিক অবস্থা এত হীন এবং অবনত হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রতিশোধের একতিল অবসর আসিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার উদারতা কিছুমাত্র কোন পক্ষের ছিল না। মৃত্যুতে অনেক সময়ে বিরোধের সাময়িক শান্তি হয়। তখন কলহ স্থগিদ রাখিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করিতে মানুষ একযোগ হয়। কিন্তু ভাগলপুর সমাজে বিপক্ষদলের ঘরে মড়া পচাইবার চেষ্টা অনেকবার হইয়া চুকিয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশত এই সময়ে রাজার একজন আত্মীয়ের মৃত্যু হইল। প্রতিশোধের এত বড় সুবর্ণ সুযোগ দেওয়াতে এ পক্ষের সকলে ঐশ শক্তির মধ্যে অপার দয়া দেখিয়া ভক্তি গদগদ মনে তাঁহাকে বারবার ধন্যবাদ দিল; বোধ করি সন্দেহবাদীর মনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের ছায়া পর্য্যন্তও রহিল না। তখন আদমপুর ক্লাব কোমর বাঁধিয়া মড়া পোড়াইয়া আসিল। তাহার ফলে ঘরে ঘরে দলাদলি সুরু হইয়া গেল। অনেকে নিরুপায় হইয়া মাথা মুড়াইল; আবার কেহ বা বাঁচিয়া গেল।

বলা বাহুল্য মতিদাদা গ্রাহ্য না করাতে শরতের মাথার চুলগুলি রক্ষা পাইল; কিন্তু তাহাকেও একদিন ইহার জন্য গভীর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আমাদের বাড়ীর জগদ্ধাত্রী পূজার কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এই পূজায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যোগদিবার আনন্দ আজও আমাদের মধ্যে থাকিয়া গেছে। সে বৎসর শরত আসিয়া আপন মনে লাগিয়া গেল। তাহাকে আহ্বান করিবার কথাও কর্ত্তাদের মনে ছিল না। ব্রাহ্মণ ভোজন চলিয়াছে—শরত ভাতের থালা হাতে করিয়া চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে—এমন সময় শুনা গেল, তাহার ডাক পড়িয়াছে। পরিবেশন করা বন্ধ হইয়া গেল। পাড়ার দলপতি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, পতিত ব্যক্তির দ্বারা পরিবেশন করাইলে ব্রাহ্মণগণকে তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতে আদেশ করিবেন। শরতের রাগে অভিমানে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া সেই দণ্ডে সে আমাদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শরতের জীবনের অভিব্যক্তির সহিত এই ঘটনাগুলির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে মনে করিয়া অকিঞ্চিৎকর হইলেও এগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। পল্লী-সমাজের লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠকের মনে স্বতঃই একটা কৌতূহল দেখিতে পাই - সেই হিসাবে হয় ত, এই সকল কথা সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না।

আদমপুর ক্লাবের প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর এইটুকু বলিয়া শেষ করিলে কিছু অবিচার করা হইবে মনে হয়। এই ক্লাবের সভ্যগণ মাত্র থিয়েটারের সংস্কার করিবেন এমন কোন ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ মতবাদ লইয়া দলটি গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই নিশ্চয়। থিয়েটার ছাড়াও অনেক বিষয় ছিল যাহার সম্পর্কে তাঁহাদের সমবেত শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইত।

স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তা অনুসারে চলা ফেরার একান্ত অভাব অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকারের দিক দিয়াও এই ক্লাবের কিছু কিছু কাজ চলিত।

শিক্ষার ভিতর যে আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার কোন লক্ষণই আমাদের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। বরং এমনি একটা ব্যাপার চলিয়াছে যে, শিক্ষার মধ্যে দিয়া যাহা পাওয়া যায়—তাহা পরীক্ষা পাশের জন্য কাগজে কলমে লেখা ছাড়া অপর কোন কাজে লাগাতেই পারা যায় না। সমাজের সে সব বিষয়ে কোন অনুমোদন নাই। বোধ করি বাঙালীর জীবনে এই সমস্যার নিরাকরণের কোন প্রবুদ্ধ চেষ্টাও এখনো হয় নাই। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের একটা পোষাকি এবং আর একটা আটপৌরে চিন্তা আছে। যেমন বাল্য-বিবাহের বিষয় প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে আমরা লেখনীর মুখে

তাহার শত দোষ দেখাইয়া বলি—হায় হায় সমাজের শেষ পরিণতি কি ? আবার অল্প বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বলি—সমাজের, শাস্ত্রের, পূর্ব্বপুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার আমি কে ? এমনি করিয়া চিন্তা এবং কাজের গরমিলে জাতির বিবেক ক্রমেই নিস্পন্দ হইয়া আসিতেছে—তাহা আমরা বুঝি, এবং বুঝিও না। ইহারই বিরুদ্ধে বোধ করি এই ক্লাবটি দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের পদ্ধতি প্রণালীর হয় ত অনেক দোষ ছিল কিন্তু মূলে যে সত্যটি ছিল তাহা লইয়া এই ক্লাবের অন্তত একজন সভ্যও বর্ত্তমান সাহিত্যে এত নাড়া-চাড়া দিলেন যে, আজ না হইলেও কোন একদিন জাতির হয় ত তাহা বড় উপকারে আসিতে পারে।

আদমপুর ক্লাবের আর একটি দিকের কথাও বলা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। আদমপুর ক্লাব—বই পড়ার এবং নাটক অভিনয়ের আখড়া মাত্র ছিল না। সেখানে শরীরের প্রতি বিচার করার চেষ্টাও ছিল যেমন, ক্রীকেট, বিলিয়ার্ড খেলিয়া, নাচ গান তামাসা করিয়া আমাদের জীবনের সকৃত নিছক নিরানন্দের ভাগটাকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়া সত্য করিয়া বাঁচিবার চেষ্টাও সেখানে ছিল।

* *

সাহিত্যে চিন্তার নবধারার কথা উত্থাপন করিয়া সমাজ সম্বন্ধে অরণ্যে বহু রোদন করিলাম। পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটাইলাম কিনা, বুঝি না।

কথা-সহিত্যে নব-চিন্তার ব্যাপারটি কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা চলিয়াছে। সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষকগণের তীব্র সমালোচনাগুলিও নিশ্চয় প্রণিধানযোগ্য।

এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানুষের চরিত্রটি একটি রহস্যের বস্তু—তাহার তত্বটি এখনো জ্ঞানের গভীরতম অন্ধকার গুহাতে নিহিত রহিয়াছে। তাহাকে বুঝিয়া শেষ করিয়াছি—এমন কথা বলা সুকঠিন ; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, কাহারো কাহারো সে কথা সদর্পে বলিবার অকুতো সাহস যে আছে—তাহাও বুঝিতে পারি। ইঁহারাই মানুষের মনের প্রেম বলিয়া যে প্রবৃত্তি আছে—তাহাকে কাম আখ্যা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলেন যে, ঐ মানুষের সমস্ত দুর্ব্বলতার আদি কারণ। দূর কর, ঐ প্রেমের বালাই সমাজ হইতে। তখনি আবার শুনিতে পাই, শান্ত-কণ্ঠে কবি গাহিতেছেন :—

"মর্ত্ত্যে থাক সুখে-দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেম-ধারা - অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি।"

মানুষের জীবনে প্রেমের মূল্য কি—তাহারই অনুসন্ধানে আমাদের নবযুগের সাহিত্য ব্রতী হইয়াছে। এই অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিকের সত্য-অনুসন্ধানের মত। তাহাতে মানুষের খ্যাতি-অখ্যাতির কোন হিসাব নিকাশ নাই। প্রেমের-স্বরূপ কি—তাহাই প্রকাশিত হউক। ভাল কি মন্দ, সুন্দর কি অসুন্দর সে বিচারে কাজ নাই। তাহাকে ঠিক করিয়া জানাই যে জীবনের সব চেয়ে বড় প্রয়োজনের কাজ! দেহের কঙ্কালের কাঠাম অসুন্দর বলিয়া বর্জ্জন করিলে দেহতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়—প্রেমকে কাম বলিয়া কানে আঙুল দিলে মানুষের চরিত্র-তত্ত্ব চিরদিনের জন্য দুর্গমই থাকিয়া যে যায়!

প্রেমকে কাম বলিয়া দূরে রাখিয়া মানুষ কতখানি লাভ করিয়াছে ? জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডারে কোন সত্যই অগ্রাহ্য নয়। অসত্যই সেখানে—অদেয়ম্ অপেয়ম্ অগ্রাহ্যম্।

কামিনী-কাঞ্চনকে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়া কত সাধু মহাজন কণ্ঠ হানি করিলেন ; কিন্তু চোরা কি ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়াছে ? বিবাহের লগ্নের দিন সন্দেশের দর কিছুতেই কমে না—আপিসে একটা চাকরী খালি হইলে সহস্র ব্যক্তি আবেদন বহন করিয়া ঘুরিয়া মরে। গোড়া কাটিয়া গাছে ফল ধরাইতে গেলে—শোলার ফলের আমদানি করিতে হয়। শোলার ফলে চক্ষু সার্থক হয়, কিন্তু উদরের ক্ষুধা মেটে না!

বাংলার অতীতের দিকে চাহিলে দেখি, প্রেমের অবতার মহাপ্রভু! সাহিত্যে দেখি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

এত কথার পর যদি শুনি, কি পুছসি অনুভব ? তখন কবির কথায় তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করে :

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপতি ভেল!
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁঙায়িনু
•না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

—ক্রমশ

দরিয়া

[গোকুলচন্দ্র নাগ]

(গল্প)

[গোকুলচন্দ্র নাগের পুরানো অপ্রকাশিত কয়েকটি গল্প আমার কাছে ছিল। এটির একপাশে লেখা আছে—July, 1914, 1st Story. তাঁর লেখা প্রথম গল্প-হিসাবে "কল্লোলে"র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এটির মূল্য আছে বলে' গল্পটি প্রকাশ করলাম।

শ্রীসুনীতি দেবী]

দরিয়া বোনটি আমার!

কি দিদি?

এই অষুধটুকু খেয়ে নাও, পাঁচটা বেজে গেছে!

দিদি!

কি রে!

আমি অষুধ খাব না। শুধু তুমি আমার কাছে বোস, গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, তা হলেই হবে।

পাগল কোথাকার! অষুধ না খেলে কি অসুখ সারে? ডাক্তার…

না না, ডাক্তার নয়। ওরা আমার অসুখ ভাল করতে পারবে না, মিছি মিছি কেবল কষ্ট দেবে আমায়। কেন তোমরা আমার জন্যে এত কষ্ট কর? আমার এ রোগ ত সারবার নয়। আমি যে বেশ টের পাচ্ছি দিদি, আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। সকল কষ্ট বোঝবার ক্ষমতা কমে আসছে। আজ আমার মনে এক আনন্দ জাগছে—যেন কিছু পাব। বড় দুঃখের ধন সে আমার—দিদি. তোমাকে আমি…

লক্ষ্মী বোনটি আমার, একটু চুপ কর। অত কথা কইলে এখুনি হাঁপিয়ে পড়বি। বড় কষ্ট হবে তোর।

তা হোক গে। আজ আর আমি কিছুতেই চুপ ক'রে থাক্‌তে পারছি না—ঝড়ের মুখে নৌকাটা ছুটে চলেছিল, কূল-কিনারার সীমা ছাড়িয়ে এক অজানা সাগরের মধ্যে এসে পড়ল। আর তাকে ঠিক রাখা গেল না। দুর্ব্বল পালটার বুকের ওপর প্রচণ্ড হাওয়া আছড়ে পড়ে নিমেষে তাকে শত খণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল, তলিয়ে গেল নৌকাখানা…

দরিয়া, লক্ষ্মী দিদি আমার, একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর।

না না, ঘুমাব না। ঘুমালে যদি আর না জেগে উঠি! তা হ'লে ত আর আমার কথা তোমায় বলা হবে না—শোন।

সেই তোমার বিয়ের পর তুমি শ্বশুর-বাড়ী চলে গেলে। আর আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। প্রথম প্রথম আমার ভারি খারাপ লাগত। কত দিন তোমার কথা মনে করে একলাটি কেঁদেছি, তার তুমি কিছুই জান না দিদি।

একদিন তোমার একখানা চিঠি পেলাম। তাতে তুমি কত কি লিখেছিলে—তোমার স্বামীর কথা, তিনি তোমায় কত ভালবাসেন। সে সব আমার মনে আছে, তার একবর্ণও ভুলি নি আমি।

ক্রমে তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করলে। অনেক চিঠি দিয়ে

কচিৎ তোমার উত্তর পেতাম। তাও আবার দু'চার ছত্রের বেশী নয়। সর্ব্বদাই ওজর দেখাতে, হাতে সময় মোটেই নেই, কাচ্ছা বাচ্ছাদের দেখতে হয়। আমার ভারি রাগ হ'ল। দরিয়াকে তুমি এমন করে ভুলে যেতে পার তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কত কাল পরে আজ তোমার দেখা পেলাম।

সে থাকগে ভাই, তারপর শোন সমস্ত দিন আমার কি ক'রে যে কাটত, তা আমিই জানি। আমার নিজের ঘরেই ঠিক যেন আমি কয়েদী হ'য়ে রইলাম।

বাবার কাছে উর্দ্দু শিখবার জন্তে বিস্তর ছেলে পড়তে আসত, সে ত তুমি জানই। একটি ব্রাহ্মণের ছেলেও আস্‌তে আরম্ভ করেছিলেন। বাবা তাঁর পড়ায় অসাধারণ অনুরাগ আর স্মরণশক্তি দেখে, তাঁকে আলাদা পড়াতে আরম্ভ করলেন।

আমাদের শোবার ঘরের পাশেই তিনি বস্‌তেন। আমারও একটা উপলক্ষ্য জুটল। পর্দ্দার আড়াল থেকে তাঁকে দেখতাম। প্রথম হতেই তাঁকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। কেউ যখন সে ঘরে থাকত না, আমি নিজের হাতেই তাঁর সব বই সাজাতাম, টেবিল পরিষ্কার করতাম। এই রকম অনেক ছোটখাটো কাজে আমার দিনগুলো বেশ কাটতে লাগল।

কেন জানি না, তখন আমার মনের মধ্যে যেন খুশীর বন্তা বয়ে যাচ্ছিল। সহস্র চেষ্টাতেও সেটি ঢাকতে পারছিলাম না। সে যেন পায়ে নূপুর নিয়ে নিঃশব্দে চলবার চেষ্টার মত। সে যুক্তি সাবধনতার ধাক্কা খেয়ে হাজার সুরে আমার সারা দেহে গান গেয়ে উঠছিল।

একদিন সন্ধ্যা বেলা ছাদে একলাটি বসে ছিলাম। কে যেন আমার চোখ দুটিতে সুখ স্বপ্নের অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল। জগৎ তখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমার নিজের অস্তিত্বও যেন আর বুঝতে পারছিলাম না— এমন সময় বাবা এসে আমায় বললেন, দরিয়া, হীরেন্দ্র এবার মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছেন।

আমার বুক দুর দুর করে উঠল। কিছু আবেগের সঙ্গে বলে ফেললাম, কেন, কি হ'য়েছে বাবা?

তিনি বললেন, সে দিন হীরেন্দ্র গঙ্গায় স্নান করতে দেখতে পেলেন—একজন লোক ডুবে যাচ্ছে! তিনি নিজে সাঁতার জান্‌তেন না, তবুও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত ধরলেন। কিন্তু জল সেখানে অনেক, তাই দুজনেই তলিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মাঝিরা অজ্ঞান অবস্থায় তাঁদের জল থেকে তোলে।

বাবা চলে গেলেন, আমি সেইখানেই লুটিয়ে পড়লাম। অনেক কাঁদলাম, কিন্তু শান্তি পেলাম না, বুক যেন ভার হয়ে রইল।

দিদি তোমার কাছে আজ কিছু লুকাব না, আমি তাঁকে ভালবাসি! তুমি যদি তোমার আকবরকে এই রকম ভাল বেসে থাক, তা হলে বুঝবে আমার কথা। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ এই, তুমি ভালবেসে সুখী হয়েছ, সুখী করেছ। আর আমি?—আমিও খুব সুখী হয়েছি দিদি, কিন্তু সুখী করতে পারলাম না, এই দুঃখ মরণেরও অধিক।

তুমি অবাক হচ্ছ? মনে ভাবছ, কি করে আমার এ দুঃসাহস হল! যবনী হয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি আসক্ত—এ কথা গল্পে শুন্‌লেও যেন কেমন লাগে, না? আমার কিন্তু কিছুই আশ্চর্য্য মনে হয় না। আমি জান্‌তাম, কোন প্রকারেই তাঁর পাশে আমার স্থান হতে পারে না। তবুও ভাল না বেসে যে থাকতে পারলাম না! দিদি, তোমার ঐ হাতটা, আঃ কি ঠাণ্ডা! দাও, আমার কপালের ওপর রাখ।

দরিয়া, একটু আঙুরের রস খাবি বোন? তোর গলা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে ভাই।

না না, এখন ও সব কিছু নয়, আগে আমার কথা শেষ করতে দাও'—

তার পর তিনি সেরে উঠে আবার আমাদের বাড়ী আস্‌তে লাগলেন। তিনি যখন সুর করে হাফেজের কবিতাগুলি আবৃত্তি করতেন, তখন আমি পর্দ্দার আড়াল থেকে তাঁর ভাবে ভোলা মুখের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকতাম। তাঁকে এত দেখেও আমার তৃপ্তি হত না। ইচ্ছে করত, তাঁর ঐ রূপ দিয়ে আমার চোখ দুটিকে অন্ধ করে দিই। কেন তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন? আমাদের মিলনের মাঝখানে এত বড় বাধা রচনা করে বিধাতার কি অভিষ্ট সিদ্ধ হল? আমি যদি একবার ঐ মুখের ওপর

মুখ রেখে বলতে পারতাম—আমি তোমায় ভালবাসি। দিদি, আমার এই ভাঙ্গাবুক ওষুধ দিয়ে সারাতে চাও? আমার কি ইচ্ছে করে, জান?—থাক সে কথায় আর কাজ নেই। তার পর শোন—

সে দিন বাবা বাড়ী ছিলেন না। আমি পড়বার ঘরের এটা-সেটা নাড়ছি, হঠাৎ দেখি আমার একখানা ছবি তাঁরই একখানা বই-এর ভিতর রয়েছে! দিদি, ভাই, সে-কি আনন্দ! সে আনন্দে আমার সমস্ত দেহ যেন মাতাল হয়ে উঠেছিল! আমি তাঁর বসবার চেয়ারের পায়ার ওপর মাথা রেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। এ কি সুখ! কি বুক-ভরা তৃপ্তি!

বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি সংযত হ'য়ে উঠে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই হীরেন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। ওড়নাটা মাথায় টেনে দেবার সময়, হাতের ধাক্কা লেগে একটা লাল কালির দোয়াত মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। খানিকটা কালি তারপর আমার কাপড়ে লেগে গেল। ওঃ লজ্জা কাকে বলে সেই প্রথম জানলাম।

তিনিও আমায় দেখে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়েছিলেন। কুণ্ঠিতভাবে বললেন, মাপ করবেন আমায়, আপনি এখানে আছেন জানলে আস্‌তাম না।

এ কি পেলাম, সে আমায় কি দিল আজ? ঐ কয়টা কথা সুখের কোন্ সপ্তম স্বর্গের রাণী করল আমায়! আমার ইচ্ছা করছিল, চীৎকার করে বলি—ওগো তুমি এস, বার বার এস। অমনি করে আমায় আরো কথা বল। আমার সকল শূন্যতা ভরে দাও তোমার কথায়! দিদি গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না।

সে দিন থেকে আর তাঁর মুখে হাসি দেখি নি. সর্ব্বদাই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে থাকতেন। সামনে বই খোলা পড়ে থাকৃত, তাঁর মন কোথায় থাকত কি জানি তাঁর সে উদাস চাহনি আমায় আকুল করে দিত। কেন তিনি এমন হলেন? এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কি আমার দুর্ব্বলতা তাঁর কাছে প্রকাশ করে ফেলেছি?

আমাদের পাড়ায় বসন্ত দেখা দিল। দু' একটি করে অনেক ঘরেই মারা পড়তে লাগল। আমি ভগবানকে জানালাম—এমন দোটানার মধ্যে আমাকে আর কতকাল রাখবে প্রভু? আর যে পারি না। হয় আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও, না হয় যাকে আমি আমার সব দিয়েছি তাকে আমার কাছে দাও!

আমাদের বাড়ীর দুজন চাকর মারা যাবার পর আমারও বসন্ত হল, সে কথা তোমায় জানাই নি কেন, জান? সত্যি আমি তোমার ওপর বড় রাগ করেছিলাম।

বাবা তাঁকে বললেন, হীরেন্দ্র, তুমি আর আমাদের বাড়ী এসো না।

তিনি বললেন, বসন্ত যদি হবার হয়, তাহলে এখানে না এলেও হবে।

তিনি বারণ শুনতেন না, রোজ আস্‌তেন।

চাকরে ভাল ডালিম, ভাল আঙুর কিন্‌তে পারে না, তিনি নিজেই তা নিয়ে আস্‌তেন। কেন তিনি আমার জন্যে এত কষ্ট করতেন দিদি? আমি যখন যাতনায় চীৎকার করে উঠতাম, তিনি ঐ পর্দ্দাটার কাছে এসে দাঁড়াতেন। দিদি, আমার আর সহ্য হ'ত না, তিনি আমার এত কাছে থেকেও কত দূরে ছিলেন।

আমি সেরে উঠ্‌লাম, তাঁকে ধরল সেই কালরোগে। কিন্তু এবার আমি ত গিয়ে তাঁর সেবা করতে পারলাম না। তাঁরা ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের পূজ্য; আমরা যে অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, মুসলমান।

বাবার মুখে শুনেছি, তিনি বিকারের ঘোরে বার বার আমায় ডাকতেন! এই দেখ দিদি, আমি কত সুখী! দরিয়াকে একদিনের জন্যেও তাঁর ভাল লেগেছিল।

সকলে বল্‌ত দরিয়া বড় সুন্দরী। তাই সে দিন আয়নার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম—কই সৌন্দর্য্যের চিহ্নও ত দেখ্‌তে পেলাম না! আমার যা কিছু ছিল, সব যে তাঁর চরণে উৎসর্গ করেছি! তিনি গ্রহণ করেন নি তা?—নিশ্চয়ই করেছেন। শুধু এই ব্যথা-ক্ষত দেহটা পড়ে আছে। ওতে আমার কোন দরকার নেই। আমার কাজ ফুরিয়েছে, তাঁর কাছে চলেছি দিদি। আমি তাঁকে আমার যা কিছু দিয়েছি তার সব হিসাব বুঝে নেব এবার।

—

মানবতা

[শামসুন্ নাহার]

দুই বন্ধুতে চা-এর দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আলোচনা চলেছিল নানা বিষয়ে—লোকার্ণো, জেনেভা, ব্রাঁয়া, মোসেল্, রিজা খাঁ, ইন্দোর, কাউন্সিল, আবদর রহীম – আরো কত কি।

হঠাৎ একটা মারপিঠের আওয়াজ কানে এল—সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি আর আর্ত্তকণ্ঠের মর্ম্মন্তুদ কাতর রোল। আমাদের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

জানলা দিয়ে বাইরে চাইতেই বুঝতে পারলাম কোন অসহায়ের উপর নির্য্যাতন হচ্ছে। চোর?—বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, চোর বলে কি এমন করে মারতে হয়?

লোকটা চোর নয় বলেই ত মনে হচ্ছে।

চোর নয় ত কি? ডাকাত? হলই বা ডাকাত, তা বলে অত অত্যাচার?

সে ডাকাত নয়।

তা হলে কি সে?—চোর, ডাকাত, খুনী, মাতাল, বদমাস, ফেরার – যাই হোক, তাকে রক্ষা করতেই হবে। চোখের সামনে মানুষের উপর এত অত্যাচার! আর আমরা চুপ চাপ বসে থাকব?

না গো না, ওসব কিছু নয়! ওপাড়ার ঝুংকুর বউ তরকারীতে নুন বেশী দিয়েছে বলে ওকে ওরা মারছে।*

ওঃ তা এতক্ষণ বল নি কেন? চা যে জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল। ওহে, খুব কড়া করে আর দু' কাপ চা দাও ত।

* টুর্গেনিভের ছায়া অবলম্বনে।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

বদন বোকে গেছে।

আক্ষেপ এবং অভিযোগের সঙ্গে একদিন এই কথাগুলো আমার কানে এসে পৌচেছিল।

ভাবলুম মানুষ কেন বকে? কে তাকে বকায়?

মদ, মেয়ে-মানুষ? এই দুটোরই ব্যবহার, তার অত্যধিক ভাল লাগে।

সত্যিই কি তাই?

বদন, লোকের মুখের ঝাল খেয়ে লাভ নেই ভাই, বল ত তোমার প্রাণের কথা কি?

ঝাঁকড়া চুলগুলো পিঠের দিকে ঠেলে দিয়ে সে ব্যাজার হ'য়ে বল্লে, ধরে নাও না,—তাই।

কেন? যা সত্যি, তা ব'লতে তোমার বাধা কি?

বাধা? কাকে আমি দুনিয়াতে মানি?

খুড়ী-মা?

বদন এমন একটা বিশ্রী মুখ ক'রলে যে, তার কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রতে আমার সাহস হলো না।

সে বল্লে, যাও যাও—ডাক্তার, আর বাজে কথা ব'লে ফল কি? আমায় একটা ওষুধ দেও।

বল্‌ছিলে গা বমি-বমি ক'রে, না? তাই ত;—লিভারের জায়গায় ব্যথা?

মাঝে মাঝে ক'রে থাকে।

মদের ঐ একটা বদ্‌খৎ দোষ।

কি?

লিভারটাকে একদম জখম ক'রে দেয়।

গম্ভীরভাবে বদন বল্লে, মদ ধরার বহু আগে—ওটা আমিও জান্‌তুম হে।

তবে?

তবে কি? আমি কি সাধ করে মদ ধরেচি, কিরণ, কেউ কি সাধ ক'রে ঐ বিষ খায়!

বদন যেন মনের আবেগে আত্ম প্রকাশ ক'রে ফেল্‌তে যাচ্চে—বুঝে আমি চুপ ক'রে শুনে যেতে লাগ্‌লুম।

কেউ না—কেউ না। বড় দুঃখে মানুষে মদ ধরে। যখন অহর্নিশি মনটা পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতে থাকে—যখন মনের কথা ব'লে জুড়োবার একজনও কেউ থাকে না—তখন মানুষ মদের আশ্রয় নেয়। সব ভুলিয়ে দেয়—ঐ বিষের বিন্দু, ঐ আনন্দের সিন্ধু!

একজনের অপরাধে আর একজন যে কি গোল্লায় যায় কিরণ, তা আমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। সুধাসিন্ধু মন্থন করলাম আমি;—কিন্তু তাতে আমার নেই দাবী!—দেবতার ভোগে এলো; আর গরলই জুটলো আমার ভাগ্যে!

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বদন বল্লে, তোমরা মাতালকে ঘৃণা কর; কিন্তু বাস্তবিক মাতাল করুণার পাত্র।

বল্লুম, যার জন্যে এই কাণ্ড করলে, সে কি দিলে, বদন?

কি দেবে সে? নিজের পাপের আগুনে পুড়ে মরচে—সেও। ঐটেই আমার জীবনের এখন একমাত্র শান্তি দাঁড়িয়েছে।

পাপ কিসের?

পাপ নয়? একজনকে ভালবেসে টাকার লোভে আর একজনকে বিয়ে করা! এর চাইতে বড় পাপ, এ পৃথিবীতে আর কিছু হ'তে পারে না, কিরণ!

তুমি হয় ত মনে মনে হাসচো। গায়ে তোমার তেল মাখা, কোথাও ধরা দেও না;—কিন্তু এই ভালবাসাটা উপহাসের বস্তু নয়। বুকের হাড়পাঁজর চূর্ণ ক'রে ওর একফোঁটা বার হয় ...আর সবের অপমান মানুষে সইতে পারে। কিন্তু ওর অবহেলা, ওর অপমান—একেবারে মারাত্মক। তখন জীবনটাকে দুই পায়ে দলে, চট্‌কে লণ্ড-ভণ্ড করে দিতে ইচ্ছা করে। সে যে কি তীব্র কি কঠোর কি উদ্দাম—যার না হয়েচে—তাকে কথায় বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব।

ওষুধ নিয়ে বদন তাড়াতাড়ি চলে গেল। কাজ সেরে তার কথা ভাবতে ভাবতে, ঠিক সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তখনো কেউ আসে নি।

ভাবলুম ভালবাসার যৌবনী কি কেবল বদনেরই? সত্যি কি প্রেম মানুষকে এমনি উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম ক'রে তোলে? তার দাহ নিবারণ করতে বোতল বোতল মদ বাষ্প হয়ে যায়! কি জানি!

বদন ইলাকে চেয়ে পায় নি। সঙ্গতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ত চাওয়াটাই অসঙ্গত এবং না পাওয়াটা সঙ্গত।

এ কথা বদনের মনে হয় না কেন? লোভী ছেলে, যা চাইবে, তাই কি তাকে পেতে হবে?

ভারি মজার জিনিষ এই ভালবাসার দাবীটা! কখন্ কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে গোপনে বদন ইলাকে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই চেয়ে বসেছিল; এই চাওয়ার মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই! তোমাকে যে আমার ভাল লেগেছে! বেশ কথা;—তুমি ইলার পায়ে আত্ম-সমর্পণ করতে পার; কিন্তু ইলা কেন তোমার কাছে আত্ম-বিক্রয় করবে?

বদন যেন চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বল্‌চে, দেখতে পেলুম;—আমি যে তাকে সমস্ত মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি! কেমন ক'রে সে এ ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করবে? ভালবাসা উপহাসের বস্তু নয়, কিরণ!

সে কথা ঠিক ; যদি তা' সত্যিকার ভালবাসা হয় ; কয়লার খনিতে হীরের মত ! হৃদয়ের কোন্ গভীরতম প্রদেশে শান্ত-নিবিড় ধ্যান-মৌন ; তা' অচপল, দাহহীন, নিষ্কলঙ্ক জ্যোতিতে দয়িতের কল্যাণ কামনা করে। প্রেম অটল ধৈর্য্যে জন্মজন্মান্তরের জন্ম প্রতীক্ষা করতে জানে।

মহাকালের রোষ বহ্নিতে মদন পুড়ে ছাই হয়ে যায় ; কিন্তু উমার হৃদয়-কোরকের প্রেম পরিমল সদাশিবের জন্ম অটল ধৈর্য্যে, অনিমেষ প্রতীক্ষায় অনন্ত কাল ধরে অপেক্ষা করতে জানে !

তার অবসাদ দূর করার জন্যে মাদকের প্রয়োজন হয় না ; তার ব্যথার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মরণ কামনা ক'রে - আত্মহত্যা ক'রতে হয় না।

বদনের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা !

এত বড় একটা কড়া রায় দিয়ে মন অস্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো। পরের সমালোচনা করা কি সহজ !

তখন সমালোচনার তীব্র জ্যোতিতে নিজেরও কঠোর বিচার আরম্ভ ক'রে দিলুম।

তুমি ভালবাস নি ইলাকে ?

বেসেছিলুম।

ছিলুম ? সুদূর অতীতে ?

তাই বটে !

এখন ?

সে মোহ কেটে গেছে।

মোহ ?

মোহ নয় ত কি ? যার মূল নেই, যার ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা নেই—তা ক্ষণিকের মোহ বই কি ? যা স্বচ্ছ সরোবর ব'লে মনে হয়েছিল—তা যখন ছায়াবাজির মত চোখের সাম্‌নে থেকে সরে গেল— তখন আমার মোহও ডানা-বাঁধা পাখীর মত আকাশ ছেড়ে মাটিতে হামাগুড়ি দিতে লাগলো। মায়া কেটে গেছে !

অন্তরের সুদূর কেন্দ্র থেকে ভূমিকম্পের ঘর্ঘরের মত গম্ভীর বাণী যেন আমার কানে এসে পৌছল :—

ওকে ভালবাসা বলে না। প্রতিদানের প্রত্যাশা রেখে ভালবাসা হয় না, নিজেকে দু'হাত ভরে কেবল দিয়ে দেওয়া। প্রসাদ পাবার লোভ থাক্‌লে হয় না। তার হেতু থাকে না, অতীত নেই, বর্ত্তমান নেই - ভবিষ্যতের আকাশ-কুসুম নেই।

অন্তরের গম্ভীর নির্ঘোষের সঙ্গে বাইরের বিরাটের গুরু গর্জ্জনের হঠাৎ একটা মিল যেন খুঁজে পেলুম। অবাক হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম,—হে মহাম্বুধি—এ কার চরণের লালসায় তুমি যুগ যুগ ধ'রে অশ্রান্ত স্পন্দনে নন্দিত হচ্ছ ? এ কিসের আনন্দ তোমার ? আনন্দ না দুঃখ ?

কি ভাবচো তুমি ?

চম্‌কে ফিরে দেখলুম, নীলিমা।

কিছু না।

না ; বল না আমাকে।

বল্লুম, কিসের আকুলতা এই সমুদ্রের ?

এ কি ভেবে শেষ করা যায় ?

তবুও—ভাব্‌তে ভাল লাগে।

কেবল এই সমুদ্রের কথাই এতক্ষণ ধরে ব'সে ব'সে ভাবচ ?

তুমি কতক্ষণ এসেছ নীলমণি ?

অনেক্ষণ।

ডাক নি কেন ?

কি জানি !

বল্লুম, ঠিক সমুদ্রের কথাই যে ভাবচি তা নয় ; বদনের কথা ভাবতে ভাবতে—কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি !

বদন তোমার খুব বন্ধু ন' ?

বন্ধু ঠিক বলা চলে না, ওর ওপর কেমন একটা টান আছে। বড় দুঃখ হয় ওর জন্ম।

বয়স ত বেশী নয়।

না ; সে দিনও ত এতটুকু ছিল। সঙ্গ-দোষে এমন হয়েচে।

নীলিমা হেসে বল্লে, এখেনেও ত' তার কসুর নেই। জিঠানি ত' ওকে লুপে নিয়েছে।

বল্লুম, এক-একজন কেমন একটা দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে এ সংসারে, নিজের ব্যক্তিত্ব না থাকায় আস্‌-পাশের সকলের প্রভাবে, আওতা-পীড়িত গাছের মত কুঁকড়ে বিকারের পর বিকার প্রাপ্তই হ'তে থাকে।

ওকে, নীলিমা বল্লে, ইলা-দি ইচ্ছা করলেই ত' ফিরিয়ে দিতে পারে।

বল্লুম, নীলমণি, ইলা-দি কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে কোন কাজই করবে না। ছনিয়ার সাধারণ গতি-বিধি থেকে অদ্ভুত রকম নিজেকে দূরে রাখার বিদ্যা তার আছে।

নীলিমা যেন একটু রাগ করেই বল্লে, তাতে বোধ করি শেষ পর্য্যন্ত ঠেকায় পড়তে হবে—তোমারও প্রাণান্ত হবে।

কেন?

জিঠানির অসুখ ত' করলো বলে।

পাকা হাড়।

থাক্‌গে পর-চর্চ্চা আমাদের।

মৃদু হেসে বল্লুম, তাহ'লে এস পরস্পরের প্রশংসাবাদ আরম্ভ করা যাক্।

সেও ভাল পর-চর্চ্চার চেয়ে।

বল্লুম, তোমার ইলা-দি'র নিন্দে করলেই তুমি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ।

সে রাগ করে বল্লে, আবার!

আচ্ছা—নিরস্ত হলুম; তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, দেখি কি উত্তর দাও।

কি?

তোমার ইলা-দি কেন ঐ বুড়ো সায়েবটাকে বিয়ে করেছে বলতে পার?

তোমার উপর রাগ করে।

আমার ওপর?—আমার ওপর! রাগ? কিসের রাগ! কেন রাগ?

নীলিমা কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বল্লে, তা জানি নে, তবে একদিন তার কথাতে বুঝতে পেরেছিলুম যে, সে তোমার উপর মোটেই খুশী নয়।

হেসে বল্লুম, তাই নাকি? যেহেতু—?

আমি তোমাকে বলবো না—বলতে লজ্জা করে—সে রাগের কথা,—মিথ্যা কথা, তা আমি জানি।

অবজ্ঞা ভরে হেসে বল্লুম, নীলমণি, মিথ্যাকে তুমিই বা তবে এত বড় দাম দিচ্ছ কেন? যদি তাকে মিথ্যাই বলে বিশ্বাস করতে ত কিছুতেই ওটা তোমার মনে এমন গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াতো না।

নীলিমা হঠাৎ যেন কেমন দমে গিয়ে বল্লে, বল, তুমি শুনে মন খারাপ করবে না?

তার চেয়ে তুমি আমাকে ওকথা বোলো না। শুনার আগে আমি অমন একটা কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখতে পারি নে।

তোমায় না বলেই বা কেমন করে থাকবো! বলে সে গম্ভীর মুখ ক'রে ব'সে রইলো।

আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারি নে! কি বিপদ না হ'লো আমার নীলমণির!

আর ভূমিকা না করে সে বল্লে, ইলা-দি অনেকবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছে,—বলে, তোমার সঙ্গে মিশলে আমি একদিন বড় দুঃখ পাব!...

হঠাৎ আমার কান দুটো গরম হয়ে সমস্ত মনটা যেন আগুন হয়ে উঠলো। কোন কথা না বলে চুপ করে রইলুম কিন্তু।

ইলা-দি তোমাকে সুখের পায়রা বলে, তোমাকে চানক্যের মত চক্রী মনে করে,—বলে, সে কেবল ঈশ্বরের কৃপায়—তার মনের জোর পেয়েছিল—নইলে কি যে হতো...

নীলমণি, থাকগে ভাই, ওকথা।

তাই ভাল!—বলে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দুটি হৃদয়-কোরকের অনাঘ্রাত সৌরভে,—দুটি একসুরে বাঁধা তারের অনাহত সঙ্গীতে—আমাদের মধ্যে সকল দূরত্ব একাগ্র তন্ময়তায় লীন হয়ে গেল!—মহাকালের বীণাযন্ত্রে আগত এবং অনাগত, ভুজ-বন্ধনে লীলাবদ্ধ হয়ে—অনন্তের তীর্থ-মন্দিরের উদ্দেশ্যে—নিমেষে বেরিয়ে পড়ল!

অন্ধকারের ভিতর থেকে ভারি গলার বিকৃত শব্দ!

ডাক্তার, ডাক্তার—বদনকে বাঁচাও!

পলকে নন্দনের স্বপ্ন কোথায় লুপ্ত হয়ে মিশিয়ে গেল।

* * * *

কাটা পাঁঠার মত বদন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল—জল, জল—জল দাও!

সে ঘরে কেউ ছিল না। একগ্লাশ জল তার হাতে তুলে দিলুম।

আঃ বাঁচলুম, কিরণ! তুমি ভাই, এই ঘরেই থাক—আমার বড্ড ভয় করে।

কিসের ভয় বদন?

ভয়! বদন কাঁদতে লাগলো।

মানুষের সেই একমাত্র ভয়ের জিনিষ--আমি পাপী, আমি দুর্ব্বল—তুমি থাকলে—তারা আসবে না ভাই।

তোমাকে ওষুধ দিতে হবে যে!

কি হবে ওষুধে? এ রোগ ওষুধে সারে না।

সারবে বৈ কি। একটু ধৈর্য্য ধর।

কিরণ, আমাকে তোমার বাড়ী নিয়ে চল। আমি এখানে থাকলে বাঁচবো না।

তারও ত' ব্যবস্থা করতে হবে।

দূরে—ঘরের বাইরে—জিঠানি দাঁড়িয়ে ছিল! আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে। গেলুম।

কি বুঝ্‌ছ? কলেরা?

তাই বটে।

আমরা ঠিকই আন্দাজ করেছি। তারপর?

তোমাদের কাউকে এসে বসতে হবে—আমি তোড়জোড় নিয়ে আসি গে।

দেখলুম, ইলার ঘরের চতুর্দ্দিকে গন্ধক জ্বালান হচ্ছে।

ইলা কৈ?

সে বড় নার্ভাস্।

বল্লে কি চলে?

কেউ আস্‌তে চায় না—

তুমি এসো!

আমি আমি—জিঠানির গলা কাঁপতে লাগলো।

কিছুক্ষণের জন্ত;—তারপর হাঁসপালের লোকজন এসে পড়্‌বে।

তুমি ইলাকে বল।

একটা কোচের উপর ইলা শুয়ে পড়েছিল, তার মাথায় একটা চাকরে হাওয়া করচে।

ইলা!

কিরণ, আমার বুক ধড়ফড় করচে।

এমন করলে বদন ত' বাঁচবে না।

কি করবো বল?

শক্ত হ'তে হবে, ইলা।

আমি তা' পারবো না, কিরণ।

বদন কি তবে বেঘোরে মারা যাবে? বোধ করি রাগ ক'রে—কর্কশ গলায় বলেছিলুম।

আহত সাপ যেমন হুস্ ক'রে ফণা ধরে গর্জ্জে উঠে—ইলা তেমনি ক'রে উঠে ব'সে বল্লে, কে বদন? কিসের বদন? কেন তার জন্তে প্রাণ দিতে যাবো কিসের দায় আমার? কে আস্‌তে বলেছিল তাকে?

স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এ কি সম্ভব!

ঐ ঘর থেকে নোংরা কাপড়-চোপড়ে- তুমি কি করতে এলে এখেনে?

বুঝলুম, মৃত্যু-ভয় মানুষের সহজ বুদ্ধি হরণ ক'রে তাকে পাগল ক'রেও দিতে পারে।

এক-পা এক-পা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে উঠোনে নেবে মনে হলো—পৃথিবীর সব বাতাসেই নরকের বিষ মাখানো নয়; কিন্তু তখনো কিসের ঝাঁজে যেন চোখ মুখ ঝল্‌সে যাচ্চে!

মনে-মনে বল্লুম, হে মানুষের ভাগ্য-দেবতা, তুমি ঐ অসহায় বদনকে দেখো।

দোরের কাছ থেকে নীলিমাকে দেখতে পেয়ে আর কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করতে পারলুম না। ভগবান, তুমি বিপদেই মানুষের কাছে সব চেয়ে প্রত্যক্ষ হ'য়ে দেখা দাও!

নীলিমা বদনের সমগ্র ভার নিয়ে মূর্ত্তিমতী দয়ার মত ঘর জুড়ে ব'সে আছে!

তখন ছুটলুম হাঁসপাতালের দিকে।

মনের সমস্ত ক্ষোভ কোথায় মিলিয়ে গেছে! আনন্দে আমার চিত্ত-শতদল বসন্তের মলয় বাতাসে ফুল যেমন উতলা হয়ে উঠে—তেমনি ক'রে হেলচে, দুল্‌চে! তার নৃত্যের আর অবধি নেই।

অবাক হয়ে গেলুম;—বুকের সেই পাথর চাপা ভারটা কোথায় গেল!

হঠাৎ চোখের সাম্‌নে একটা ছবি ফুটে উঠ্‌লো—জগদ্ধাত্রীর রাঙা টুক্‌টুকে পা দু'খানির উপর—পরিপূর্ণ গৌরবে ফুটে ওঠা একটা বিশাল স্থল-পদ্ম—আত্ম-নিবেদনের সার্থকতায় শুচিস্মিত !

মুখ দিয়ে প্রসন্ন স্বস্তিবাচন বেরিয়ে এলো, হে নারী, তুমি অপরাজিতা !

(৬)

অন্যায় করে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। আশ-পাশের লোকেরা যদি চুপ করে থাকে তা হ'লে মনের মধ্যে ঝড় বইতে থাকে, ভূমিকম্প হয়—সময়ে সময়ে আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাৎ হ'য়ে ভিতরটা পুড়ে যেতে থাকে।

তখন ত্রুটি-মেরামৎ, প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, অনুশোচনার পালা। শাস্ত্র বলেন, এমনি ক'রেই মানুষ খাঁটি হ'তে থাকে। বাইরে বিচার, সমালোচনা, শাস্তি—তার মনকে অশান্ত ক'রে—ঘুলিয়ে তুলে বিদ্রোহী ক'রে দেয়।

দিন কতকের জন্য জিঠানিদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা কেমন একটা অদ্ভুত দাঁড়িয়েছিল। বদন সেরে উঠে হাসপাতাল থেকেই সটান্ বাড়ী চ'লে গেল। ইলার কথা, নীলিমার ভয়ে আমাদের কইবার উপায় ছিল না। সে এক কথায় ইলার দোষের উপর চুণকাম ক'রে দিতো। ইলা-দি জানে না যে, এমনটা করা অন্যায়। আমরা সে-কথা অবিশ্বাস করলে সে এমন গম্ভীর হয়ে যেত যে, আমাদের কেমন ভয় ভয় ক'রতো।

পরিহাস-রসিক কিন্তু চুপ-চাপ থাক্‌বেন না। তিনি একের মধ্যে বহুর সৃষ্টি করেন ;—তিনি একঘেয়ের মধ্যেও বিচিত্রতার সুর বাজান।

তাই বোধ করি হাবু দত্ত এসে উপস্থিত হ'লেন। এবারে বৈষ্ণব-বৈরাগীর বেশ ! কালো নাকটি জুড়ে তিলক, লম্বা চুল জড়িয়ে সাপের ফণার মত ঝুঁটি। হাতে কেবল একটি লাগ্‌-বজা বং—গুপি-যন্ত্রের অভাব !

তিনি জীবনে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বর চেয়ে ঝগড়াই বেশি ক'রেছেন,—তাই এসেই বুঝতে পারলেন যে, আমাদের মধ্যে একটা থম্‌-থমে ভাব দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন এসে বল্লেন, কিরণ, আমি যে ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছি, তাতে তৃণের চেয়ে নীচু হতে হয়, তরুর চেয়ে সহিষ্ণু হ'তে হয়—তা বোধ হয় তুমি জান।

আজ্ঞে, জানি।

তাই আমি মনে করচি যে, তোমাদের মধ্যে একটা মিট্‌মাট হয়ে যাওয়া ভাল।

কিসের ?

তাঁর সেই দিল-খোলা বিকট হাসি। তারপর, বুঝেছ কিনা ? শর্ম্মা নেহাৎ বোকা নয়,—ইলাদের সঙ্গে তোমাদের একটা যেন কেমন কেমন চলচে—তা' বুঝি।

আমাদের ?

বাবা, তুমি ত' এখন একা নও'—একটি সুগ্রীব জুটেচে পেছনে। নিজের রসিকতায় একচোট হেসে নিয়ে বল্লেন, ওই যে একটি মেয়ে—কি তার নামটা,—ছাই মনে আসে না—কি প্রেমীলা, না কি !

বল্লুম, বুঝেছি—তারপর বলুন।

তারপর আর কি ?—মিটিয়ে নাও।

আমি কে ?—কৈ ? আমাদের ত' কোন ঝগড়া হয় নি !

তা জানি—তুমি ঝগড়া করবার লোক নও, তবুও হয়ে গেছে ;—বুঝেছ কিনা ? ইলার ট্রেনিংটা একটু রিফাইণ্ড গোছের—আর্টিষ্টিক্—নোংরা-ঘোংরা—বুঝেছ কিনা ?—ও সব ও বড়—একটা বরদাস্ত করতে পারে না। আর তাও ও-কি, বুঝেছ কিনা, একটু বেশী রকম সরল কিনা ?—বুঝে উঠ্‌তে পারে নি যে, ধাঁ ক'রে বদ্‌নার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে প্রেমিলা নব-দময়ন্তি অভিনয় ক'রবে।

রাগও হলো—হাসিও পেলে। বুঝলুম, পিতা-পুত্রীতে এ নিয়ে খুবই একটা আলোচনা হয়ে গেছে।

গম্ভীর হয়ে রইলুম। কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা হ'লো না।

হঠাৎ হাবু দত্ত আমার হাঁটু দুটোর উপর ঝুঁকে পড়ে বল্লেন, এই আমাদের ধর্ম্ম—আমি ইলার হয়ে—তোমার কাছে মাপ চাইচি—

আঃ কি যে করেন !

তুমি বল, যে, ইলাকে ক্ষমা করলে ?

আমার হয়ে ইলাকে আপনি ত ক্ষমা করতে পারেন।

হাবু দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, ঠিক ব'লেছ তুমি—আমার ভুল হচ্ছিল।

খুব দ্রুত পদে হাবু বাবু সেখেন থেকে চ'লে গেলেন।

* * *

নীলমণি!

কি?

তোমার একটা নূতনতর নাম হয়েছে,—শুনবে?

বল না।

প্রেমিলা।

আঃ তুমি ভারি দুষ্টু।

হাসতে লাগলুম।

কে দিয়েছে?

তোমার ইলা-দি'র বাবা।

তিনি এসেছেন?

বাঃ দেখ নি তাঁকে? ঐ যে কালো লোকটি!

নীলিমা ভারি রাগ করতে লাগ্‌লো। এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু—

কেন?

ওকে আমি অনেকবার এর আগে দেখেচি—ও-তো বোর্ডিং-এ প্রায় আস্‌তো—ইলা-দি বলেচে, ও ওদের গোমস্তা—ও ইলা-দি'র বাবা হতে যাবে কেন?

আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা ঘূর্ণিবাতাস খেলে গেল—তার মধ্যে কবেকার যেন পরিচিত স্বর কথা কয়ে গেল—ওর জীবনটাকে কল্যাণময় করে তোলবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার—বোধ করি জীবনে এতখানি বিস্মিত আর কোন দিন হই নি।

নীলিমা আমার আবিষ্টতা ভাঙিয়ে দিয়ে বল্লে, ওই যে ওঁরা সদল-বলে আস্‌ছেন।

আমার গা দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম বার হ'তে লাগলো,—তার উপর সমুদ্রের বাতাসে কেমন যেন ভিতর দিক থেকে কাঁপুনীর মত উঠে আমাকে প্রায় বিকল করে দিলে!

হাবু দত্ত দূর থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন, ডাক্তার, আমরা কি আসতে পারি? জামাই বাবাজীর সাম্‌নে তিনি ইংরেজি বলার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না।

জিঠানি কাছে এসে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বল্লে যে, আমাদের নিভৃত-সম্ভোগে বাধা দেওয়ার জন্যে তাঁরা একান্ত দুঃখিত।

এ সব আদব-কায়দার একমাত্র উত্তর অবজ্ঞার হাসি;—বোধ করি আমাদের দুজনের মুখেই তা'র প্রচুর নিদর্শন ফুটে বেরিয়েছিল।

ইলার ভাবটি কিন্তু ভারি মজার:—তোমরা নিরীহ লোকের উপর যে কত অবিচার ক'রেছ—তা তোমরা জান না; কিন্তু তাই বলে আমি অবিচার করতে পারি নে; আমি তোমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমাই করেছি!

যখন মনের গরমিল থাকে তখন কোন বৈঠকই জমে না। সেই সময়ে মানুষ আর কথা বলার বিষয় খুঁজে পায় না। তখন চিড়িয়া-খানার প্রসঙ্গ বোধ করি সকলের পক্ষে নিরাপদ এবং মুখরোচক হয়।

এ-ক্ষেত্রে তাই হয়ে দাঁড়াল। কোন্ বাঁদর কতখানি লাফাতে পারে, খাঁচার কতখানি তফাতে দাঁড়ালে বিপদের সম্ভাবনা থাকে না—ইত্যাদি ইত্যাদি কথাতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসাতে—যখন আর পরস্পরের মুখভঙ্গী দেখার উপায় রইল না তখন ইলা বল্লে, নীলু, তোমাদের এক দিন ডাক্‌বো মনে করচি।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে ডাকবো—খাওয়াবো।

বেশ ত।

আস্‌বে কি?

ইলা-দি, আজ তুমি এত গম্ভীর কেন?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইলা বল্লে, তোমরা তার কি বুঝবে! —যার বাজে, সে-ই বোঝে।

হাবু দত্ত জামাতা বাবাজীকে বুঝিয়ে দিলেন, whose thunder—his understanding.

জিঠানি বল্লে, এই বাংলা ভাষাটা কি জ্ঞান-গর্ভ! এর প্রতি শব্দের পুচ্ছে এক-একটি অর্থের খনি ঝুলে আছে।

নীলিমা বল্লে, সাহেব, আর ইংরিজির?

ব্যাক্ পুশ্।

হাবু দত্ত তর্জমা করলেন, পাঁথড়!

ঠিক মনে নেই, হয় পরের দিন নয় পরের পরদিনে—জিঠানির বাড়ীতে আমরা ইলার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম হাবু দত্ত তাঁর স্বভাব-সুলভ চল-চাপল্য এবং অস্বাভাবিক বিনয় নম্রতা দিয়ে আসর জমিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন।

ইলা আজও গম্ভীর। তার চলায় ফেরায় কথায় বার্ত্তায়—এইটুকুর পরিস্ফুট প্রকাশ- এসবের কিছু দরকার ছিল না তবে কিনা বাবার ইচ্ছা!- যেমন করেই বা তা ত না বলি!

নিজেকে উৎসবের উপযুক্ত করে তোলবার জন্ত জামাতা বাবাজি মেজাজ রঙিয়ে তুলেছিলেন।

কিছুরই অভাব নেই—তবুও সবই যেন শূন্য! অকম্পিত শিখায় আলো জলচে- অমলিন ফুলের সৌরভ চারিদিকে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্চে!

ইলা-দি, একটা গান কর।

শরীর ভাল নেই।

হিলা—

ইলা সাহেবের দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করতেই স বেচারি দমে গেল

হাবু দত্ত আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্লেন তুমি বল্লেই সে গাবে।

বল্লুম, ঠিক গান করার সময়ে গাইয়ে লোকের শরীর ভাল না থাকা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য

সটা সিড্ডা অট্টি?

হাবু দত্ত তর্জ্জমা করলেন, Self-boiled truth,

হঠাৎ হাসির উচ্ছ্বাসে চারিদিক ভরে গেল।

ইলা বল্লে, আপনি আর জ্বালাবেন না।

হাবুবাবু, ওটার তর্জ্জমা?

Fry not again

আবার হাসি।

বল্লুম, সাহেব, একটা বাংলায় বক্তৃতা হোক না কেন?

হামি প্রস্টুট থাকে সর্ব্বডা—

আমরাও তৈরী আছি

তখন সাহেবের বক্তৃতা সুরু হলো:—

যদিচ হামি বাংলা বলে না, টঠাপি বাংলা ঝানি। বাংলা ভাষা হামার মাটৃ ভাষা হয় না- পরণ্টু পেট্‌নী ভাষা।

হাবু দত্ত বল্লেন, হিয়ার হিয়ার!

ইলা রাগ করে গিয়ে অর্গানে সুর দিলে। নিমেষে চারিদিক শান্ত হয়ে গেল। অভিমান ভরা মুখে সে তখন গান করতে লাগলো:

> আমি তোমায় যে শুনিয়েছিলেম গান,
> তার বদলে আমি চাই নে কোন দান॥

পাহাড়ের বুক ফেটে কি এমনি ক'রেই আবেগাতিশয্যে নির্ঝর উচ্ছ্বসিত হয় না! এমনি ক'রেই কি কালো কষ্টি-পাথরের উপর বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথার অশ্রু ঝ'রে পড়ে না

মনে হলো, ভালবাসার ভুর্গের মত মানুষের এমন একটা কিছু আধ-জাগা আধ ঘুমে স্বপ্নের জড়িমায় বাস করে, যা'কে সংসারের ধূলি মলা, ক্লেদ-গ্লানি কোন রকমেই স্পর্শ করতে পাবে না। দুনিয়ার বাইরের আবরণ এত পুরু এবং কঠিন যে, তা' ভেদ করে কচিৎ ভিতরে পৌছন যায়।

লোকজনের কথাবার্ত্তা আলো ফুল, মালা হঠাৎ সব যেন কোথা দূরে স'রে গেল; মনে হলো আমি একলা—কোথায় কোন্ দূর অতীতের শেষ প্রান্তে সরে গেছি। অতীতের পরিচয়টুকু; সেখানে কেবল গানের রেশের মত আছে—কি নেই; তা বোঝা শক্ত।

আবেশ ভাঙ্গলো যখন বুঝতে পারলুম যে, হাবু দত্ত আমার গলায় একটা মোটা গোড়ে পরিয়ে দিয়ে বলচেন আজকের জয়মাল্য তোমারি পাওনা, কিরণ!

কিসের জয়?

দিগ্বিজয়।

জিঠানি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, আমি একটা সংশোধন প্রস্তাব করি,—লিমারই ঐ মালাটা প্রকৃত পাওনা।

আমার কোন আপত্তি নেই সায়েব।

গলা থেকে মালাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে দিলুম।

জিঠানি সেটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ছুঁইয়ে অভিবাদন ক'রে, লিলিমার গলায় পরিয়ে দিয়ে—তার পুরু হস্ত দুখানা চাপড়ে হাততালি দিয়ে বল্লে—ক্যাপিটাল্!

ইলা আবার সুর দিয়ে বল্লে, কিরণ, আজ একটা খুব পুরোনো গান মনে হয়ে গেছে, শোন :—

কেন ধ'রে রাখা মিছে — ও যে যাবে চ'লে
মিলন যামিনী গত হ'লে—

··· দেখা গেল হঠাৎ ইলা ঝিমিয়ে যেন শুয়ে পড়চে। নীলিমা যখন তাকে ধরে ফেল্লে, তখন আর তার কোন চৈতন্তই নেই!

মিনিট পনর পরে ইলার জ্ঞান হলো সে বল্লে, আমাকে ঘুমোতে দাও অমন আমার মাঝে মাঝে হয়।

সে ঘুমিয়ে প'ড়লে আমরা পা-টিপে বাইরে বেরিয়ে এসে সে রাত্রের জন্ত বিদায় নিলাম।

*　　*　　*

পরের দিন একটা অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলুম।

মা লিখচেন, আমার বিয়ের সব ঠিক-ঠাক্—পত্র পাঠ ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

এলুম নীলিমার কাছে। সে চিঠিখানা আগা-গোড়া পড়ে বল্লে, ছুটি পেয়েছ?

হুঁ, তাতে কোন গোল হবে না।

কবে যাবে?

তা ঠিক করি নি।

আজই ত যাওয়া তোমার দরকার।

দরকার!

তা নয় ত কি?

চুপ ক'রে সময় কেটে যেতে লাগ্‌লো।

নীলিমার মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হলো না! তবে কি—? সে কথা মনে করতেও আমার পাঁজরার হাড়গুলো যেন খুলে আসে আর কি!

অনেকক্ষণ পরে বল্লুম, নীলমণি, কি করবো—বলে দেবে না?

সুহৃদ-দৃঢ়তার সঙ্গে সে বল্লে, এতে পরামর্শ দেবার মত কি আছে? তোমার মা'র হুকুম, না কি বল্‌তে পার?

আমি যাবো না।

ছিঃ, তা কি হয়? ও-কথা মনে করতেও নেই। তুমি আজই রওনা হবে। আমি একটু সাম্‌লে নিয়ে গিয়ে তোমার সব গোছ গাছ করে দেব এখন।

নীলিমা—

ছেলে-মানুষী ক'রো না, ভাই!

বাড়ী ফিরতে ফিরতে—অবাক হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। কৈ, চোখে এতটুকু বাষ্পের লেশ নেই,—কোথাও এতটুকু বিপদের ছায়া পর্য্যন্ত নেই! এ যে পাথরের মূর্ত্তি!

ফিরে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে চুপ্‌টি করে পড়ে পড়ে মাথা মুণ্ডু কি যে ভাব্‌লুম—তা জানি নে!

জিনিষ পত্রের গোছ করে দিয়ে নীলমণি বল্লে, খেয়ে যাবে আমাদের ওখেন থেকে। একটু সকাল সকাল যেও।

জানি নে, কখন সে চলে গেছে!

বুক ভরা ব্যথা নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। মাসীমা'র স্নেহসুন্দর মুখখানি ঠোঁটের উপর স্নিগ্ধ হাসির রেখা—মেঘলা রাতের চাঁদের আলোর মত। একটি ছোট মরক্কোর বাক্স হাতে করে এসে বল্‌লেন, শুন্‌চ কিরণ এটি আমার বৌ-মা'র জন্তে—তুমি তাকে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ো।

নীলিমা স্তব্ধ-গম্ভীর; বর্ষার ক্লান্ত বর্ষণ মেঘখানির মত ইতস্তত সঞ্চরণ করচে! জলই ঝ'রে পড়ে, কি বিদ্যুৎই চম্‌কায়—তা সে নিজেই জানে না!

কোথায় গেল তার লঘু চপলতা! বল্‌লে, কতদিনে ফিরতে পারবে, মনে কর?

যত শীঘ্র পারি।

না…

হাস্‌লুম।

একমাসের একদিন আগে এলে দেখতে পাবে কি হবে তোমার।

নির্ব্বাসন?

তার চেয়ে বড় কিছু

অন্ধকার রাতে সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আলো চমকায়—তেমনি ম্লান অথচ মধুর জ্যোতি ঐ চোখ দুটির মধ্যেও যেন লুকিয়ে যেতে চায়!

নিজেকে একটুও ব্যক্ত করে—কাঁসের উপর ফাঁসি দিয়ে—মানুষের ব্যথার বোঝা বাড়িয়ে দিতে চায় না সে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় সত্যি কথা এই ব্যথাই মানুষের জীবনের সব চেয়ে দামী জিনিষ;—এর কাছে জীবন তুচ্ছ হয়ে যায়। এ কেউ কোন দিন ভুলতে পারে না!

চুপি-চুপি, মনে মনে গাইলুম:—

ভুলতে সে কি পারি
—ভুলিয়েছ মোর প্রাণ?

(দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত)

—ক্রমশ

কল্লোল

[শ্রীসুনীতি দেবী]

—:০:—

কল্লোলিয়া উঠ্‌ল ধ্বনি বাঙ্‌লা দেশের বুকে,
মাঠে ঘাটে হাটে বাটে পড়ে গেল সাড়া,
"প্রাণের তোড়ে ভাঙ্‌রে জোরে রুদ্ধ পাষাণ কারা
বন্দী ওরে হতভাগা! কাঁদিস্ নে আর দুখে।"—

বাঙ্‌লা দেশের ঘরে ঘরে জাগ্‌ল তরুণ প্রাণ;
জমাট করা অন্ধকারের বিশাল প্রাচীর টুটে
উৎসারিত আলোর পানে বেরিয়ে এল ছুটে -
চক্ষে তাদের নবীন দীপ্তি, কণ্ঠে নূতন গান।

দেশের দুখে, দশের দুখে কাঁদে পাগল যারা,
অশ্রু তাদের ফুঁপিয়ে উঠে—উতল কলরোলে,
পরের সুখে সুখী জনের হাসির হিল্লোলে
মিশল গিয়ে, করল সৃষ্টি নদী বাঁধন-হারা।

কল্লোলেতে আছ্‌ড়ে নদী শিলার উপর পড়ে,
ঢেউয়ের আঘাত খেয়ে যদি পাষাণখানি নড়ে।

রমঁ্যা রলাঁ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রভাত

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তাদেবী কর্ত্তৃক অনূদিত]

তিন বছর কাটিয়া গেল।

ক্রিস্তফ্ এগারো বছরে পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গীতের সাধনা রীতিমত চলিতেছে। বৃদ্ধ জঁ্যা মিশেলের বন্ধু বিখ্যাত ওস্তাদ ফ্লোরিয়ান হোল্‌জার তাহাকে নূতনভাবে স্বর-সন্ধির নিয়মগুলি শিখাইতেছেন। প্রথমেই তিনি কড়া রকম উপদেশ দিয়া বুঝাইলেন যে, ছেলেবেলায় যে সমস্ত তান আলাপ ইত্যাদি ক্রিস্তফের কান ও প্রাণ যুগপৎ মুগ্ধ করিত সেগুলা অতি কুৎসিৎ এবং বিষবৎ বর্জ্জনীয়।

ক্রিস্তফ্ প্রতিবাদের সুরে প্রশ্ন করিল, কিন্তু শিক্ষক কোন জবাব দেওয়াই দরকার বোধ করিলেন না।—শুধু বলিলেন, যা খারাপ তা খারাপ।—ওগুলো নিয়মবিরুদ্ধ, বাস্।

শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ক্রিস্তফের প্রকৃতিগত, সুতরাং খারাপগুলাকেই সে আরও বেশী করিয়াই ভালবাসিতে লাগিল। যখনই কোন বড় ওস্তাদের রচনায় সেই সব নিষিদ্ধ তান-আলাপের আভাষ মাত্র পাইত, সে মহানন্দে তার শিক্ষক অথবা তাহার দাদামহাশয়ের চোখের সম্মুখে ধরিত।

দাদামশায় বলিতেন, বড় ওস্তাদের সবই শোভা পায় বেটোফেন্ (Beethoven), বাখ্ (Bach) সুর লইয়া যা'কিছু করিতে পারেন।

কিন্তু মাষ্টার মশায় এ বিষয়ে ক্রিস্তফের সঙ্গে এতটুকু মিটমাট করিলেন না, চটিয়া বলিলেন, তোর এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বড় ওস্তাদরা আরও কত বড় জিনিষ রচনা করেছেন সেইগুলো আগে শেখ্, তারপর সর্দ্দারি করিস্।

ক্রিস্তফ্ আজকাল কন্‌সার্টে থিয়েটারে সর্ব্বত্র বিনা মূল্যে প্রবেশাধিকার পায়। সে প্রায় সব রকম যন্ত্রই একটু আধটু ছুঁইতে শিখিয়াছে। এমন কি বেহালায় তার যে বেশ জোর-হাত হইবে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। তার পিতা মেল্‌শিয়র ভাবিল, ছেলেটাকে যন্ত্র-সঙ্গতে একবার লাগিয়ে দেখা যাক্ না!

ক্রিস্তফ্ এমন আশ্চর্য্যরকমে উৎরাইয়া গেল যে, কয়েক মাস শিক্ষা-নবীশের পরই সে দ্বিতীয় বেহালাদারের পদটা পাকা রকম অধিকার করিয়া বসিল। এইভাবে অল্প বয়সেই ক্রিস্তফ্ উপার্জ্জন করিতে সুরু করিল। তাদের সংসারের দিক হইতে দেখিলে এই উপার্জ্জনটা মোটেই তাড়াতাড়ি আসে নাই, কারণ বাড়ির অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন্ হইয়া আসিতেছিল। তাহার বাবার মাতলামি বাড়িতেই ছিল এবং তাহার দাদামশায় ক্রমশ অথর্ব্ব হইয়া পড়িতেছিলেন।

এই শোচনীয় অবস্থাটা ক্রিস্তফ্ ছেলেমানুষ হইলেও বেশ বুঝিয়াছিল। তাহার বয়সেই সে যেন সাবালকের মত গম্ভীর ও উদ্বেগপূর্ণ।

সন্ধ্যায় যন্ত্র-সঙ্গতে শ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় ঘুমে

তাহার চোখ জড়াইয়া আসে। সঙ্গীতের কোন আনন্দই সে পায় না, তবু সে বীরের মত তাহার কর্ত্তব্য করিয়া যায়। থিয়েটারেও সেকালের মত তাহার কোন ভাবোদ্রেক হয় না। চার বৎসর আগে যখন সে ছোট ছিল তখন আজকার এই পদবীটা লাভ করাই ছিল তাহার সব চেয়ে বড় আশা। কিন্তু আজ যাহা কিছু তাহাকে বাজাইতে দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে সে এতটুকু স্বাদ পায় না। এখনও সেগুলিকে অবশ্য সে বিচার করিতে পারে না কিন্তু মনে মনে অনুভব করে যে, সেগুলো একেবারে বাজে জিনিষ হঠাৎ যদি কখনও একটা ভাল জিনিষ বাজান হয়, সেটা এমন আয়েসী রকমে লোকে বাজায় যে, ক্রিস্তফ্ চটিয়া অস্থির হয়—যেমন সব যন্ত্রী, তেমনি আলাপ! পটক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের উপর ছড়ি আঁচড়ানো বা গাল ফোলানো যেমনি বন্ধ হইল, অমনি যেন ঘণ্টাখানেকের কুস্তি কসরৎ শেষ করিয়া যন্ত্রীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল! তখনই মুখ মুছিয়া বেশ সদানন্দভাবে নিজের নিজের যত তুচ্ছ "কেচ্ছাকাহিনী" বকিয়া যাইতে শুরু করিল।

তাহার রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রিয়তমা যে গায়িকাটি শুধু পায়ে স্টেজে আসিয়া তাহাকে এক সময়ে মোহিত করিয়াছিল, তাহাকে ক্রিস্তফ এখন প্রায়ই দেখে, কখনও পটক্ষেপের মাঝে কখনও হোটেলে; কিন্তু ক্রিস্তফ্ আর এতটুকুও খুশী হয় না। সে যে একসময় প্রেমে পড়িয়াছিল সেটা গায়িকাটির কাছে অজ্ঞাত ছিল না এবং সে ক্রিস্তফ্কে মধ্যে মধ্যে বেশ একটু সোহাগ দেখাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহার মোটা মোটা কদর্য্য হাত, তাহার রং পাউডারের গন্ধ, তাহার লোভ সব মিলিয়া এমন একটা বিতৃষ্ণা জাগাইয়াছিল যে, ক্রিস্তফ্ ঘৃণায় আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক তাঁহার তরুণ যন্ত্রীটিকে ভোলেন নাই। তাহার যে সামান্ত মাসহারা তিনি বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন, সেটা অবশ্য নিয়মমত পাওয়া যাইত না। প্রায় প্রতিমাসেই চাহিয়া আদায় করিতে হইত কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রাসাদে ডাক পড়িত; মহানুভব ডিউকের যখন খেয়াল হইত, তিনি একটু বাজনা শুনিবেন অথবা তাঁহার কোন গণ্যমান্ত অতিথিকে শুনাইবেন তখনই ক্রিস্তফের তলব হইত। বেচারা যে সময়টা সব চেয়ে একা থাকিতে চায়, সেই সন্ধ্যাবেলাটাই সব ফেলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে হাজিরি দিতে হইত। হয় ত মহাত্মাদের সান্ধ্যভোজ তখনও শেষ হয় নাই, ক্রিস্তফ্ একটা কোণের ঘরে বসিয়াই আছে। চাকর বাকর সর্ব্বদাই তাহাকে দেখিতে অভ্যস্ত, সুতরাং বেশ একটু গায়ে-পড়া ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিত। ক্রমশ তাহাকে বড় ঘরে ডাকা হয়, আয়নায়, আলোয় ঘরটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, ভোগতৃপ্ত হৃষ্টপুষ্ট মানুষগুলার নিষ্ঠুর ঔৎসুক্যভরা দৃষ্টি ক্রিস্তফ্কে যেন বিদ্ধ করে। মোম পালিশ মেজের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে হাটিয়া ডিউকের হস্ত চুম্বন করিতে হয়। যতই বয়স বাড়ে ততই সে অস্বস্তি বোধ করে—মনে হয় সে যেন একটি সং! তাহার আত্মমর্য্যাদায় দারুণ আঘাত লাগে।

যাহা হউক পিয়ানোতে বসিয়া সেই সব নির্ব্বোধ আনাড়িগুলার জন্ম বাজাইতে হয়। বাজনার মধ্যেই চারিদিকের ঔদাসিন্য তাহাকে এমন পীড়া দেয় যে, সময় সময় তাহার ইচ্ছা করে যে, বাজনাটা থামাইয়া দেয়—তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসে যেন সে শূন্তে তলাইয়া যাইতেছে; কিন্তু কোন রকমে বাজনাটা শেষ করিলে সে দেখে সকলেই যেন তাহাকে তারিফ্ করিতে উদ্‌গ্রীব। তাহার সঙ্গে পরিচয় করিতে ব্যস্ত; প্রশংসার চোটে তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিবার জোগাড় করে। ক্রিস্তফের মনে হয়, লোকে ভাবিতেছে সে যেন একটা অদ্ভুত জানোয়ার—ডিউকের চিড়িয়াখানা অলঙ্কৃত করিয়া আছে; সুতরাং প্রশংসাগুলা তাহার জন্ম ততটা নহে যতটা তাহার প্রভুর জন্ম। সে নিজেকে অপদস্থ বোধ করে, তাহার আত্মনির্ব্বেদ একটা রুগ্ন তীব্রতায় তাহাকে বেশী করিয়া অস্থির করে, কারণ তাহা সে প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষের সাদাসিদা ব্যবহারেও সে আঘাত পায়। ঘরের মধ্যে যদি কেহ হাসে, সে ভাবে সেটা যেন তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া! সে ভাবিয়া অস্থির হয়, কি দেখিয়া লোকে হাসিতেছে—তাহার চালচলন, তাহার পোষাক, তাহার চেহারা, তাহার হাত পা, কি লইয়া এই বিদ্রূপ? সব তাতেই সে অপমান বোধ করে। তাহার সহিত কথা বলিলেও অপমান, না বলিলেও অপমান!

তাহার হাতে মিষ্টান্ন দিলে সে ভাবে যেন তাহাকে লোকে ছেলেমানুষ ভাবিতেছে। বিশেষভাবে সে অপমান বোধ করে, যখন ডিউক বাদশাজনোচিত অমায়িকতায় তাহার হাতে একটি স্বর্ণ মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দেন। সে দরিদ্র বলিয়া কষ্ট পায় লোকে তাহাকে দরিদ্রের মত অনুগ্রহ করে তাহাতে আরও কষ্ট পায়।

একদিন রাত্রে বকৃশিশের টাকাটা তাহাকে যেন কামড়াইতে লাগিল। বাড়ি ফিরিবার পথে অসহ্য যাতনায় সে টাকাটা ছুঁড়িয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই টাকাটি ফেরৎ পাইবার জন্য যে কোন রকম অপমানও সহ্য করিতে সে যেন প্রস্তুত, কারণ মনে পড়িয়া গেছে, মাংসের দাম অনেক মাস বাকি পড়িয়া আছে।

তাহার আত্মমর্য্যাদায় যে সমস্ত আঘাত সে নীরবে সহ্য করিতেছিল, বাড়ির লোকেরা তাহার কোন খবরই রাখিত না। ডিউকের অনুগ্রহের কথা ভাবিয়াই তাহারা মুগ্ধ। প্রাসাদে গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটানো তাহার ছেলের পক্ষে কত বড় গৌরব ভাবিয়া মা লুইসা ত উৎফুল্ল। তাহার বাবা মেল্‌শিয়র তাহার বন্ধুমহলে দিনরাত ইহা গাবাইয়া বেড়ায় কিন্তু সব চেয়ে সুখী বোধ হয় তাহার দাদা মশাই। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই দেখাইত যেন সে বেজায় স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ, যেন সে বড়লোকদের উপেক্ষা করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে টাকা, মান, এবং সামাজিক আভিজাত্যের প্রতি তাহার বেশ একটা সরল রকম শ্রদ্ধা ছিল। ঐ সব বিষয়ে যাহারা ভাগ্যবান তাদের দলে যে তার নাতিটি মিশিতে পায় ইহাতে বৃদ্ধের গর্ব্ব আর ধরে না। এই গৌরবে সে এতটা আনন্দ বোধ করিত যেন সেটা তারই গৌরব এবং বাহিরে সে যতই শান্ত ও উদাসীন ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিত, তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। যে রাত্রেই ক্রিস্তফ্ প্রাসাদে যাইত বৃদ্ধ নানা ছুতানাতা করিয়া সে দিন সেখানকার কথা তুলিতে চেষ্টা করিত। শিশুসুলভ অধীরতায় সে প্রতীক্ষা করিত, কখন নাতিটি ফিরিয়া আসে এবং ফিরিলেই যেন অন্যমনস্কভাবে দুচারটা বাজে প্রশ্ন করিয়া ক্রিস্তফ্‌কে কথা বলাইতে চেষ্টা করিত, কি রে আজ কেমন হল?

কখনও বৃদ্ধ স্নেহভরে ক্রিস্তফ্‌কে ঘাঁটাইয়া কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিত—এই যে আমাদের বাচ্চাটা এসেছে; আজকে দুচারটে নতুন গল্প শোনা যাবে, কেমন?

কোন দিন আবার বৃদ্ধ ক্রিস্তফ্‌কে তোষামোদে একটু ঠাণ্ডা করিবার জন্য বেশ দুচারটি সুচিন্তিত প্রশংসাবাদ শোনায়।

এই যে মহাশয় ব্যক্তি—সেলাম্।

এই সব প্রশ্নের জবাবে ক্রিস্তফ্ বিরক্ত হইয়া অতি শুষ্কভাবে, 'শুভরাত্রি' বলিয়া একটা কোণে গুম হইয়া বসে। বৃদ্ধ একটু জেদ্ করিয়া দুচারটি প্রশ্নের জবাব চায়, ছেলেটি কিন্তু 'হাঁ না' বলিয়াই সারিয়া দেয়। অন্য বাড়ির লোকেরা বৃদ্ধের দলে যোগ দিয়া সব খবর সবিস্তার শুনিতে চায়; ক্রিস্তফ্ ক্রমশ গজরাইতে থাকে। বহুকষ্টে দুই চারিটা কথা বাহির হয়, শেষে জাঁ মিশেল চটিয়া কড়া কড়া কথা শুনায় এবং ক্রিস্তফ্‌ও বিশেষ মান্য করিয়া জবাব দেয় না এই ভাবে একটা কুৎসিৎ রাগারাগিতে সব শেষ হয়। ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ বাহির হইয়া যায় এবং ক্রিস্তফ্ সে বেচারাদের সমস্ত আনন্দই মাটি করিয়া দেয়; তাহারা বোঝেই না, কেন তাহার এই বদ মেজাজ। তাদের মনে যে দাসভাবটা কায়েমী হইয়া বসিয়া আছে সেটার জন্য তাহারা ত দোষী নয়! অন্য কোন রকমের ভাব যে হইতে পারে তাহা তাহাদের কল্পনায়ও আসে না।

সুতরাং তাহার পরিবারের লোকদের ঠিক বিচার করিতে না বসিলেও ক্রিস্তফ্ অনুভব করিল যে, তাহাদের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান আছে। ক্রিস্তফ্ নিজের মধ্যেই আশ্রয় লইল। বলাবাহুল্য যে, ব্যবধানটাকে সে একটু বেশী মাত্রায় বাড়াইয়া ভাবিতে ছিল; কারণ একটু আপনার ভাবিয়া কথা বলিতে পারিলেই হয় ত তাদের ভাবের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা ক্রিস্তফ্‌কে বুঝিত কিন্তু সকলেই জানে যে, বড়দের সঙ্গে যে বাড়ির ছেলেদের ভালবাসার সম্বন্ধ তা যতই নিবিড় হোক স্পষ্ট কথার সম্বন্ধ ভীষণ কঠিন। একদিকে সম্মান দেখাইতে হয় বলিয়া বিশ্রম্ভালাপ জমে না; অন্য দিকে বয়স, অভিজ্ঞতা ও গুরুত্বের উপর অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হয় বলিয়া ছোটদের চিন্তা ও ভাবকে ততটা

শ্রদ্ধা করা সম্ভব হয় না। অথচ ইহা জানা কথা যে, বড়দের মত ছোটদের ভাবগুলি আমাদের মনের উপর সমান দাবী রাখে; তার উপর ছোটদের ভাবে সারল্য গুণ সাধারণত বেশী।

যাহা হোক, ক্রিস্তফ্ তাহাদের বাড়িতে যে সব লোককে আসিতে দেখিত, তাহাদের যে সকল কথাবার্ত্তা শুনিত—সবটা মিলিয়া তাহার এবং তাহার পরিবারের মধ্যকার ব্যবধানটাই বাড়াইয়া তুলিতেছিল।

মেলশিয়রের যে সকল বন্ধু বাড়িতে আসিত তাহারা প্রায় সকলেই সঙ্গতের যন্ত্রী, অবিবাহিত এবং ভীষণ মাতাল। মানুষ তারা হয় ত খুব খারাপ নয়, কিন্তু যেন কদর্য্যতায় অসহ্য। তাদের হাসিতে, পদক্ষেপে যেন বাড়িটা কাঁপিতে থাকে। তারা সঙ্গীত ভালবাসে কিন্তু সে সম্বন্ধে এমন নির্ব্বোধের মত কথা বলে যে ক্রিস্তফের হাড় জ্বলিয়া যায়। এমন মোটা রকমে তাহারা তাদের উৎসাহ প্রকাশ করিত যে, ক্রিস্তফের স্বাধীনতায় তীব্র আঘাত লাগিত। সে যে রচনা ভালবাসে উহাদের মুখে তাহার প্রশংসা শুনিলে সে যেন অপমান বোধ করে। সে আড়ষ্ট হইয়া যেন জমিয়া যায়। এমন ভাব দেখায় যেন সঙ্গীতে তাহার কোন উৎসাহই নাই, যেন পারিলে সে ঘৃণাভরে সঙ্গীতকে ছাড়িয়া দিতে পারে। মেলশিয়র তার সম্বন্ধে বলিত, ছেলেটার হৃদয় বলে পদার্থ নেই, সে কিছু অনুভবই করে না। কোথা থেকে এ অসাড়তা পেল, ভেবেই পাই না।

সময় সময় তাহারা সকলে মিলিয়া জার্ম্মান চৌপদী গান চার অংশে ভাগ করিয়া গাহিত। ক্রিস্তফের কাছে এই সুরগুলা এমন গম্ভীর, মোটা, মাটো এবং একঘেয়ে লাগিত যে, সে কোথা একটা কোণের ঘরে আশ্রয় লইয়া মনে মনে সকলকে অভিশাপ দিত।

তার দাদামশায়েরও সব বন্ধু জুটিত। কেউ অর্গ্যান বা অন্য কোন যন্ত্র বাজায়, কেউ আসবাবপত্র বিক্রয় করে। কেউ ঘড়িওয়ালা—যত বুড়ো গপ্পে-লোক প্রতিদিন ঐ একই আলোচনা, আর্ট, রাজনীতি, পাড়ার লোকদের কুলজি—তার আর শেষ নাই! যে বিষয়ে কথা হইতেছে, সে বিষয়ে উৎসাহের ত ঘুম নাই শুধু বকিয়া যাওয়া আর একদল শ্রোতা পাওয়াতেই সকলে খুশী!

লুইসা মধ্যে মধ্যে তার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিত। তার কাছে বিশ্বের গুজোব আসিয়া হাজির হইত এবং তাহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দু একটি দয়াশীলা মহিলা আসিয় লুইসার সম্বন্ধে দরদ দেখাইতেন এবং সেই মহিলার তাঁদের বাড়ির নিমন্ত্রণাদিতে কাজে সাহায্য করিবার জন্য লুইসাকে ডাকিতেন। লুইসার ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষার ভারটাও তাঁহারা লইয়াছেন এমন ভাব দেখাইতেন।

কিন্তু এই সব নানান রকমের জীব যারা তাহাদের বাড়িতে দেখা করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে ক্রিস্তফ্ সব চেয়ে ঘৃণা করিত তাহার থিওডোর কাকাকে। জাঁ মিশেলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ক্লেরার প্রথম পক্ষের সন্তান, নাম তার থিওডোর। সে একটা বড় ব্যবসার অংশীদার এবং আফ্রিকা ও এসিয়াতে ছিল তার কারবার। থিওডোর একেবারে হাল-ফ্যাসানের জার্ম্মান জার্ম্মান জাতির কাল-ক্রমাগত আদর্শবাদকে বিদ্রূপের সঙ্গে বর্জ্জন করাই যেন এদের মস্ত একটা কেরামতি। জয়ের নেশায় এরা উন্মত্ত। শক্তি এবং সাফল্যের উপর তাহারা যেন একটি নূতন ধর্ম্ম গড়িতে চায় এবং সেই সঙ্গেই প্রকাশ করিয়া ফেলে যে, ঐ দুইটা জিনিষ উপভোগ করিতে তারা বড় অভ্যস্ত নয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব হঠাৎ একদিনে বদলানো যায় না, যে প্রাচীন আদর্শকে তাহারা নূতন করিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, সেই আদর্শই তাদের ভাষায়, আচারে, নৈতিক অভ্যাসাদিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ছোট খাটো সাংসারিক ঘটনার সার্থকতা বুঝাইতে গোয়েটের উক্তি উদ্ধৃত না করিলে চলে না। এই নব্য জার্ম্মান-দল বিবেক এবং স্বার্থের এক অপূর্ব্ব জগা-খিঁচুড়ি। প্রাচীন জার্ম্মান মধ্যবিত্ত দলের সততা এবং নূতন ব্যবসাদারী গুণ্ডামীর বিশ্বাসহীনতা এই দুয়ে মিলিয়া কেমন একটা অসহ্য ভণ্ডামির গন্ধ এই নব্য দলের চারিদিকে পাওয়া যায়। ইহারা শক্তি, লোভ এবং স্বার্থকে ধর্ম্ম, ন্যায় এবং সত্যের প্রতীকরূপে ভেজাল দিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত।

এই সমস্ত কারণে ক্রিস্তফের সহজ সরলতায় বিষম

আঘাত লাগিত। তার কাকাটির আচরণ সত্য কি মিথ্যা তাহা সে বিচার করিতে পারিত না বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষে মন ভরিয়া উঠিত। সে অনুভব করিত যে, কাকাটি তার এক শত্রু। তার দাদামশাইও এই কাকাটিকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না এবং তার মতামতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেন কিন্তু থিওডোরের প্রবল বক্তৃতার তোড়ে বুড়ের সব যুক্তি তর্ক কোথায় উড়িয়া যাইত।

বৃদ্ধের সেই উদার সারল্যকে সে অতি সহজেই বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করিত সুতরাং মিশেল তার সরলতা সম্বন্ধে যেন লজ্জা বোধ করিত এবং আধুনিক চিন্তায় সে যে ততটা পিছাইয়া নাই ইহা দেখাইবার জন্ত সে থিওডোরের মত কথা বলিতে চেষ্টা করিত কিন্তু সেই সব কথা তাহার মুখে বেসুরো লাগিত। এবং বৃদ্ধ কেমন অস্বস্তি বোধ করিত। থিওডোর সম্বন্ধে তাহার ধারণা যাহাই হোক্, তাহার প্রভাব খানিকটা বৃদ্ধ এড়াইতে পারিত না। কাজকে সফল করিবার কসরৎ তাহার আদৌ ছিল না বলিয়া বৃদ্ধ ঐ গুণটির জন্ত থিওডোরকে তারিফ করিত। তার একজন নাতিকে থিওডোরের মত গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিত এবং সেই খানে মেলশিয়রও তাহার পিতার সহিত একমত হইয়া ক্রিস্তফের ছোট ভাই রডল্‌ফ্‌কে থিওডোরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দিত।

থিওডোর ধনী—সে হয় ত অনেক সাহায্য করিতে পারে, সেই আশায় সমস্ত ক্রাফট্‌-পরিবার নানা উপায়ে তার তোষা-মোদ করিয়া চলিত এবং থিওডোরও সেই সুযোগে বেশ একটু কর্তৃত্ব করিয়া লইত; সব বিষয়েই সে উপদেশ দিতে আসে এবং বেচারাদের ঘাঁটায়; শিল্প ও শিল্পীদের সম্বন্ধে তার যে অসীম অবজ্ঞা আছে সেটা বুঝাইয়া দিবার কোন সুযোগই সে ছাড়িত না; সঙ্গীতের উপাসক তার এই আত্মীয়দের অপদস্ত করিবার জন্ত সে নির্বোধের মত নানা বিদ্রূপ করিত, শুধু অপমান করিবার জন্তই করিত— অথচ সেই ভীরুর দল কথাগুলা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিত না!

থিওডোর বিশেষ ভাবে ক্রিস্তফ্‌কেই লক্ষ্য করিয়া তার বিদ্রূপ বাণ সন্ধান করিত; ক্রিস্তফ্ ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনিয়া যাইত না; সে কথা বলিত না বটে কিন্তু রাগে দাঁতে দাঁত ঘসিত; তার এই ক্রোধের নির্ব্বাক আস্ফালনটা কাকা বেশ উপভোগ করিত; কিন্তু একদিন থিয়ডোর ক্রিস্তফ্‌কে অসম্ভব রকম চটাইলে সে রাগে আত্মহারা হইয়া কাকার মুখে থুতু দিল। এই ভীষণ অপমানে থিয়ডোর প্রথম খানিকটা স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে মুখ ছুটিতে গালাগালের চোটে ক্রিস্তফ্ উড়িয়া যায় আর কি! সে তার সেই অসম্ভব কাজের ফলে পাথরের মত কিছুক্ষণ চেয়ারে বসিয়া রহিল; কীল চড়ের বর্ষণ যেন তার হুঁসের মধ্যেই আসিতে-ছিল না। কিন্তু যখন সকলে তাকে কাকার সামনে হাঁটু গাড়িয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ক্রিস্তফ্ সকলকে ধাক্কা দিয়া মাকে ঠেলিয়া বাড়ীর বাহিরে পলাইয়া গেল। ছুটিয়া বে-দম না হওয়া পর্য্যন্ত সে থামিল না—শেষে মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস নিল। তার কানে যেন কত রকমের আওয়াজ হইতেছে! তার শত্রুকে সে চুবাইয়া মারিতে না পারার ক্ষোভে সে নিজে নদীতে ঝাঁপ দিয়া মরিতে চাহিল। সারারাত সে খোলা মাঠে পড়িয়া কাটাইল। ভোরে সে দাদামশাই-এর দরজায় ধাক্কা দিল। তার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে বৃদ্ধ এমনই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল যে, সারারাত ঘুমায় নাই; সুতরাং এখন আর ধম্‌কাইতে পারিল না। বৃদ্ধ নিজে ক্রিস্তফ্‌কে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিল। কেহ কোন কথা তাহাকে বলিল না, কারণ সকলে দেখিল, ক্রিস্তফ্ বিষম বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। সেই রাত্রে আবার প্রাসাদে বাজাইবার ডাক আছে, সুতরাং সকলে তাকে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মেলশিয়র তাকে বিশেষভাবে কিছু না বলিলেও, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার নৈতিক আর্ত্তনাদের চোটে ক্রিস্তফ্‌কে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, এত কাল ধরিয়া ভদ্রতা ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শ জীবন দিয়া দেখান হইল যাকে সেই অকৃতজ্ঞ কি জঘন্য ব্যবহার দেখাইয়া সকলের মাথা হেঁট করিল! রাস্তায় থিয়ডোরের সঙ্গে ক্রিস্তফের দেখা হইলে কাকা অসীম ঘৃণায় নাক তুলিয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়।

বাড়ীতে সহানুভূতির ত অন্ত নাই, সুতরাং ক্রিস্তফ্ যতটা সম্ভব সময় বাহিরে কাটাইত, সকলে যেন তাকে

চিরদিন শাসনে রাখিতে চায়। ইহা তাকে বিষম কষ্ট দেয়; কুত জিনিষ কত মানুষকে যে মান্য করিবার হুকুম আসে! তর্ক করা বারণ, মান্য করাটা ক্রিস্তফের বড় স্বভাবের মধ্যে ছিল না। যতই চেষ্টা করা হইত শান্তশিষ্ট জার্ম্মান মধ্যবিত্তের ছাঁচে তাকে ঢালা ততই ক্রিস্তফ্ বেয়াড়া হইয়া মুক্তি চাহিত। যন্ত্র-সঙ্গতে অথবা প্রাসাদে বাজাইবার বিষম শ্রান্তিকর একঘেয়েমীর পর তার ইচ্ছা করিত, সে তার নূতন পোষাকসুদ্ধ ঘাসে ঢাকা ঢালু মাটীর উপর টাট্টুঘোড়ার মত গড়াগড়ি দেয় অথবা পাড়ার ডাঙপিটে ছেলেগুলোর সঙ্গে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। ইহা হইতে সে যে নিরস্ত হইত সেটা মার বা বকুনির ভয়ে নয়; তার খেলার সঙ্গী বেশী ছিল না বলিয়া। সে কেমন যেন ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পারিত না। এমন কি নর্দ্দামা-ঘাঁটা ছোঁড়াগুলোও তার সঙ্গে খেলিতে চাহিত না, কারণ ক্রিস্তফ্ খেলাটাকেও বেজায় গম্ভীরভাবে নিত, ভীষণ জোরে জোরে মারিত! সে তাহার বয়সের ছেলেদের হইতে ক্রমশ তফাৎ হইয়া নিজের মধ্যেও নিজের সঙ্গী খুঁজিতেছিল, খেলায় সে বিশেষ দক্ষ নয় বলিয়া সে লজ্জা পাইত এবং সহজে খেলায় যোগ দিত না। খেলিবার খুব আগ্রহ থাকিলেও সে যেন খেলিতে ভালবাসে না, এই ভাবটা দেখাইত। ছেলেরা তাহাকে ডাকিত না, তাহাতে সে মনে আঘাত পাইত কিন্তু বাহিরে ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইত।

ক্রিস্তফের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল গডফ্রিড মামার (কাছে থাকিলে) সঙ্গে টো-টো করিয়া ঘোরা। সে ক্রমশ মামার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিল, তাহার স্বাধীন রকমের খামখেয়ালীতে ক্রিস্তফের আজকাল পূর্ণ সহানুভূতি; সে বুঝিতে সুরু করিল, কি আনন্দের টানে মামা কেবলই পথ বাহিয়া চলে, কোন একটা জায়গায় আটকাইয়া পড়িতে চায় না। প্রায়ই দুজনে সন্ধ্যায় গাঁয়ের পথ ধরিয়া সোজা যে দিকে চোখ যায় হাটিতে থাকে; মামার ত দেশ-কালের হুঁশ নেই, সুতরাং বাড়ী ফিরিতে খুব দেরি হইয়া যায়, এবং বকুনী খাইতে হয়। কিন্তু যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তখন সেই গভীর রাত্রে সরিয়া পড়ায় কি আনন্দ! মামা জানিত যে, এ কাজটা ঠিক হইতেছে না কিন্তু ক্রিস্তফের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং নিজের লোভটাও কাটান শক্ত। মাঝ রাতে মামা ক্রিস্তফের ঘরের সামনে আসিয়া সাঙ্কেতিক শিষ্ দিলেই ক্রিস্তফ্ বিছানা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে জুতা হাতে করিয়া বাহিরে আসিত—সে কাপড় চোপড় পরিয়াই শুইত সুতরাং দেরী হইত না। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বুনো লোকের সতর্কতার সঙ্গে রাস্তার উপর রান্নাঘরের জানালার কাছে হাজির হইত। ক্রিস্তফ্ টেবিলের উপর দাঁড়াইত এবং জানালার অন্তদিক হইতে গডফ্রিড মামা তাকে কাঁধে লইত। এই-ভাবে স্কুল-পালান ছেলের মত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দুইজনে সরিয়া পড়িত।

কখনো তারা গডফ্রিডের জেলে-বন্ধু জেরেমীকে খুঁজিয়া বাহির করিত এবং তিন জনে নৌকা চাপিয়া জ্যোৎস্নায় বাহির হইত। দাঁড় হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া যেন কত রঙদার স্বরগ্রাম (chrometic scales) মীড় ও কম্পনের (arpeggios) রেশ জাগাইয়া তুলিত। জলের বুকে শাদা বাষ্পের ওড়নাখানি কাঁপিতে থাকে; তারায় তারায় ইসারা চলে; নদীর এপারে ওপারে মোরগের ডাক প্রতিধ্বনিত হয়! কখনও আবার লার্ক পাখী জ্যোৎস্নায় দিন ভুল করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মাটির বাসা ছাড়িয়া উঠে। তিন্ জনে মৌন নির্ব্বাক! গডফ্রিড অতি ধীরে ধীরে দু একটি সুর ভাঁজে, কখন বা জেরেমী জন্তু-জগতের অদ্ভুত গল্প শোনায়। তার গল্প বলার ভঙ্গীও অদ্ভুত—অতি সংক্ষেপে দুচার কথা বলিয়া রহস্যটা নিবিড় করিয়া তোলে। চাঁদ বনের পাশে লুকায়, তীরের পাহাড়ের জমাট অন্ধকার বাহিয়া তাহারা চলে, জলের কালোয় আকাশের কালো যেন মিশিয়া যায়। নদী একেবারে নিস্তরঙ্গ, চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। যেন রাত্রি-সাগর ভেদ করিয়া তরীখানি কোথায় চলিতেছে—চলিতেছে কি ভাসিতেছে, কি স্থির হইয়া আছে—কিছুই বোঝা যায় না। জোলো ঘাসের ঝাড় ফাঁক হইতে খস্ খস্ শব্দ করিতেছে—যেন কাহার বস্ত্রের ঘর্ষণ; নিঃশব্দে তিনটি মানুষ তীরে পৌছায়, চড়ায় নামিয়া পদব্রজে বাড়ী ফিরে, ফিরিতে প্রায় ভোর হইয়া যায়; নদীর পাড় বাহিয়া ফিরিতে ফিরিতে শস্যের কচি শীষের মত সবুজ বা নীলকান্ত মণির মত নীল রঙের কত মাছ প্রথম আলোয় উকিঝুঁকি

মারে। রুটির টুকরা ছুঁড়িলে মেডিউসা রাক্ষসীর মাথার সাপগুলোর মত মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিয়া আসে—রুটি ধরিতে কত রকম ঘোরা-ফেরার কসরত দেখাইয়া হঠাৎ আলোক শিখার মত চকিতে মিলাইয়া যায়! নদীর জলে গোলাপী ও বেগুনী রঙের আভা লাগে; পাখীরা একে একে জাগিয়া ওঠে! নিশাচর বন্ধু তিনটি যেমন সাবধানে বাহির হইয়াছিল তেমনি সাবধানে ফিরে; সেই বন্ধ-হাওয়া ঘরের মধ্যে ক্রিস্তফ্ সারাদেহে মাঠের সুবাস মাখিয়া ঢোকে এবং শ্রান্তি বশে এক নিমিষে ঘুমাইয়া পড়ে।

এমনি করিয়া মধ্যে মধ্যে রাতগুলো বেশ আনন্দে কাটিত, হঠাৎ ক্রিসতফের ছোট ভাই আর্নেষ্ট এই নিশা-প্রয়াণ রহস্যটি প্রকাশ করিয়া রটাইয়া দিল। সেই দিন হইতে ক্রিস্তফ্ নজর-বন্দী, তার বাইরে যাওয়া বারণ। কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে পালাইত; সেই ফেরিওয়ালা মামা ও তার বন্ধুদের সে যে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। সকলকে ছাড়িয়া ক্রিস্তফ্ ওদের পিছনে ছুটিত এবং তার বাড়ীর লোকে লজ্জায় বিব্রত হইত। বাবা মেলশিয়র বলিত, ছেলেটা কুলীর স্বভাব পেয়েছে! বৃদ্ধ মিশেল গডফ্রিডের প্রতি ক্রিস্তফের টান দেখিয়া ঈর্ষায় তাকে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত "ডিউকের অনুচর হয়ে এত গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে মেশবার সৌভাগ্য যার, সে কি না ঐ যত ছোটলোকের সঙ্গে মিশে সকলের মাথা হেঁট করে। এই ভাবে সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে ক্রিস্তফের আত্মমর্য্যাদার বালাই নাই।

ক্রমশ

রুষসাহিত্য ও তরুণ বাঙালী

[শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়]

বিশ্বামিত্রের স্বর্গ-সৃষ্টি

বিশ্ব-মানবতা কথাটা হয় ত আজ নূতন ভাবে বিংশ-শতাব্দীর দ্বারে এসে ঘা দিচ্ছে কিন্তু বিশ্বের মানব এই কথাটিকে এখনও কাজে যে স্বীকার করতে পারে নি এ কথা আমরা সবাই জানি। বর্ত্তমান জগতের ভৌগলিক সত্বার দিকে চেয়ে হয় ত বলাও যেতে পারে যে, বিশ্ব-মানবতা স্বপ্ন-বিলাসীর স্বপ্ন-কথা মাত্র। কিন্তু আজ যিনি সত্যকারের দ্রষ্টা তিনি হয় ত দেখবেন যে রাজনৈতিক অথবা ভৌগলিক সীমাবন্ধনকে তুচ্ছ করে মানব-মনের একটী অভিনব গ্রহ-লোক সৃষ্ট হয়ে চলেছে। এই রক্ত-লোলুপ হিংস্র পৃথিবীর উপরে আর একটা পৃথিবী গড়ে উঠছে, সে মানব-বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের সাক্ষ্য বিংশ-শতাব্দীর সাহিত্যের দিকে চাইলেই এই দ্বিতীয় পৃথিবীর কথা মনে পড়ে। এই দ্বিতীয় পৃথিবীর অস্তিত্ব দূরবীণে যদি ধরা না পড়ে, একে মিথ্যা বলবার ক্ষমতা ও দুঃসাহস আমার নেই। আমার কাছে এই বাস্তব পৃথিবীর চেয়ে আমার কল্পলোকের দ্বিতীয় পৃথিবী কম বাস্তব নয়। আমার দ্বিতীয় পৃথিবীর আকাশে যে চন্দ্র সূর্য্য আলো দেয়, তার আলোর আঘাতে আমার মনে যূঁথী যাতি শতদল ফুটে ওঠে। ফোটার আমোদে আমার সমস্ত জগৎ ভরে যায়।

তরুণ বাংলা ও বিশ্ব

এই আমোদের নেশায় আমার বাঙালী মন ভরে ওঠে! মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের মাঝপথে দাঁড়িয়ে আমার বাংলার অন্তরলক্ষ্মী বলে, 'হে সন্তান, দূত পাঠাও! সিংহলে, কম্বোজে, জাভায়, চীনে তোমার পূর্ব্ব পুরুষরা আমার বাণীকে বহন করে নিয়ে গেছে আবার আমার শিউলী বনে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দূর সমুদ্রের জল কল্লোলকে! হে নব-যুগের দীপঙ্কর যাত্রা কর! বিশ্ব তোমার জন্ত মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছে তুমি অগ্রসর হয়ে তাকে বরণ করে নিয়ে এস।' আজ তরুণ বাঙালীর মনে এই আহ্বান উঠেছে। এখনও হয় ত এ আহ্বান খুব স্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে না—কিন্তু এ আহ্বানের তরঙ্গে তরুণ বাঙালীর দেহ-তট দুলে

উঠেছে। শিশুর যারা দেহে গতি যেমন ফুটে উঠতে চা'য়, আজ তরুণ বাঙালীর মনে তেমনি এই আহ্বান ফুটে উঠতে চাইছে। যে প্রাণের ধারা আজ তরুণ বাঙালীকে স্বপ্ন বিলাসী করে তুলেছে একদিন বিশ্বসভায় গৌরবের কর্ম্ম-যোগের টীকা সে-ই পরিয়ে দেবে। বাঙালীর মনের গতি যে দিন থাম্‌বে সে দিন বাঙালী নামান্তরিত হয়ে হয় ত অন্ত জাতি-সঙ্করে পরিণত হবে।

নূতন নাবিকের দল

একদিন কয়েক শতাব্দী আগে য়ুরোপ ও ভারতের যাতায়াতের পথ আবিষ্কার হলে পর—য়ুরোপের নাবিকরা ভারতের সোনার মন্দিরে তস্কর-য়ুরোপকে পৌছে দিয়ে গেল; আর আজ সেই পথ দিয়ে ভারত থেকে নূতন নাবিকের দল গেল ভারতের জ্ঞানের খনির সন্ধান নিয়ে। এবার সঙ্গে করে নিয়ে এল তস্কর য়ুরোপকে নয়, জ্ঞান-ভিক্ষু য়ুরোপকে—প্রমিথিয়ুসের আত্মাকে।

পশ্চিমের চিন্তার ধারা যখন বণিক্-ইংরেজের সঙ্গে বাংলায় এল, আমরা তখনকার ইতিহাসে জানি যে, তখনকার সৃষ্টি-প্রয়াসী যুবকগণ সে ধারাকে কি রকমভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রহণের মধ্যে আমার মনে হয় একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল, একটা সমর্পণের অযথা গৌরব ছিল। অবশ্য এর ব্যতিক্রম দু'এক যায়গায় খুব স্পষ্টভাবেই হয়েছিল। তবে তখন খৃষ্টান হওয়া সুশিক্ষার অঙ্গ-বিশেষ ছিল এবং ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নিষিদ্ধ মাংসের হাড় ফেলাতে একটা গৌরব বোধ ছিল। পশ্চিম ও পূর্ব্বের সংযোগের ইতিহাসে সে ছিল প্রথম পর্ব্ব। আজ পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু হয়েছে। প্রথম পর্ব্বের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্ব্বের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় পর্ব্বের মাইকেলকে আর অনুতাপ করতে হবে না যে, 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!'

য়ুরোপীয় সাহিত্য ও রাজনীতি

আজ বাঙালীর মনে য়ুরোপ সম্বন্ধে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নেই। তবে মনে হয়, একটা ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। আসল য়ুরোপ বলতে আমরা বুঝি রয়টারের টেলিগ্রাম। সেটা যদিও আপাতত: আসল য়ুরোপ বটে কিন্তু সেইটা কেই সবখানি ধরে নিলে আমরা রাগের মাথায় ঠকে যাব। রাজ-নৈতিক য়ুরোপ আজ সমস্ত জগতের কাছে যে ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে যদি তার ওপরে য়ুরোপের সাহিত্য না থাকত, তা হলে একশো বছর পরে য়ুরোপের ঐতিহাসিকই যখন আপনার দেশের বিবরণ সত্যভাবে লিখতে বসতেন—তখন তাঁর কলম মানবের হীনতা দেখে কেঁপে উঠত্। য়ুরোপের মুক্তি আজ তার সাহিত্যকে আশ্রয় করেছে। প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে নগর যখন শত্রুর আক্রমণের ফলে বিপদ্‌গ্রস্ত হ'ত তখন নগরের সবাই সেই নগরের প্রধান মন্দিরে আশ্রয় নিত। আজ মনে হয়, বীণাবাদিনী সাহিত্যের অন্তর-লক্ষ্মী তন্বী রাজনৈতিক য়ুরোপ হতে নির্ব্বাসিতা হয়ে তার সাহিত্যের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন, সে মন্দিরের দরজায় পর্য্যন্ত রাজনৈতিক য়ুরোপ হানা দিয়েছে কিন্তু মন্দির-রক্ষী পুরোহিতের দিকে চাই। তাঁরা বলেন—এই মন্দিরের সোপান আত্মাহুতিতে কঠিন হক্—হে য়ুরোপে আত্মা, আমাদের আত্মাই তো তুমি।" ভার্সেই-এর সভার আর চুক্তির উপরে যখন ভিলা অলগার দিকে চাই তখন তাই মনে পড়ে; বোলশেভিক রুষিয়ায় কলাভবনের ভগ্ন স্তূপের মধ্যে যখন গর্কীর গভীর বেদনামণ্ডিত মুখের দিকে চাই—তখন তাই মনে পড়ে। য়ুরোপের সাহিত্যের দিকে চাইলে এই কথা ভেবে খুব আনন্দ পাই যে য়ুরোপের মহা মহা-রাজনৈতিকগণ যখন হিসাবের কেতাব খুলে জাতীর সঙ্ঘ তৈরী করে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করবার একটা মিলিত শক্তি ও সম্মতি অর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত—তখন য়ুরোপের সাহিত্যে দেখি সেই বেড়া খোলবার মন্ত্র গাঁথা হচ্ছে। ইংলণ্ডের রাজ-পুরোহিত কিপলিং সাম্রাজ্যবাদের জয়গান করুন—কিন্তু তাঁর রাজতন্ত্রের যে কালি দিয়ে লেখা সে কালির কিন্তু একটা গুণ যে, সে কিছুদিন পরেই উবে যায়—শুধু কাগজই পড়ে থাকে।

রুষিয়া ও পূর্ব্বদেশ

আমার মনে হয়, তরুণ বাঙালীর মনকে বেশী করে আকর্ষণ করেছে রুষ-সাহিত্য। তার কারণ মনে হয় বড়োই

আছে। আমরা সবাই জানি যে রুষিয়ার অর্দ্ধেক পড়ে আছে এশিয়ার মধ্যে—আর অর্দ্ধ য়ুরোপের মধ্যে। আর এই আধখানা দেহের সঙ্গে তার আধখানা মনও এশিয়ার অধিবাসী। এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন যে, রুষ-জীবনের ধারার সঙ্গে প্রাচ্যের জীবনধারা ও রীতি নীতির যথেষ্ট মিল আছে; এমন কি তাঁরা বলেন যে,অন্তরের দিক দিয়ে রুষিয়ার প্রাচ্য-জগতেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। রুষিয়ার অন্তরবাসী কৃষাণের মনের সঙ্গে প্রাচ্যের অন্তরবাসী কৃষাণসমূহের মনের মিল আশ্চর্য্য রকম। আর আমাদের দেশে এবং রুষিয়ায় গ্রামবাসীদের সংখ্যাই বেশী। একশতাব্দী আগে রুষিয়া যেন য়ুরোপের কিছুই ছিল না। তার বিশাল ভূ-ভার নিয়ে সে আপনি আপনার প্রাচ্য-সুলভ রীতি-নীতির পন্থা বেয়ে চলেছিল; য়ুরোপের উত্থান পতনের সঙ্গে তার কোনও নাড়ীর যোগ ছিল না। য়ুরোপে যখন ডেমোক্র্যাসীর বিপুল আন্দোলন চলেছে তখন রুষিয়ায় জার ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতার নিদারুণ অপব্যবহার নিরঙ্কুশভাবে করে চলেছেন। রুষ সাহিত্য বাঙালী তরুণদের মনকে যে আকর্ষণ করেছে তার আর একটা কারণ এই যে, এই দুই জাতি সমানভাবে অনুরাগময়—সমানভাবে স্বপ্ন-বিলাসী। বাঙালীর জীবনের মূলে একটা গভীর অহেতুকী ভক্তি ও একটা অনুরাগময় উন্মাদনা আছে আর ঠিক সেই অহেতুকী ভক্তি ও রূপোন্মাদনার রস ও রূপ সে রুষ সাহিত্যে দেখতে পেয়েছে।

বিংশ শতাব্দী ও তরুণ বাঙালীর মন

মনে হয়, এই আকর্ষণের, আর একটা বিশিষ্ট কারণ আছে। বিংশ-শতাব্দীর তরুণ বাঙালীর মন আজ রূপকথার রাজপুত্রের মত সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হবার জন্যে দুর্ব্বার বেগে ছুটে চলেছে। কিন্তু হায়! তার দেহ আজ সহস্র যুগের বন্দীতে মাটীর সঙ্গে বাঁধা। আমার কাছে তরুণ বাঙালীর মনের এই অবস্থা একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডীর মত লাগে! একে উপহাস করতে লজ্জা বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর" কোনও বিক্ষিপ্ত খণ্ড কবিতা নয়—তরুণ বাঙালীর অসহায় মন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে সর্ব্বাগ্রের কবির বীণায় অপরূপ রূপ নিয়ে উঠেছে। তরুণ বাঙালীর মনে আজ অদূর ভবিষ্যৎ বাংলার একটা আবছায়া এসে পড়েছে; আর সেই আব-ছায়ায় দাঁড়িয়ে তার মন যেন সুদূর রুষিয়ায় তার সম্ভাব্যরূপ দেখছে। রুষ সাহিত্যে বাঙালী দেখেছে বেদনার সিন্ধু মন্থন করে জয়-মাল্য গলে মানবের অন্তরের বিজয় লক্ষ্মী উঠছে; বাঙালীর মন রুষ-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা এত বড় নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছে যে, সে আপনার অজ্ঞাতসারেই তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। আর এই স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে একটা অনুভূতি জেগেছে যে, এই বেদনার পথ দিয়েই বুঝি আমাদেরও যাত্রা-পথ।

রুষিয়া ও বাংলা-সাহিত্য

তরুণ বাঙালীর লেখায় এই অনুভূতির ছাপ এসে পড়েছে। কিন্তু মনে হয়, এই প্রভাব ভুল পথে চলেছে। আমাদের মন আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎকে উপেক্ষা করে অনেক দূর এগিয়ে চলেছে। আমাদের এই মনের গতির সঙ্গে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ কিন্তু বদলায় নি। আমাদের ভাষায় সত্যিকারের রুষ-সাহিত্যের প্রভাব তখনই সফল হয়ে উঠবে যখন আমরা বাঙালীর মনের আর তার পারিপার্শ্বিকতার এই যে অসামঞ্জস্য তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারব। তা না করে আমরা আমাদের মনের খোরাক যোগাবার জন্যে মস্তিষ্ক থেকে আমাদের ধারণার উপযোগী সমস্ত ঘটনা তৈরী করে তাতে বেদনার রূপ ও রস দিতে চেষ্টা করছি। এবং তাকে বাস্তবতার নাম দিয়ে অযথা গৌরব করি। যে জীবন এখনও আসে নি—আমরা সেই জীবন তৈরী করে লিখি। এবং এর ফলে আমাদের পাঁক ঘাঁটাই সার হবে—কোনও পঙ্ক তিলক ফোটাতে পারব না। রুষ-সাহিত্যের একটা মস্ত বড় কথা হচ্ছে যে, তার জীবন সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠা ও সততা। রুষ-সাহিত্য বলে কোন জিনিষই আজ জগতে এত প্রভাব বিস্তার করতে পারত না যদি তার প্রত্যেকটা অক্ষর রক্ত দিয়ে লেখা না হত। আমরা যেন মস্তিষ্ক প্রসূত ঘটনার খেলনা সাজিয়ে এত বড় জীবন-বেদকে অপমান না করি।

রুশ-সাহিত্যের অবদান

প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্‌ রুষ-সাহিত্য সমালোচনায় আক্ষেপ করেছেন যে, We had no Homer. আমাদের সাহিত্যে হোমার ছিল না। তার মানে, বর্ত্তমান রুষ-সাহিত্যের পিছনে উৎস-রূপে কোনও tradition নেই। কিন্তু এই একশো বছরের মধ্যেই রুষ-সাহিত্যিক আপনাদের অপূর্ব্ব অবদানে এক বিরাট tradition-এর সৃষ্টি করেছেন। রুষ-সাহিত্যের দিকে চাইলেই বিরাট জীবনের সবল আত্ম-প্রতিষ্ঠার ব্যথায় মন ভরে ওঠে। প্রাচীন গ্রীসে একটা উৎসব প্রথা ছিল যে, একজন লোক মশাল হাতে করে ছুটতো ; তার কাজ ছিল শুধু সেই মশালের আলোকে না নিভিয়ে চলা ; সে ক্লান্ত হলে আর একজন এসে সেই মশাল নিয়ে ছুটতো—এমনি করে সেই মশালের আলোটাকে দূর দেবতার মন্দিরে পৌছে দিতে হবে। রুষ-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখি, অবিরতভাবে প্রাণের দীপ্ত মশালকে অনির্ব্বাণ রেখে অসংখ্য নির্ভীক যাত্রী চলেছে জীবন-দেবতার মন্দির অভিমুখে। মৃত্যুর গুপ্ত-গহ্বর পথে পথে তাদের ব্যাহত করেছে ; কিন্তু তবুও জীবনের মন্ত্র-শক্তিতে বলীয়ান্‌ ঋষি-কল্প যাত্রীরা প্রাণের জলন্ত শিখাকে নিভতে দেন নি।

রুষ-সাহিত্য realistic, কি naturalistic, সে কথা আমার মনেই জাগে না ; রুষ-সাহিত্যের পাতায় পাতায় দেখেছি—বন্দী-প্রাণের মুক্তির আনন্দ-সুর ; দেখেছি, রাক্ষসের বন্দীশালা থেকে আমার রাজকুমার, বন্দিনী জীবন-নন্দিনীকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছে ; আর শুনেছি, কে যেন গাইছে, "হে তরুণ সহযাত্রী, বেদনায় মুহ্যমান্‌ হয়ো না ; বেদনা গাঢ় হোক ; রাত্রি আরও নিবষ-কালো হোক্‌ ; প্রাণের পঙ্ক-শিখা জাগিয়ে রাখ গাঢ়তম বেদনার পথে,—গভীরতম আঁধার রাতে— তোমার দেবতা আসবেন।'

এইখানে Alexander Kaun মহাশয় আন্‌দ্রিভের অপূর্ব্ব জীবনী লিখতে যে কথা বলেছিলেন তা তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।—Thenceforth Russian writers . have performed a task simi-liar to that of the prophets of Israel, in its loftiness and arduousness, and in the hard-ships and perils with which it is fraught.

পুস্কিন ও রুশ-সাহিত্য

ভাষার প্রতিবন্ধক আজ পুস্কিনকে আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে রেখেছে। পুস্কিনের সাহিত্য আমাদের কাছে সুপরিচিত নয়। কিন্তু পুস্কিনের অপরূপ জীবন থেকে জানা যায় যে, তিনিই রুষ-সাহিত্যের গোমুখী ধারা। ম্যাডাম জারিন্‌জভ্‌ পুস্কিনের বিখ্যাত কবিতায় অনুবাদ করেছেন এবং তার সঙ্গে পুস্কিনের এক অপরূপ জীবনীও দিয়েছেন। পুস্কিন জীবনকে ভালবাসতেন ; যেমন করে আলো সূর্য্যকে ভালবাসে। পুস্কিনের যে সমস্ত কবিতা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে, তাতে সদা-প্রবাহমান জীবনের জয়গানের সুর শুনেছি। আর সেই জয়গানের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর জীবনী পড়ে দেখেছি যে, তাঁর জীবনই সেই জয়গান। জিপ্‌সী রমনীর প্রেমে জিপ্‌সীদের সঙ্গে দূর দূরান্তরে ঘুরেছেন। তাঁর "জিপ্সী" কবিতায় সেই মুক্ত বেদুইন্‌-জীবনের অবাধ মুক্তি ফুটে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত কবিতা "Ode to Liberty" কোনও বিশেষ দলের বা দেশের মুক্তির কামনায় নয়—সে বন্দী-জীবনের মুক্তি-কামনা। পুস্কিনের মধ্যে একটা দুরন্ত প্রাণ-ধারা ছিল আর রুষ-সাহিত্যে তিনি সেই অপূর্ব্ব দানই করে যান। পুস্কিনের মৃত্যুতেই বোঝা যায় যে, তাঁর মধ্যে রক্ত কত দ্রুত তালে বইত। পুস্কিনের স্ত্রী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। এই স্ত্রীকে নিয়ে এক ব্যারনের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। ফলে তিনি একদিন রাত্রে ডুয়েল লড়বার জন্তে ব্যারণকে আহ্বান করেন। এই ডুয়েলেই পুস্কিনের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি চীৎ-কার করে উঠেছিলেন, জীবন হতে বিদায়— এ কি বেদনা!

পশ্চিমের শরতের গান

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'পশ্চিমের শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা' তাই পশ্চিমের কবি শরৎ-কালকে উদ্দেশ করে গেয়েছেন, 'তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর।' পুস্কিন সেই মরণের আড়ম্বরময় শীতের তীব্র জীবনের সভাকবি। বাংলার বর্ষার কবি যেমন রবীন্দ্রনাথ—উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ার কবি

যেমন শেলী পুষ্কিন তেমনি শীতার্ত্ত তুহীনের কবি। পশ্চিমের শরৎ আর আমাদের বাংলার শরৎ— এদের নামের ঐক্য ছাড়া আর কিছুরই মিল নেই। বিশ্বকবির কথায় 'আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন।'

কিন্তু পশ্চিমের শরৎ বর্ষার গর্ভ হতে সদ্যজাত শিশুর মত আসে না। সে উদ্দাম ঝড়োহাওয়া আর তুহীনপ্রেতে আসে। সে মরণ। পুষ্কিন সেই মরণ-ময় শীতের সভাকবি। তাই তিনি গেয়েছেন, 'চাই না বসন্ত; হে শীত-ঋতু, তুমি আমার অন্তরের মিতা! তোমার উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ায় আমায় তোমার অন্তরতম দেশে নিয়ে যাও! ঐ মৌন তুহীনের মরণময় বুকে এক অপূর্ব্ব মাধুরী ফুটে আছে...আমার সামনে আজ দেখি সুন্দর শরৎ লুটিয়ে পড়েছে—ক্ষমাপ্রার্থী তরুণীর মত; কপালে তার মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা। আশঙ্কায় সে নুয়ে পড়েছে; সে জানে না, তার ভাগ্যে কি আছে। তার পাণ্ডুর অধরে মৃত্যু-ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। আজ দিনের আলোয় সে বেঁচে আছে—কাল রাত্রের অন্ধকারে সে হয় ত মরে যাবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হলে, 'শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্ব্বদেশের শরৎ সে একই যায়গায় এসে অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে।' আমাদের শরতের শেষ-পাতায় যে অশ্রু মাখা বিদায়ের সুর লেখা—সেই একই সুর পাই পুষ্কিনের শরতের রূপের মধ্যে। পুষ্কিন গেয়েছেন...'a beautiful good-bye! বিজয়া-দশমীর রাত্রির বিদায়ের ধুয়া!

গোগলের ওভার কোট

পুষ্কিনই গোগলকে আবিষ্কার করেন। গোগল রুষ গদ্য-সাহিত্যের আদিস্রষ্টা। যে বিশাল প্রাণের প্রবাহ গর্কী-শেখভকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার জন্ম-গুহার অন্বেষণে গোগলের কাছে আসতেই হয়। এখানে একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পশ্চিমের সাহিত্যের ধারার একটা আপাতপার্থক্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। গল্পে আছে, বহুযুগ আগে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বস্ত্রাভাবে সত্য-সত্যই ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল। নাম মাত্র তার গায়ে কাপড় ছিল। তাকে বিবসন বল্লেই হয়। কিন্তু গল্পে বলে, সেই ব্রাহ্মণ অসীম দুঃসাহসে সেই চীর-বস্ত্রকেই পূজা করত। সেই চীর-বস্ত্রের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ তাঁর দেবতা নারায়ণের সাদৃশ্য দেখেছিলেন। তারও কাপড়ের আদি ও অন্ত নেই—নারায়ণেরও আদি অন্ত নেই—তারও কাপড় দশাহীন কি না পাড়শূন্য; নারায়ণও দশাহীন, অর্থাৎ তাঁর কোনও বিকার নেই। ব্রাহ্মণ এত দারিদ্র্যেও বিদ্রোহ করে নি। রুষ-সাহিত্যের যেখান থেকে সত্যিকারের আরম্ভ সেও এক চীর-বস্ত্রের কাহিনী। সে গল্পটা গোগলের বিখ্যাত গল্প, The Cloak—অর্থাৎ ওভার কোট। রুষদেশে প্রবাদ আছে যে, গোগলের ওভার কোট থেকে রুষ-সাহিত্য বেরিয়েছে। গোগলের ওভার কোট গল্পের নায়কের নাম বদলে যদি সেখানে কোনও রমানাথ বা কৃষ্ণকান্তের নাম করা যায় তা হলে মনে হয় যে, গোগল যেন এই দরিদ্র জাতির একজন অন্তরঙ্গ কবি। গোগলের হাসি,—অশ্রুর রূপান্তর মাত্র। সেণ্ট পিটর্সবার্গের নিদারুণ শীতে একটা দরিদ্র কেরাণী একদিন সহসা বুঝেছিল যে, তার আফিসের লোকেরা তার জামাকে নিয়ে যে ঠাট্টা করে তা মিথ্যা নয়। সে ত ওভার কোট আর নয়—কতকগুলো সুতো ঝুলছে মাত্র। সেই সুতোর সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে নিষ্করুণ বরফ বার্দ্ধক্যের হাড় ক'খানিকে আরও অকেজো করে তোলে। কিন্তু কোথায় পাবে সে নূতন কোট? অনেক দুশ্চিন্তার রাত্রির পর সে এক দরজীর কাছে সেলায়ের জন্যে কোটটাকে নিয়ে গেল। দরজী হেসে ফিরিয়ে দিলে, এর সেলাই হবে কোথায়? তারপর অনাহারে, পুরস্কারের টাকা বাঁচিয়ে তার নূতন ওভার কোট হল। সে রাত্রির তার মনের অবস্থা তার অপূর্ব্ব বিহ্বলতা গোগলের লেখায় এত বাস্তবিকভাবে ফুটে উঠেছে যে, মনে হয়, বহুযুগ তুহীনের দেশে অনাবৃত অঙ্গে রাত কাটিয়ে আমিই যেন আজ নূতন উষ্ণ আবরণ পেলাম। সেই রাত্রিতে তার বাড়ী ফিরতে ভয়ানক দেরী হয়। পথে নির্জ্জন রাত্রে এক পোলের নীচে চোরে নূতন ওভার কোটটি নিয়ে পালায়। চোর তার ওভার কোট নেয় নি, তার প্রাণ নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তার অবশিষ্ট

জীবনের কয়েকদিন সে যে কত ক্রোর টাকার সম্পত্তি হারিয়ে বেঁচে ছিল সেই শোকে। তারপর সে মরে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই পোলের নীচে রাত্রে লোক গেলেই কে যেন তাদের পিছু পিছু এসে তাদের জামা ধরে টানে। একদিন একটা পুলিশ নাকি সত্যি সত্যিই দেখতে পেয়েছিল। তার পিছু পিছু যেতেই সে লোকটী অন্ধকার রাত্রির ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই দূর বাংলা দেশেও রাত্রির অন্ধকারে মাঝে মাঝে কে যেন পিছু টানে; চেয়ে দেখি অসংখ্য শীর্ণ ছায়ামূর্ত্তি রাত্রির অন্ধকারকে পুঞ্জীভূত করে রয়েছে!

গোগলের সাহিত্য

গোগল, টলষ্টয় বা টুর্গেনিভ প্রভৃতিদের মত বেশী লেখেন নি। তাঁর জীবনের পরিণত বয়সে একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা তাঁকে পেয়ে বসে। এবং এই বিতৃষ্ণার বশে তিনি তাঁর সমস্ত লেখা পুড়িয়ে ফেলেন। 'Dead Souls'-এর দ্বিতীয় খণ্ড তিনি দুবার পুড়িয়ে ফেলেন। গোগলের সমস্ত লেখার মধ্যে একটা চমৎকার হাস্যরস আছে। মানুষের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা—তার ভয়-ভ্রান্তিকে গোগল এমনভাবে সাজান যে, সেই সাজানোর ফলেই একটা অপূর্ব্ব হাস্যরস ফুটে ওঠে।

তাঁর বিখ্যাত নাটক 'The Inspector General' এবং তাঁর ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে বিখ্যাত নভেল 'Dead Souls'-এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু এই হাস্যরসের অন্তরালে একটা অশ্রুর আভাস আছে। জীবনের একটা অত্যন্ত অসহায় দিক আছে—যেখানে অজ্ঞতা, অন্যায়, মিথ্যাচার সমস্ত বেমালুম ভাবে তার পরিণতির দিকে না চেয়ে ভীষণ সাহসে বয়ে চলেছে। সেই সাহস দেখলে হাসি পায়—কিন্তু তার হাসিকে উপেক্ষা করে তার স্পষ্ট পরিণতির দিকে চাইলেই কান্না আসে।

টুর্গেনিভ ও য়ুরোপ

টুর্গেনিভই প্রথম রুষ-সাহিত্যের সঙ্গে য়ুরোপের একটা সাক্ষাৎ যোগাযোগ করিয়ে দেন। টুর্গেনিভ রুষিয়াকে যেন য়ুরোপের পথে তীর্থযাত্রায় সঙ্গে করে নিয়ে যান। টুর্গেনিভকে বাঙ্গালীর ভাল লেগেছিল, তার কারণ টুর্গেনিভ হচ্ছেন আসলে একজন কবি—যাঁর বীণায় মানুষের অন্তরের প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাগিণী সুমধুরভাবে ফুটে উঠেছিল। টুর্গেনিভের মধ্যে রুষিয়াকে পাই না কিন্তু সর্ব্বকালের করুণ কাহিনীর একটা সুর কানে বাজে। রুষ সাহিত্যিকের যে একটা সবল আত্মবিশ্বাস ও গভীর প্রাণের বেদনা তার সমস্ত লেখার সংযম ও বাঁধনকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আপনার গৌরবে আপনি মহীয়ান হয়ে ওঠে, টুর্গেনিভের মধ্যে তা পাই না। টুর্গেনিভের রঙের খেলায় কোথাও একটু রঙের বেশ-কম নেই। সে যেন রামধনুর রঙ্—একটার পর একটা সাজান। সে রঙ আকাশ ভোবান সূর্য্যাস্তের রঙ নয়—সে রঙ সমুদ্রের অতল নীলের একাকার রঙ নয়। টুর্গেনিভের সাহিত্যের অন্তরে ফল্গুর মত বেদনার একটী নিঃশব্দ প্রবাহিনী বইছে। সে বেদনা রুষিয়ার জন্য নয়—সে বেদনা কোনও পতন ও উত্থানের জন্য নয়। সে বেদনা কবির অন্তর-লোকের সৃজনময়ী বেদনা। গোগলের বেদনা হতাশা থেকে জাগে—পীড়িত মানবতার জন্যে ডষ্টয়েভস্কী কাঁদেন—কিন্তু টুর্গেনিভের বীণায় যে বেদনার রাগিণী কাঁদে—সে মানবের অন্তরের শাশ্বত ক্রন্দন।

ডন্ কুইক্সো ও হ্যামলেট

এই দুই নায়কের চরিত্রের পার্থক্যে টুর্গেনিভের সাহিত্যের ধারা বোঝা যায়। দুই অমর নাট্যকারের এই দুই অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানুষের মনের দুটী দিকের প্রতীক। একজন তার আদর্শে বিশ্বাস করে। সে জানে জীবনে যাই হোক আদর্শকে মূর্ত্তি দেবার জন্যই জীবন। তাই সে মানুষের হাসি-কান্না ক উপেক্ষা করে আপনার আদর্শকে ফুটিয়ে চলে। আর এই চলার পথে সে দুঃখ দৈন্যকে স্বীকার করে নেয়। আর একজন তার প্রতি পদক্ষেপ মেপে মেপে চলেছে। সে যাই ভাবুক না কেন—তার দৃষ্টি শুধু তাকেই ঘিরে আছে। তাই তার আপনাকে ছাড়িয়ে কোনও বিশ্বাস নেই।

সে ভাবে—সে খুঁটিয়ে দেখে—তার মস্তিষ্ক তার সমস্ত দেহ ও মনকে ছেয়ে রাখে। একজন বিশ্বাসের বলে বড়টা আগিয়ে যায় আর একজন ঘরে বসে শুধু তাই ভাবে—হবে—কি হবে না। টুর্গেনিভের সমস্ত নায়ক খেয়োক্ত ক্লীব

পড়ে। তারা সব রুষদেশের হ্যামলেট। টুর্গেনিভের সাহিত্য বাঙালীদের যে এত ভাল লেগেছিল, আমার মনে হয় যে, বাঙালী বোধ হয় তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আপনাদেরই ছায়া দেখতে পেয়েছিল।)

টলষ্টয় ও কর্ম্মবাদ

টুর্গেনিভের নায়কদের মধ্যে যেমন একটা অলস ভাবপ্রবণতা পাই—টলষ্টয়ের সাহিত্যে ঠিক তার বিপরীত ধর্ম্ম ফুটে উঠেছে দেখি। টলষ্টয় থেকে রুষ-সাহিত্যকে আত্ম-কাহিনীর সাহিত্য বলা যায়। তার মানে, এখানে কোনও fiction নেই। টলষ্টয়, গর্কী—এঁদের জীবন এত বড় একটা সীমানা নিয়ে ফুটে উঠেছিল যে, এখানে ঘটনা তৈরী করবার কোনও প্রয়োজন হয় নি। এখানে জীবন ও সাহিত্য একার্থবোধক হয়ে গেছে। টলষ্টয়ের বিরাট সাহিত্য ও জীবন বিংশশতাব্দীর সব চেয়ে বড় সৃষ্টি। এবং যত দিন যাবে ততই প্রেরণার ও শক্তির জন্য টলষ্টয়ের সাহিত্যের ও জীবনের দিকে আমরা ফিরে চাইব। মহামতি রলাঁ তাঁর গুরু টলষ্টয়ের অপূর্ব্ব জীবনী লিখেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, পৃথিবীর বিকাশের যখনই প্রয়োজন হয়, তখন বিরাট সৃষ্টির বেদনা নিয়ে এই পৃথিবীর স্বর্গের প্রতীক হয়ে বেদনার মহানায়করা এসেছেন। তাঁরা জীবনে প্রচার করে গেছেন যে, বেদনাই মানবের চরম ভাগ্য। সৃষ্টির ইন্ধনই বেদনা। বেদনার এই অধিনায়কগণ দূর পর্ব্বতের অলঙ্ঘ্য চূড়ার মত। ঝড় সেখানে পরাভূত হয়ে কেঁদে ফেরে; তুহীন আর কুয়াসা তার অঙ্গ ঘিরে রাখে! কিন্তু তারই ধবল চূড়ায় সূর্য্যের প্রথম আলোর রথ নামে!

প্রথম সূর্য্যালোকচুম্বিত সেই শিখরে অন্তরের বিশল্য-করণী পাওয়া যায়। মানবের বিরাট জীবনের প্রান্তরে টলষ্টয়ের জীবন অভ্রভেদী শিখর-দেশ। টলষ্টয় বেদনার অগ্রতম অধিনায়ক এবং এ বেদনা টলষ্টয় আপনিই গ্রহণ করে ছিলেন। আনন্দের ও বিলাসের আয়োজন—তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ মাত্রায় সাজান ছিল - যথেষ্ট অর্থ, সুন্দর স্বাস্থ্য, যশ, স্বাধীনতা, সুখের সমারোপ, সন্তান, স্ত্রী—তাঁর সবই ছিল। কিন্তু এ সমস্তের মাঝে তিনি ফকীরের মত বেদনার কুশাঙ্কুরটী অন্তরে গেঁথে নিলেন স্বহস্তে। তাঁর ভিতর থেকে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ প্রাণ চীৎকার করে উঠেছে, ওরে পান্থ, কোথায় সত্য? কোথায় অনাহত জীবন? কোথায় তোর মুক্তি? টলষ্টয় সারা জীবন এই প্রশ্নের প্রেরণায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে, জীবনের এই নিত্য অসামঞ্জস্য ও অসন্তোষের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই। এই আপাত জগতের জীবনের সঙ্গে অন্তরের এই যে দ্বন্দ্ব... এই ত জীবনের লক্ষণ—এই ত সুন্দরের আগমনের পূর্ব্বাভাষ। মাইকেল এঞ্জেলো যেমন এই জীবনের উপর একটা বিরাট সুন্দর ঐশ্বরিক জীবনের সত্তা অনুভব করতেন—টলষ্টয়ও তেমনি এই দুঃখ দৈন্য-সঙ্কুল জীবনের উপরে একটা সত্য ও শিবময় জীবন খুঁজতেন। এই সত্য ও শিবময় জীবনের অধিকারী হবার জন্য তিনি অসীম শক্তিতে এই দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়েছিলেন। পুরাকালে নাইটরা যেমন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্তরের পাপ-প্রক্ষালনের জন্যে গহন দুর্গম বিপদের পথে একাকী শুধু অন্তরের শক্তিতেই বিশ্বাস করে যেতেন—টলষ্টয়ও তেমনি সেই শিবময় জীবনের অধিকারী হবার জন্যে আপনার অন্তরের প্রিয়তম কলা-সাহিত্য—সবও কিছু বিসর্জন দিলেন। সংসার, সমাজ, স্বদেশ, সমস্ত য়ুরোপ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার অন্তরের সঙ্গে তাঁর কি নিদারুণ দ্বন্দ্ব। তারপর একদিন জীবনের বার্দ্ধক্যে গহনতম এক শীতের গভীর রাত্রে কুশ-বিদ্ধ অন্তর চীৎকার করে উঠে, 'পান্থ! দেখা কি পেলে?' সেইদিন রাত্রের তুহীনময় অন্ধকারে বার্দ্ধক্যে টলষ্টয় জীবনের ও সংসারের সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করে উন্মাদ প্রেরণায় বাইরে বেরিয়ে পড়েন। নিরুদ্দেশের অভিসারে মৃত্যুর সাথে দেখা হল! মহানায়কদের জীবনের মৃত্যুই ত শেষ গৌরব!

(ডষ্টয়েভস্কী ও অন্তরলোক

ডষ্টয়েভস্কীর সাহিত্য আমাদের প্রাণ-মনের অত্যন্ত নিকট আত্মীয়। ডষ্টয়েভস্কীর সাহিত্যের অধিনায়করা যদিও মানে

মানুষ, কিন্তু আসলে তারা অন্তরের কোনও বিদগ্ধ বাসনা কিংবা কোনও নিদারুণ আগ্রহের প্রতীক্। কিন্তু তা বলে এই সমস্ত নায়করা রূপকথার অসম্ভব ও অবাস্তব সৃষ্টির মত নয়। ডষ্টয়েভস্কীর অনুরাগে এই সমস্ত রক্ত মাংসের মানুষ এক অপূর্ব্ব আত্মিক সত্তা লাভ করেছে। তাঁর সাহিত্যে আমরা মানুষের অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। এই প্রতিদিনের জীবনের অন্তরালে, এই নিত্য বেদনা ও সংঘাতের অবসরে মানুষের আর একটী জীবন আছে। সে জীবন হতে আমরা সরে আসছি। তাই তার অস্তিত্বে আমরা সজাগ নই। কিন্তু ডষ্টয়েভস্কী পুরামাত্রায় ছিলেন সেই আত্মিক জগতের অধিবাসী। তাঁর অসম্ভব বেদনা-সঙ্কুল বাস্তবিক জীবন তাঁকে সেই অন্তরলোকের অধিবাসী করতে বাধ্য করেছিল। ডষ্টয়েভস্কীর জীবনে তিনটী শোচনীয় ঘটনা ঘটে—যা তাঁর জীবনের ধারাকে একেবারে অন্তরমুখী করে দেয়। প্রথম মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা, দ্বিতীয় সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন, তৃতীয় এই সমস্ত নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার ফলে অপস্মার রোগ (এপিলেপ্সী)। রাজদ্রোহের অভিযোগে ফাঁসীর সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় তিনি মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখী সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই তিনি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হতে মুক্ত হন। সেই মুহূর্ত্তে তিনি সজ্ঞানে জীবিত থেকেও জীবনাতীত অনুভূতির অধিকারী হয়েছিলেন। তারপরই দূর নির্জ্জন সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন। বাস্তবিক জীবনের সঙ্গে কোনও দৃঢ় বন্ধন হবার আগেই তিনি বাধ্য হয়ে আপনার মনের পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে যান। ডষ্টয়েভস্কীর আত্মাই তাঁর দেহের খোরাক জোগাত—তাঁর দেহ তাঁর আত্মার খোরাক জোগাড় করে নি; তাই তাঁর সাহিত্যে দেখি, মানুষে মানুষের সম্বন্ধের কথা ফোটে নি —সেখানে ফুটে উঠেছে সেই অনাদিকালে কথাটী—মানুষের সঙ্গে তার মনের সম্বন্ধের কথা—এই পৃথিবীর বাস্তবতার বিরুদ্ধে মানুষের আত্মার অমর অভিযানের কথা। রাস্কলনিকফ্ সোনিয়ার পায়ের তলায় যখন তার সমস্ত অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, সোনিয়া, তোমার মাঝে আজ বেদনার কুশাঙ্কুর বিদ্ধ নিখিলকে দেখি। তখন সোনিয়ার বাস্তবিক সত্তা সমস্ত লুপ্ত হয়ে যায়, সোনিয়া সত্যসত্যই নিখিলের মর্ম্মবেদনার প্রতীক্ হয়ে ফুটে ওঠে।

ডষ্টয়েভস্কী ও বেদনা

একদিন তমসার তীরে বাণ-বিদ্ধ রক্তাক্ত হংসকে দেখে সহসা আদিকবি বাল্মীকির রসনাকে আশ্রয় করে ধরায় ছন্দের আবির্ভাব হয়। বেদনার রক্ত-সায়র হতেই সাহিত্যের আবির্ভাব। ডষ্টয়েভস্কীর কাছে সমস্ত পৃথিবী, বেদনার সায়রের ক্ষীরনীরে বর্দ্ধিত একটী রক্ত-কমলের রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। তিনি ক্রশ বিদ্ধ যিশুর রক্তাক্ত দেহে নিখিলের বেদনার প্রতীক দেখেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন যিশুর সেই মানব-পরিত্রাতক মূর্ত্তির উন্মাদ উপাসক। তিনি বলেছিলেন যদি আমাকে কেউ বোঝাতে পারে যে, যিশুর ঐ রক্তাক্ত দেহের মধ্যে পরিপূর্ণ সত্য নেই—তা হলে আমি বলব—চাই না আমি সত্য—আমি ঐ রক্তাক্ত দেহ যিশুরই উপাসক। যিশুর বেদনাগুণ্ঠিত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে ডষ্টয়েভস্কীর ঈশ্বরত্বের উপর একটা প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা এসেছিল। এত বড় সুন্দর সৃষ্টি—তাকেও এমনতর ভীষণ বেদনায় কেন বিদ্ধ করেছে ?

ডষ্টয়েভস্কীর রুষিয়া

ডষ্টয়েভস্কীর রুষিয়া এক অপূর্ব্ব জিনিষ। পূজার সময় মন্দিরে প্রবেশ করলেই যেমন ধূপ বিল্বপত্রের সুগন্ধ মনকে ছেয়ে ফেলে—ডষ্টয়েভস্কীর সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশ করলেই তেমনি তাঁর রুষিয়ার প্রতি অপূর্ব্ব মমতা ও রুষিয়ার অদূর গৌরবের ভবিষ্যদ্বাণী মনকে আচ্ছন্ন করে। কি সে গৌরবের ছবি ?—সে কিপলিঙের সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন নয়—সে এক জাতিকে দাস ক'রে মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতার জয়গান গাওয়া নয়—সে সমগ্র মানবতার এক মহিমান্বিত ছবি। আর ডষ্টয়েভস্কী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, য়ুরোপের, তথা, জগতের সমস্ত বৈষম্য দূর করে নূতন যুগের বার্ত্তা নিয়ে আসবে রুষিয়া, নূতন ভাব-বিপ্লবে রুষিয়া হবে জগতের অধিনায়ক। ফাদার জোসিমার মুখে তিনি বলেছেন যে, আবার মহা-মানবের আবির্ভাব হবে—আর

সে মহামানব আসবেন রুষিয়ায়। 'A Raw Youth'-এ Versilove-এর মুখে বলেছেন যে, রুষিয়ার সবচেয়ে বড় আদর্শ হচ্ছে যে, য়ুরোপের সমস্ত বিভিন্ন অনৈক্যের ধারাকে এক বিশাল ঐক্যের সাগরে বিলুপ্ত করিয়ে দেওয়া। য়ুরোপ—আদর্শ ফরাসী আদর্শ ইংরেজ ও আদর্শ জারম্যানের সৃষ্টি করেছে কিন্তু সে অদূর আগত যুগের ভবিষ্যৎ মানুষটাকে গড়ে তুলতে পারে নি। ডস্টয়েভস্কী বিশ্বাস করতেন যে, সে মানুষ গড়ে তুলবে রুষিয়া।

শেখভ ও জীবন-নির্ঝরিণী

যদি বলি শেখভ জীবনের কবি—তা হলে অনেকে ভুল বুঝতে পারেন। তার পরে বলতে হয়, জীবন মানে এই কঠিন বাস্তবিক জীবন—তার জবন্য দৈন্য ও অভাব, আর তা ছাড়া তারই সঙ্গে জড়ান যে জীবন ফুটে উঠল না ফুটে উঠতে পারল না—সেই জীবনও। শেখভের সাহিত্যে যে জীবনের রূপ পাই তার প্রতীক্ আমাদের প্রাচীন রূপকথায় এক যায়গায় পাই—সে রাজার এক সময়ের প্রিয়তম মহিষী দৈবদোষে যখন ঘুঁটে কুড়ুনী দাসী হয়। সে ঘুঁটে কুড়চ্ছে—সেইটুকুই তার জীবন নয়—একদিন সে যে রাজার অন্তরলক্ষ্মী ছিল, সে জীবনও তাকে ঘিরে আছে; এক দিন হয় ত তারই নির্ব্বাসিত পুত্র দূরদেশ হতে জীবন-মরণ-কাঠী নিয়ে এসে আবার রাজরাজেশ্বর হবে—ঘুঁটে কুড়ুনী আবার রাজ-মাতা হবে এ জীবনও তাকে ঘিরে আছে। এই সমস্ত একত্র করে যে জীবন ফুটে ওঠে—শেখভ সেই জীবনের কবি। শেখভের সাহিত্য আমাদের অহরহ গোপন ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমার প্রাপ্য তোমার এখনও পাওয়া হয় নি—তুমি যে স্বর্গ থেকে এসেছ সে স্বর্গে ফিরে যাবার পথ তুমি এখনও খুঁজে পাও নি। শেখভ একবার একটী পত্রে লিখেছিলেন যে, সেই সাহিত্য আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়, যে এই বাস্তবিক জীবনের ঘটনার ইঙ্গিতে বোঝায় যে এ ছাড়াও আরো জীবন আছে; যে সাহিত্য বলে, এই যা আছে তার বাইরে আরো অনেক আছে—আরও সুন্দর ও মহৎ। শেখভের সাহিত্য তাই ইঙ্গিত করে। আমাদের জীবনটা এক বিরাট সাতমহলার বাড়ী। সেখানে আদর্শবাদীরও স্থান আছে, সেখানে স্বপ্ন-বিলাসীরও রংমহালে সোনার শিখা জ্বলে, সেখানে প্রয়োজনের নিত্য ভাঁড়ারের আয়োজনও চলে—জীবনের এই সাতমহল বাড়ীতে শেখভ মনকে নিয়ে যায়। এই সাতমহল বাড়ীর বিরাট জীবনে একটানা সুখও নেই—একটানা দুঃখও নেই। তাই শেখভের সাহিত্যে দুঃখ বা সুখ কোনটাকেই মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা নেই। শেখভের কাছে জীবন সুখ দুঃখ দিয়া গড়া কি না এ প্রশ্ন ওঠেই নি। তিনি দেখেছেন, জীবনে কল-নাদিনী স্রোতস্বিনী আলোকে-অন্ধকারে সমান বয়ে চলেছে। এই নিত্যগতির, এই নিত্য রূপে রূপে পরিবর্ত্তনের একটা বিরাট সৌন্দর্য্য আছে—যা সুখ-দুঃখকে ডুবিয়ে দেয়।

গর্কী ও মুক্ত-মানবতা

The Cherry-Orchard-এ শেখভ পুরাতন রুষিয়ার বিদায়-সঙ্গীত গেয়েছিলেন। নাটকের শেষ অঙ্কে যখন যবনিকা ধীরে ধীরে পড়ে আসে তখন প্রাচীন রুষিয়ার প্রতীক্-স্বরূপ রঙ্গমঞ্চের ভিতর থেকে বহুদিনের প্রিয় চেরী গাছের উপর নির্ম্মম কুঠার-পতনের শব্দ আসে। সেই শব্দ বলে দেয়, পুরাতন রুষিয়া মরে গেল। তখন রুষ-দেশে নূতন মানুষের দল এসেছে—তাদের পুরোভাগে তাদের অগ্রদূত হয়ে নূতন চারণ এসেছে। এই নূতন মানবের দল, তারা এতদিন জগতের নির্ব্বাসনাগারে লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিল। সেই লাঞ্ছনার কারাগার থেকেই তাদের মধ্যেই একজন সমস্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে আপনার রণ-ভেরী বাজিয়ে জগতের সমস্ত নির্য্যাতিত মানবের কাছে বার্ত্তা পাঠাল, 'হে দূর দূরান্তের—হে সুপ্ত-ভগবানের মন্দির, হে নির্য্যাতিত মানব—জাগো। নির্য্যাতনের প্রতিবাদ কর; আপনার অন্তরে ভগবান্‌কে জাগাও।' এই বিপুল বার্ত্তা নিয়ে নির্য্যাতিত মানবতার চারণ ম্যাক্‌সিম্ গর্কী বাংলার এই তন্দ্রালস গেহে আজ পৌঁছেছেন। গর্কীর সবল বাধা-বন্ধহারা বেপরোয়া সৃষ্টির মধ্যে বাঙালী একটা মস্ত বড় গতি-শক্তির পরিচয় পেয়েছে।

যে গতি-শক্তির অভাবে আজ আমাদের সমস্ত চিন্তা ও

কল্পনা শুধু জালের মত আমাদের ঘিরে রাখছে—সেই অপূর্ব্ব গতির জয়গান পাই গর্কীর সাহিত্যে। গর্কীর সাহিত্য গভীরতম বেদনার সাহিত্য; কিন্তু তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা অথবা তিনি স্বয়ং- অন্তরের মধ্যে এমন একটা অনিবার্য্য শক্তি আহরণ করতে পেরেছেন যে, যার বলে সমস্ত দুঃখ দৈন্যের উপর তাঁদের বেপরোয়া গতির বেগ অক্ষুণ্ণভাবে চলেছে।

গর্কী ও বিশ্বমানব

আজ জগতে যে কয়েকজন দুঃসাহসী লোক অসংখ্য বিপদের মাঝখানে বিশ্বমানবতার আদর্শকে জীবনে জাগ্রত করে রাখবার জন্যে জগতের সুলভ যশের পন্থার লোভ সম্বরণ করে নিন্দার ও নির্য্যাতনের কণ্টকপথে সহাস্য মুখে চলেছেন—গর্কী তাঁদের অন্যতম। য়ুরোপে আজ যাঁরা এই মন্ত্রের উপাসক—তাঁরা এক রকম সমাজ পরিত্যক্ত। গর্কী সমস্ত জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন যে, এই সব রাজনৈতিক যুদ্ধ, জগতের কল্যাণের জন্য এর একান্ত তিরোভাব প্রয়োজনীয়! তাই যুদ্ধ-মদ মত্ত য়ুরোপের ওপর তাঁর নির্ভীক কণ্ঠে মানুষের এই হিংস্র-বৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বেজে ওঠে। গত য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময় যখন বিভিন্ন দেশের নারীরাও এই হিংসার যুদ্ধে ইন্ধন যোগাবার জন্য ক্ষেপে ছিলেন তখন গর্কী সমস্ত দেশের নারীদের নিকট একটী অপূর্ব্ব আবেদন পাঠান।

গর্কী ও মানব-মাতা

সেই আবেদনে গর্কী বলেন যে, মানুষের এই জঘন্য প্রবৃত্তির—পৃথিবীর এই বস্তু ক্ষয়ের প্রতিরোধ মন্ত্র আছে নারী-শক্তিতে। মানব মাতার পরিকল্পনায় গর্কীর মন বিভোর হয়ে আছে। তিনি বলেন যে প্রত্যেক নারীর দেহ ও মনের এমনি অপূর্ব্ব গঠন যে, তার প্রতি রক্তবিন্দু এই হিংস্র ব্যাধির প্রতিবাদ করে। কিন্তু আজ নিদারুণ সভ্যতা তার লতার মত মনকে বেঁকিয়ে আপনার ইচ্ছা মত চালাচ্ছে। তিনি বলেন, নারী—মানব-মাতা, তুমিই ত জীবনের শাশ্বত ভাণ্ডার! এই মৃত্যু ভয়ভীত ধরায় হে জননী, তুমিই ত জীবনের মনোহর লোক সৃষ্টি করেছ। তুমি মা, জীবনের রাজপথ।

গর্কী বিশ্বাস করেন না যে, নারীরা যদি মন্ত্রীসভায় বা বিচারালয়ে বিচারক হয়ে বসেন ত তাঁদের চরমোৎকর্ষ হবে; তিনি স্পষ্ট তার প্রতিবাদ করেন। তিনি নারীর সেই অসীম শক্তিতে বিশ্বাস করেন, যে-শক্তি নারীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে পুরুষকে নিয়ত কর্ম্মে ও নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। গর্কী বলেন যে, জগতের সভ্যতার ইতিহাসের শুধু একটা দিকই লেখা হয়েছে; আর একটা দিক লেখা হয় নি। জগতের বহির্ভাগের ইতিহাস লেখা হয়েছে; অন্তরলোকের ইতিহাস লেখা হয় নি। হয় ত হবেও না—কিন্তু সেই অন্তরলোকের ইতিহাস কতশত নামহীনা নারীর রক্ত-আহুতির সৃষ্টি!

আন্দ্রিভ ও বিদ্রোহ

আন্দ্রিভ ও গর্কী দু'জনেই জীবনে অসীম বেদনা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু গর্কীর বেদনায় একটা নির্গম-পথ ছিল। আজীবন মুক্ত জীবনের মাঝে গর্কী বেদনার সত্যরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি হাসতে পেরেছিলেন। কিন্তু আন্দ্রিভের জীবন বড় সকরুণ। সে যেন একটা বিশাল নির্ঝরিণী—যা পাহাড় চিরে পৃথিবীর সূর্য্যালোকে আসতে পারল না। সে শুধু সবার অন্তরালে সৃষ্টির অন্ধকার গহ্বরে কঠিন শিলায় বারে বারে ব্যাহত হয়ে ফিরে এল। তাই তাঁর বিদ্রোহ, আলোর বিরুদ্ধে, গতির বিরুদ্ধে, মুক্ত-রূপের বিরুদ্ধে। কিন্তু হায়! তাঁর বিদ্রোহের অন্তরালে কখন সহসা তাঁরই অজ্ঞাতে স্বীকার উক্তির মত এক সকরুণ বিলাপ ফুটে উঠে, 'হে জীবন, হে অনাদি আলোক, হে মানবের অন্তরের অমর-লোক—তোমার দিশা পেলাম না—তাই আজ এই অশ্রু-বিদ্রোহ তোমার কঠিন মন্দির-শিলায় রেখে গেলাম, আর তারি সঙ্গে অভিশাপ দিলাম যে, যে প্রশ্নের উত্তর আজ তুমি দিলে না- এক দিন হয় ত সমস্ত মানুষ সমবেত কণ্ঠে যখন সেই প্রশ্ন করবে—তোমার ইচ্ছা সত্ত্বেও তুমি তার উত্তর দিতে পারবে না।' আন্দ্রিভের সমস্ত সাহিত্য শুধু এই প্রশ্ন। মানুষের অন্তরের

অনাদিকালের প্রশ্নটি আনদ্রিভের সাহিত্যে ফুটে উঠেছে; এই দৃশ্য-জগতের অন্তরালে সৃষ্টির সৃজনাগারের সমস্ত রহস্য সে জানতে চায়; সে চায়, এই পৃথিবীর অধিনায়ক ঈশ্বরের সামনা-সামনি দাঁড়াতে—কে সে? কত সুন্দর সে? এই নির্মমতা, এ কি তার মিথ্যা আবরণ? সে কি সত্যসত্যই চির-কল্যাণময়? এই যে আপাত বৈষম্য—এর অন্তরালে কোনও যোগ-সূত্র আছে কি? আনদ্রিভের ব্যথিত প্রশ্নের উত্তর আনদ্রিভের সাহিত্যে ওতপ্রোত আছে। আনাথিমা রহস্য-পুরীর নির্বাক দ্বারীর কাছে হতাশ হয়ে কাতরে মিনতি করে বলছে,—

'কে আজ আলোকের সন্তানের মনের এই অন্ধকার দূর করবে! হে অনাদি উষার সন্তান, তুমি এই বিপুল বিশ্বে নিঃসহায় একাকী!...তবুও মিনতি করি—বল, একবার বল তার নাম! মানুষের যাত্রার পথে একবার তোমার রুদ্ধ দুয়ার খুলে ওপারের একটু আলো আসুক। একবার দয়া করে নাম কর।'

রহস্যপুরীর পাষাণ-প্রাণ দ্বারী বলে—

'তুমি যার জন্যে আজ পাগল হয়ে ফিরছ, তার কোন নাম নেই, কোনও সংখ্যা দিয়ে তাকে গোণা যায় না, কোনও মাপ নেই তাকে মাপবার, কোনও দাঁড়িপাল্লা নেই তাকে ওজন করবার।'

আনাথিমা বিরক্ত হয়ে বলে,—

'তোমার ভাষায় আড়ালেও নীরবতা রয়ে গেল। ও আড়াল ভাঙ। আমাকে বুঝিয়ে বল।'

প্রহরী বলে,—

'আমার সমস্ত মুখ আমি তোমার কাছে খুলে দাঁড়িয়ে আছি—তুমি দেখতে পারছ না; আমি তীব্র স্বরে চীৎকার করে বলছি—তবুও তুমি শুনতে পারছ না—আমার বাণী পরিষ্কার, তবুও তুমি বুঝলে না!'

মনে হয় না কি যে, আমাদের ভারতের ধূম সুরভিত তপোবন থেকে এই সুর শুনছি!

ডাকঘর

আপন শক্তি ও বিশ্বাসের উপর সাময়িক আস্থা স্থাপন করিয়া মানুষ জীবন যাত্রায় নানা প্রকারে বিদ্রোহ করে, সংগ্রাম করে। তাহারই ভিতরে নিজেকে যখন নিতান্ত অসহায় ও অবসন্ন বোধ করে তখন নিজ হইতে অপর কোনও শক্তিকে অন্তরে স্বীকার করিয়া বহুভাবে ও বহুনামে সেই শক্তির নিকট বল, উপায় ও সিদ্ধি কামনা করে। এমনও দেখা যায়, নির্বোধ মানুষ অতিশয় হীন কাজ করিবার সময়ও সেই কাজের সাফল্যের জন্য এরূপ কোনও সর্বজয়ী শক্তিকে উপলক্ষ করিয়া স্মরণ করে। সেই শক্তিকে অস্বীকার করিয়া কাহারও জীবন কাটে না।

বৈশাখের নবযাত্রার সঙ্গে আমরাও সেই সর্ববিধাতা অক্ষয় শক্তিস্বরূপকে অবনত মস্তকে স্মরণ করিয়া কল্লোলের চতুর্থ বৎসরে অগ্রসর হইতেছি।

কল্লোলের উন্নতির জন্য যিনি যাহা লিখিয়াছেন ও করিয়াছেন সেই সকল অমরাত্মা ও জীবিত বন্ধুদের বিশেষ রূপে স্মরণ করি।

নববর্ষ উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল হিতকামী বন্ধু আমাদের ও কল্লোলকে পত্রদ্বারা তাঁহাদের প্রীতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন, তাঁহাদেরও আমাদের প্রীতি ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যাঁহারা এতকাল কল্লোলের সেবা ও সাহচর্য্য করিয়া আজ কল্লোল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদেরও আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি।

গত চৈত্রের সংখ্যায় কল্লোল ছাপা হইয়া গেলে বর্ষসূচি ও জাঁ ক্রিস্তফের প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত করিয়া দিতে কল্লোল প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে।

কলিকাতায় অশান্তি প্রযুক্ত ছাপাখানার কর্ম্মচারীগণ কাজে আসিতে পারেন নাই। বিজ্ঞাপন দাতাগণও এই কারণে বিজ্ঞাপন দিতে বিলম্ব করিয়াছেন। অনেকে এই সংখ্যাতেও বিজ্ঞাপন দিয়া উঠিতে পারেন নাই। আরও অনেক বিঘ্ন এবং এই সকল কারণে কল্লোলের বৈশাখ সংখ্যাও ছাপিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল। ইহার পর হইতে কল্লোল যথাসময়ে বাহির করিতে আমাদের নিজেদের কোনও চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। নিজেদের ছাপাখানা না থাকাতেই অনেক সময় বৃথা বিলম্ব হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে কল্লোলে শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা, 'স্মৃতির আলো' উপন্যাস এবং 'জাঁ ক্রিস্তফ্' উপন্যাস এই তিনটি বিষয় ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে। সেইজন্য অন্য কোনও ধারাবাহিক উপন্যাস দেওয়া হইবে না স্থির করা হয়। কিন্তু পরে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উপন্যাস দিবেন স্বীকার করায় আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাহাও দিতে চেষ্টা করিব। আশা করি কল্লোলের পাঠকবর্গ এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন। আপনাদের অবগতির জন্য তাঁহার পত্রখানি এই স্থানে ছাপা হইল।

৮২।৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ৩রা বৈশাখ, ১৩৩৩

প্রিয়বরেষু,

'কল্লোল' পত্রিকাখানি লইয়া আপনার যে সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা যে কতখানি, তাহা লিখিয়া জানাইবার নয়। এই সংগ্রামের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি আপনার অবিচল নিষ্ঠা, সত্য এবং সুন্দরের সেবায় আপনার অসীম ত্যাগ—ইহার আমি প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। আপনাদের এই সাহিত্য নিষ্ঠা এবং একান্ত দুর্লভ সত্যানুরাগ আমার চিত্তকে আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।

বাজারে মাসিকপত্রের মারফত সাহিত্যের ব্যবসা ফ্যালাও করিবার এই ভীষণ প্রচেষ্টার মধ্যেও 'কল্লোল'কে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য একাকী আপনাদের যে এই সাধনা, এ সাধনার সাফল্য আমি কায়মনে কামনা করি,—আপনাদের সাহিত্য-নিষ্ঠা অবিচল হোক ইহাই আমার প্রার্থনা।

আমার অবসরের একান্ত অভাব, তবু 'কল্লোল'-এর জন্য আমার লেখা উপন্যাস আপনি চাহিয়াছেন। আপনাদের সাহিত্য-সাধনায় আমার সহানুভূতি খুবই আছে, তাহা বাক্য-মাত্র বলিয়া মনে করিবেন না।

আপনাদের 'কল্লোলে'র জন্য এখনই কোন উপন্যাস দিতে পারিতেছি না, তবে একমাস পরে দিতে পারিব। একটা প্লটও ভাবিয়া ফেলিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ছাপিতে পারিবেন। উপন্যাসখানির নাম ?—ভাবিতেছি "রূপছায়া"। নাম পছন্দ হয় ? ইতি

ভবদীয়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কল্লোলের পরিচালনা বিষয়ে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায়, সে জন্য আমি কল্লোলের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ইহার পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। কোনও এক ব্যক্তির অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কল্লোল চালান হয় না ইহা আপনারা জানেন। এত অসুবিধা ও ক্ষতিতেও অনেক কারণে আমরা কোনও আর্থিকের সাহায্যে কল্লোল চালাইতে প্রস্তুত নই। তাহা করিতে হইলে কল্লোল প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। দৈন্য বা যে-অর্থবল আমাদের নাই তাহার জন্য আমাদের কোনও লজ্জা নাই। কল্লোল সকলের, সমস্ত সাহিত্যানুরাগীই ইহাতে স্থান পাইয়াছেন ও পাইবেন।

যাঁহারা সাহিত্যকে সত্যই শ্রদ্ধা করিতেন, আপন সৃষ্টিকে সুলভ পণ্য করিব না এরূপ মরণ পণ যাঁহাদের ছিল, তাঁহাদের কয়েকজন সত্য সত্যই এই কারণে অযত্নে ও শরীর রক্ষা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অল্প বয়সে মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছেন। কল্লোলের বন্ধুগণ তাহা অবগত আছেন। এই নূতন বৎসরের ভিতরও এরূপ কোনও সাহিত্যানুরাগী ও কল্লোলের বন্ধু যদি ইহধাম ত্যাগ করিয়া যান তাহাতেও আমরা আশ্চর্য্য হইব না।

বন্ধুরা আমাকে কল্লোলের জীবন-ইতিহাস লিখিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, কল্লোলের এই সংগ্রাম এত সত্য ও পবিত্র যে, তাহা প্রকাশ করিবার এখনও সময় হয় নাই। যদি আমাদের প্রয়াসের ভিতর সত্য কিছু থাকে, আমার বিশ্বাস, মানুষকে বলিয়া না দিলেও মানুষ একান্ত অনমুরাগী না হইলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

লেখকগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিজের বিবেচনায় লেখা খুব ভাল না হইলে প্রকাশ করিবার জন্ম পাঠাইবেন না। রচনা দীর্ঘ হইলেও ছাপিতে অসুবিধা হয়।

সম্পাদন কার্য্য করি বলিয়া আমাদের কোনও স্পর্দ্ধা নাই, কিন্তু লেখা প্রকাশযোগ্য বিবেচিত না হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিতই সে লেখা ফেরত দিতে বাধ্য হই। সকলের লেখাই আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি এবং সম্ভব হইলে রচনা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু তাহা বলিয়া সমস্ত লেখাই এরূপ ভাবে সংশোধন করিয়া ছাপা সম্ভবও নহে, প্রয়োজনও মনে করি না। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে লেখকবর্গ যেন ডাকটিকিট দেন, তাহাতে লেখা সম্বন্ধে মতামত জানিতে কিছু বিলম্ব হইবে না।

সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য আশা করিয়াই নববর্ষ আরম্ভ করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি কল্লোলের আরকেকার অন্তরের কথা, তাই তাহা বোধন-গীতরূপে ব্যবহার করা হইল।

এবারে নানা বিঘ্নের দরুণ বিষয় নির্ব্বাচন ভাল করিয়া করিতে পারি নাই। আগামী সংখ্যা হইতে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।

আগামীবার হইতে ডাকঘরে নানা বিষয়ে আলোচনা করিবারও ইচ্ছা রহিল। এ বিষয়ে গ্রাহকবর্গ ও আমাদের বন্ধুগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়া পাঠান তাহাও এই ডাকঘরের মারফতই অনেক সময় সাধারণ ভাবে উত্তর দিয়া থাকি। এই ডাকঘরের ভিতর দিয়া আমাদের ও কল্লোলের পাঠকবর্গের সহিত একটি নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এ বৎসরে পাঠকবর্গের দিক হইতেও তাঁহাদের বলিবার বিষয়ও কিছু কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। আশা করি এ বিষয়ে আমাদের এই চেষ্টা সার্থক হইবে।

নূতন ভরসা লইয়া আবার নববর্ষ আরম্ভ করিলাম, সকলের সাহায্যে কল্লোলের চতুর্থ বর্ষ সফল হউক।

সম্পাদক
শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ
শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

বিজলী

কার্য্যালয়
দি চেরী প্রেস লিমিটেড,
৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙালীর গৌরব ও বাঙলার শ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

সন ১৩৩৩ সাল, ষষ্ঠ বর্ষ, বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ আনা

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "ঊনপঞ্চা"শী প্রতি সংখ্যাতেই থাকে।
মহাত্মা গান্ধীর আত্ম জীবনী ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে।
ছোট গল্প, নাট্য-প্রসঙ্গ, ছোট কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও অন্যান্য রসাল রচনায় পরিপূর্ণ।

আপনি গ্রাহক হইয়াছেন কি?

বাঙলার ভাবধারার সহিত প্রবাসী বাঙালীর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য

উত্তরা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা—প্রকাশিত হইল—বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৹

সম্পাদক—সুকবি শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন বার-অ্যাট-ল
মনীষী পণ্ডিত ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় M.A.P R.S, P.H.D.

রস-সাহিত্য, মৌলিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সুচিন্তিত দার্শনিক গবেষণা, সুরচিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবাসী বাঙালীর নানা প্রদেশের তথ্য, উত্তর-ভারতের হিন্দী ও উর্দ্দু সুকবিগণের উৎকৃষ্ট কবিতার বঙ্গানুবাদ ও প্রদেশের লোকাচার, গাথা গান প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ—এ পত্রিকার বিশেষত্ব।

প্রত্যেক সংখ্যার বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীগণের ত্রিবর্ণ ছবি, ইহা ব্যতীত অন্যান্য ছবিও থাকে।

যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক—পাঁচ আনার টিকিট পাঠাইয়া যে কোনো সংখ্যা নমুনা আনাইয়া দেখুন। বিনামূল্যে নমুনার জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি—যদি প্রবাসী বাঙালীর প্রত্যেক গৃহে আপনার বিজ্ঞাপনের প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন তবে 'উত্তরা'ই তার একমাত্র মধ্যবর্ত্তিকা। সত্বর পত্র লিখিয়া সন্ধান লউন।

পরিচালক :— প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন

উত্তরা কার্য্যালয়—১০।১ নং লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ

কলিকাতায় এজেন্ট—কল্লোল পাবলিশিং হাউস, ১০।২ পটুয়াটোলা লেন কলিকাতা

বঙ্গবাণী

বার্ষিক ৬৷৹ চতুর্থ বর্ষ। ১৩৩০ সালের ফাল্গুনে আরম্ভ প্রতি সংখ্যা ৶৹

বঙ্গ সাহিত্যের যে-কোন শ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকার নাম মনে করুন এবং "বঙ্গবাণী"র সূচিপত্র মিলাইয়া দেখুন—দেখিবেন, "বঙ্গবাণী"র শ্রেষ্ঠ সেবক মাত্রেই "বঙ্গবাণী"র সেবায় রত। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অমৃতলাল বসু, মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রভৃতির লেখা প্রায়ই বাহির হইয়া থাকে। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "জার্ম্মানীর কথা" শ্রীশরৎচন্দ্র মুখার্জ্জীর "আমেরিকা" প্রায় প্রতি মাসেই প্রকাশিত হইতেছে।

কার্য্যালয়:—৭৭ নং রসা রোড নর্থ, কলিকাতা

কবির কামনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
        নিববে দীপের শিখা
এই জনমের লীলার 'পরে
        পড়বে যবনিকা,
    সেদিন যেন কবির তরে
    ভিড় না জমে সভার ঘরে,
    হয় না যেন উচ্চস্বরে
        শোকের সমারোহ ;
    সভাপতি থাকুন বাসায়,
    কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
    নাই বা হোলো নানা ভাষায়
        আহা উহু ওহো !
    নাই ঘনালো দল বেদলের
        কোলাহলের মোহ ॥

আমি জানি, মনে মনে,
সেঁউতি যূথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।
বর্ষা শরৎ বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি'
যেথায় বীণা যেথায় ভেরী
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন 'পরে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিপনায় থরে থরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখীর কলরবে॥

ওদের সুরে আমার কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে,
জানি আমি এই বারতা
রইবে অরণ্যেতে—;
ফাগুন হাওয়ায় শ্রাবণ ধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
উঠ্‌বে হঠাৎ বাজি';
কভু করুণ সন্ধ্যা মেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠ্‌বে জেগে
রঙীন বেশে সাজি।
স্মরণ সভার আসর আমার
সোনায় দেবে মাজি॥

আমি বেসেছিলেম ভালো
　　সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
　　আমার এ জীবনে।
　সেই যে আমার ভালোবাসা
　লয়ে আকুল অকূল আশা
　ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
　　আকাশ-নীলিমাতে।
　রইল গভীর সুখে দুখে,
　রইল সে যে কুঁড়ির বুকে
　ফুল-ফুটানোর মুখে মুখে
　　ফাগুন চৈত্র রাতে।
　রইল তারি রাখী বাঁধা
　　ভাবী কালের হাতে॥

আমার স্মৃতি থাক্ না গাঁথা
　　আমার গীতি মাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
　　মর্ম্মরিয়া বাজে।
যেখানে ঐ শিউলি-তলে
　ক্ষণ হাসির শিশির জ্বলে,
　ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
　　কিরণ-কণা-মালা;
　যেথায় আমার কাজের বেলা
　করে কতই কাজের খেলা
　যেথায় কাজের-অবহেলা
　　নিভৃতে দীপ জ্বালি'
　　　নানা রঙের স্বপন দিয়ে
　　　ভ'রে রূপের ডালি॥

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩

আমি জানি, মনে মনে,
সেঁউতি যূথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।
বর্ষা শরৎ বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি'
যেথায় বীণা যেথায় ভেরী
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন 'পরে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিপনায় থরে থরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখীর কলরবে॥

ওদের সুরে আমার কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে,
জানি আমি এই বারতা
রইবে অরণ্যেতে—;
ফাগুন হাওয়ায় শ্রাবণ ধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
উঠ্‌বে হঠাৎ বাজি' ;
কভু করুণ সন্ধ্যা মেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠ্‌বে জেগে
রঙীন বেশে সাজি।
স্মরণ সভার আসর আমার
সোনায় দেবে মাজি॥

আমি বেসেছিলেম ভালো
　　সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
　　আমার এ জীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
　　আকাশ-নীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফুটানোর মুখে মুখে
　　ফাগুন চৈত্র রাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
　　ভাবী কালের হাতে॥

আমার স্মৃতি থাক্ না গাঁথা
　　আমার গীতি মাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
　　মর্ম্মরিয়া বাজে।
যেখানে ঐ শিউলি-তলে
ক্ষণ হাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
　　কিরণ-কণা-মালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
করে কতই কাজের খেলা
যেথায় কাজের-অবহেলা
　　নিভৃতে দীপ জ্বালি'
　　　নানা রঙের স্বপন দিয়ে
　　　ভ'রে রূপের ডালি॥

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

[নিম্নে আমরা রবীন্দ্রনাথের একখানি অতি সুন্দর পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কবি পত্রখানি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়কে লেখেন। ছাপিবার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলে কবি পুনরায় যে সম্মতি পত্র লেখেন তাহাও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য দিলীপ বাবুর ইচ্ছানুসারে প্রথমে প্রকাশ করিতেছি। আমরাও জানি, অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের উপর বিরক্ত। এই পত্রে আশা করি সেই সংশয় খণ্ডন হইয়া যাইবে। ইহার পরের রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গুণানুভূতি তাহাই কথাচ্ছলে সঙ্কলিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থ তাহাও আমরা বিজলী সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। —সম্পাদক]

(১)

কল্যানীয়েষু,

তথাস্তু। কিন্তু দায়িত্ব তোমাদের। সাহিত্যে অনেক অনেক অস্বাস্থ্য বিস্তার করেছি, নিজের চরিত্র নিজে আলোচনা করায় যদি বায়ু দূষিত হয়, তবে agent provocateur ব'লে তোমাদের বদনাম ক'রব। একটা নাটক নিয়ে ব্যস্ত আছি। ২৫শে বৈশাখে কি দেখা মিলবে? রবির প্রতাপ তখন আরো বেড়ে যাবে, যদি সইতে পার ত খুসি হব। ইতি ৮ই বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীঃ

(২)

কল্যানীয়েষু,

এই মাত্র কোনো পত্র লেখক আমাকে জানিয়েছেন যে, শরতের বিশ্বাস আমি তাঁর উপর বিরক্ত। যাঁরা আমাকে ভালো রকম জানেন তাঁরা এত বড় ভুল করতেই পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বা কোন বিষয়ে আমার সঙ্গে মতে না মেলাকে আমি কোন দিনই ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্গত বলে মনে করতে পারি নে। আমি যদি কোন দিন স্বরাজ গবর্মেণ্টের অধিনায়ক হই তা হলে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে যে, আমার সঙ্গে তোমার সাঙ্গীতিক মত বিরুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তুমি ধনে প্রাণে সুরক্ষিত থাকবে। শরৎ আমার সম্বন্ধে কোনো অপরাধই করে নি—বোধ করি তুমি জানো, শরৎ সম্বন্ধে আমি কখনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নে (সাহিত্য সম্বন্ধে), প্রথম থেকেই আমি তাঁকে প্রশংসাই করে এসেছি। অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্য রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে কথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না। ভাবী কালের লোকের কাছে নিজের স্থায়ী পরিচয়ের দলিল রেখে যাওয়া যদি লোভনীয় হয় তা হলে কোনো একটা মাত্র পাকা দলিলই কি যথেষ্ট নয়? তুমি বোধ হয় খবর পেয়ে থাকবে, অনেক দিন থেকে আমি হোমিয়োপ্যাথির চর্চ্চা করে এসেছি—তৎ সত্ত্বেও তোমার পরলোকগত মাতামহকে জনসাধারণে আমার চেয়ে বড় ডাক্তার বলে থাকে। তখনো আমার এই একটি সান্ত্বনা যে, তিনি আমার মত ছোট গল্প লিখতে পারতেন না। সকলেই বলে আমার চেয়ে তোমার কণ্ঠস্বর ভালো—তা নিয়ে বৃথা অশ্রুপাত না করে আমি বলে থাকি, মণ্টুর চেয়ে আমার হাতের অক্ষর অনেক ভালো। ভাবী কালের দখল সম্বন্ধে আমার যদি কোনো দলিল না থাকৃত, এ সংসারে আমার সকল অধিকারই যদি কেবল জীবনস্বত্ব মাত্র হত তা হলেও আমি বলতুম, শরৎ চাটুয্যে না হয় ভালো গল্প লিখতেই পারেন, আমি পারি নে বলে সে গল্প আমার ভালোও লাগ্‌বে না এত বড় বোকামি যে আমার নেই সে আমার কম গৌরবের কথা নয়। সকল বিষয়েই আমার ক্ষমতা যদি সকলেরই সমান না থাকে তাই বলেই ক্ষমতাশালীদের যদি ঢুঁ মেরে বেড়াতে থাকি তা হলে ভাঙা কপাল যে, আরো ভেঙে চৌচীর হয়ে যাবে। আমার দেশে যে-কেউ যে-কোনো বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করুন না কেন আমি যে সেই গৌরবের সরীক। সেই শ্রেষ্ঠতাকে নামঞ্জুর করার দ্বারা নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়। আমার দেশে আমার চেয়ে

নানা বিষয়েই নানা লোক বড় এই অহঙ্কার জগতের কাছে যেন করতে পারি। শরতের এককালীন চরকা ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হয়ে নীরব হয়ে থাকতুম যদি আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাকত। কারণ, ব্যক্তিগত কারণে যার উপরে আমার বিমুখতা আছে তাকে নিন্দা করতে আমি ভারি লজ্জা বোধ করি। যাকে প্রশংসা করতে পারি নে তাকে আমি নিন্দাও করতে নারাজ। যখন আমার হাতে সাধনা কাগজ ছিল তখন আমি সাহিত্যিক পল্লাযুদের ভালোও বলি নি, মন্দও বলি নি। বঙ্কিমকে দুই একবার নিন্দা করেছি কেননা তাঁকে প্রশংসা করাই আমাব পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। শরৎ শুনেছি
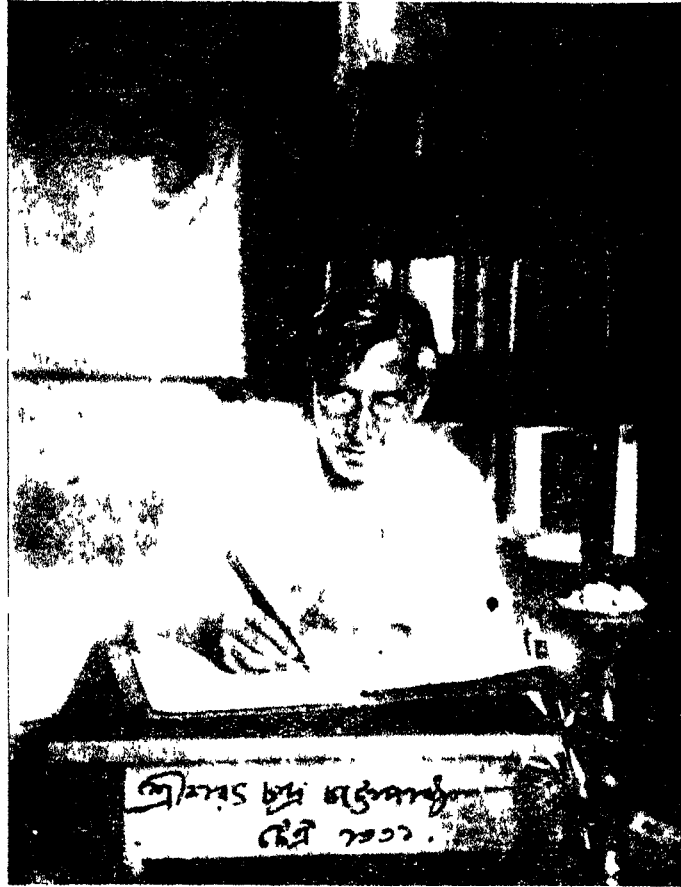
নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান করে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ করে বসে আছেন। তাঁর ঠিকানা জানি নে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি চরকা ছেড়ে কলম ধরেচেন তাতে আমি খুসি হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না— কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হয়েই থাকেন তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনোই চক্রান্ত করব না।

একটা কথা তোমরা কোন দিন ভুলো না যে, আমার পক্ষপাতী বন্ধুবান্ধবদের মুখভারতী আমার বীণাপাণির পদ্মবনের প্রতিবেশিনী নন। নিজের ছাড়া আর কারো

মতামতের জন্যে আমি দায়ী নই,—যাঁরা আমার অনুকূল-বাদী তাঁদের সকলেরই মত যে আমারই মতের কারখানা ঘরের ছাঁচে ঢালাই ক'রে আমি মাল চালান ক'রে থাকি এ একেবারেই অসত্য। বস্তুত যাকে বলে দল আমার সে জিনিষটি নেই—আমি ছড়া বাঁধতে পারি, গান বাঁধতে পারি, দল বাঁধতে পারি নে। আমাকে ভালো বাসেন বিধাতার কৃপায় এমন সব লোক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু আমি গর্ব্ব করে বলতে পারি যে, আমার অনুবর্ত্তী প্রায় কেউই নেই। অতএব আত্মকৃত পাপের জন্যেই তোমরা আমাকে দণ্ড দিয়ো, vicarious punishment গ্রহণ করবার মত পরম শক্তি আমার নেই।

আমার সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার আবহাওয়াতেই আমার শনিগ্রহ এতকাল আমাকে মানুষ করেছেন। তাই যখন দেখি যাঁরা অনুকূল হয়ে আমার কাছে আসেন তাঁরা প্রতিকূল হয়ে দূরে চলে যান তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলি আবার একটু হাসবারও চেষ্টা করি—আমার নক্ষত্রের বাঁকা চালের সঙ্গে আমার বন্ধুরা তাঁদের সিধে চাল যদি না রাখতে পারেন তাহলে আদালতে নিজের কুষ্ঠির নামে ত লাইবেল কেস আনতে পারি নে। আমার অনুরোধ এই যে, যখন থামকা তোমাদের মনে আমার সম্বন্ধে খট্‌কা লাগবে তখন তোমার গ্রহাচার্য্যকে ডেকে স্বস্ত্যয়ন করিয়ো—তার খরচ নিজে দিতে আমি রাজি আছি। ইতি ৩রা বৈশাখ, ১৩৩১

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র

সেদিন দুপুরবেলায় হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, —'গৃহদাহ'-এর দাহ-কার্য্যটি কিরূপে সমাধা হইয়াছিল তাহার ইতিহাসটি আবার একটু ঝালাইয়া লইতেছিলাম। তখন অচলা, সুরেশ ও মহিম জব্বলপুরের উদ্দেশ্যে হাওড়া রওয়ানা হইয়াছে। কিন্তু যিনি এই তিনটি হতভাগ্য নর-নারীকে ঝড়-জলের মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই সে দিনকার সেই কাঠ-ফাটা রৌদ্রের মধ্যে আমাকেও যে হাওড়া অভিমুখেই যাইতে হইবে এ-কথা অচলাদের বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কি ভাবিতে পারিয়াছিলাম!

উত্তর-ভারতীয় প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য সম্মিলন এবার কানপুরে হইবে। কানপুর হইতে জরুরী চিঠি আসিল—সম্মিলনীর সভাপতি হইবার আমন্ত্রণ-পত্র পনের দিন আগে শরৎবাবুকে পাঠাইয়াছি; তাহার কোনো উত্তর না পাইয়া আমরা সকলেই বড় উদ্বিগ্ন ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমাদের হইয়া যেমন করিয়া পার হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে রাজি করাইয়া অবিলম্বে টেলিগ্রাম —ইত্যাদি।

শিবপুর যাইয়া শুনিলাম, শরৎবাবু আজকাল সেখানে থাকেন না, রূপনারায়ণের ধারে তাঁর নূতন বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। অনুমানে বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথকে যে কারণ কলিকাতা ছাড়া করিয়া শান্তিনিকেতনে তাড়া করিয়া লইয়া যায়, সেই কারণ এখানেও কাজ করিতেছে। কিন্তু 'পাবলিক' নামক মক্ষিকাটি যখন আক্রমণ করিতে সংকল্প করে তখন চোদ্দ হাত জলের নীচে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সে সক্ষম হয়—বোলপুরের অবারিত মাঠের শূন্যতা এবং রূপনারায়ণের পঙ্কিল জলের গভীরতা, কিছুতেই তার পথ আটকাতে পারে না।

শরৎবাবুর বাড়ী যাইয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা সাড়ে দশটা। সুইচ্ টিপিলেই যেমন আলো জ্বলিয়া ওঠে, তেমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আতিথেয়তার সুইচ্ যে কোথায় দিয়া কে কেমন করিয়া টানিয়াছিল টেরই পাইলাম না—দেখিতে দেখিতে হাত পা' ধুইবার জল ও জল-খাবার অপরিচিত অতিথির জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎবাবু তখন অন্য বাড়িতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিলেন।

কলিকাতার কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া

রূপনারায়ণের তীরবর্ত্তী এই নির্জ্জন পল্লী-প্রান্তে বাধাবিঘ্নহীন সাহিত্য-সাধনার জন্ত যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেখানে আসিয়া চড়াও করিতে সঙ্কোচ হইতেছিল। কিন্তু আসরে নামিয়া ঘোম্‌টা দিয়া কোন লাভ নাই জানিয়া যখন কারণ নিবেদন করিলাম, তখন শরৎবাবু কহিলেন, পরশু ত আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলুম, অস্বীকার করব, কিন্তু তারপর অনেক ভেবে রাজি হয়েচি।

আমি বলিলাম, রাজি না হ'লে পায়ে ধরে হোক্ যেমন করে হোক্ রাজি করবার জন্তে কানপুর থেকে আমার কাছে অনুরোধ-পত্র এসেছে। শরৎবাবু কহিলেন, রাজি হয়েছি কেন জান? আমি জানি, সেখানকার বাঙালী 'ইয়ংম্যান'রা আমাকে চায়। তাদের আগ্রহকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নে—তাদের আমি বড় ভালবাসি! বুড়োরা আমাকে দেখ্‌তে পারে না, আমাকে গালাগালি দেয় তা' আমি জানি, কিন্তু তবু আমাকে যেতে হবে।

আমি ভয়ে-ভয়ে কহিলাম, হাঁ, তার আভাস ইঙ্গিত কংগ্রেসের সময়েই কানপুরে পেয়ে এসেছি।

ক্ষণকালপরে তিনি হাসিয়া কহিলেন, এ সব কাজে আমার একটা বিপদ হয় কি জান? এ কথাটা আমি আজকাল প্রায় জায়গায়ই বলি—ঢাকায়ও সে দিন বলেচি। মধ্যে মধ্যে তামাক না টেনে ছয়-সাত ঘণ্টা সুবোধ শান্তশিষ্ট বালকের মত বসে থাকা—ওইটে আমার পক্ষে একেবারে অসাধ্য! কাজেই মধ্যে মধ্যে সভা ত্যাগ করে উঠে যাবার অনুমতি আগে থাক্‌তেই আমাকে নিয়ে নিতে হয়।

আর একটি ভদ্রলোক পাশে ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, কালরাত্রে তিনটের সময়ে আপনার তামাকের টান শুনেছি!

শরৎবাবু কহিলেন, ওই অভ্যাস হয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যেও বালিশের কাছে নলটা না পেলে ভালো ঘুমই হয় না।

ক্ষণকাল পরে তাঁর নিজের লেখা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি কহিলেন, আমার লেখা ছেলেরা খুব পছন্দ করে তা' আমি জানি। বড়দের মধ্যেও অনেকে আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু যাঁরা গালাগালি দেন তাঁরা যে কেন দেন তা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। তার একটা কারণ আমার এই মনে হয় যে, তাঁরা অনেকেই না পড়ে আমার উপর অবিচার করেন। দুর্নীতির সমর্থন করি বলে আমার দুর্নাম আছে, কিন্তু কোন্‌টা দুর্নীতি আর কোন্‌টা সুনীতি সেইটেই এ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। সে-দিন একজনের সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল। আমি বল্লুম, এ সম্বন্ধে ক'খানা বই আপনি পড়েছেন? আমি জিনিষটা অনেক ঘেঁটেছি, অনেক ভালো ভালো বই পড়েচি। ডাক্তার যে কথা বলেন, যেটা সায়েন্সের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সত্য তাকে দুর্নীতি বলে' উড়িয়ে দিলেই ত আর সে উড়ে যায় না। অবশ্য এ কথা আমি বলি নে যে, যা সত্য তাই সাহিত্য হতে পারে। কিন্তু যার শক্তিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই যা 'ইন্‌এভিটেবেল্‌' তাকে চাপা দিয়ে লাভ কি? কাব্য আর উপন্তাস কি এক কথা?

কিছুকাল নীরব থাকিবার পরে একজন প্রবীন সাহিত্যিককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এই —বাবু কি আমাকে কম নিন্দা করেচেন, আমাকে পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে সোজা গালাগালটা দিয়েচেন? সে-দিন —বাবু তাঁকে বল্লেন, 'আপনি যে শরৎবাবুর উপর এত চটা, তাঁর বই দু'একটা পড়েচেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'পড়ব আবার কি? ও কি পড়বার যোগ্য?' তারপর 'দেনাপাওনা' ও আরো দু' একখানা কি বই পড়ে এক ভদ্রলোককে দিয়ে আমাকে একদিন বলে' পাঠিয়েছেন, 'আমি আপনাকে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করি। উপন্তাসের মধ্যে যে এ রকম 'ডায়ালগ্‌' থাক্‌তে পারে আগে আমার ধারণা ছিল না। আমি এখন থেকে ডায়ালগ্‌ লেখা শিখ্‌চি; লিখে নিজেই পড়ি এবং নিজেই আবার 'করেক্ট' করি।'

তারপর আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর প্রসঙ্গ তুলিলেন। তাঁর আন্তরিক বিদ্বেষ যে কেমন করিয়া আস্তে আস্তে আন্তরিক প্রশংসায় পরিণত হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কিন্তু এই দু'জনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কোন দিন হারাই নি। এঁদের ব্যক্তিগত জীবন অতি পবিত্র, খাঁটি নিষ্ঠাবান হিন্দুর জীবন সযত্নে চিরদিন যাপন করে এসেছেন। কিন্তু যাঁদের চরিত্র অশুদ্ধ, অত্যন্ত

হীন, যাঁরা চিরদিন পঙ্কিল জীবন যাপন করে এসেচেন, তাঁরা যখন সুনীতির দণ্ড নিয়ে আমাকে তাড়া করে আসেন আমার সত্যই ভারী দুঃখ হয়। অবশ্য তাঁদের সম্বন্ধে এ রকম করে বলা আমার অন্যায়, কারণ এখন তাঁরা স্বর্গীয় হয়েচেন; কিন্তু সাহিত্যে আমি দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েচি এ-কথা যাঁরা বলেচেন তাঁরা আমার লেখা ভালো করে না পড়ে বলেচেন সন্দেহ নেই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, রবিবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয় না?

শরৎবাবু কহিলেন, আগে মাঝে মাঝে হত, এখন আর বিশেষ হয় না। তিনি থাকেন ওইদিকে, আমি থাকি এ-দিকে।

কহিলাম, গালাগালি তাঁকেও ত কম সহ্য করতে হয় নি!

সে আর বল্‌তে! সে বিষয়ে তাঁর তুলনায় আমি শিশু। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের হাতে তিনি যে লাঞ্ছনা, যে অবমাননা পেয়েছেন সে কথা স্মরণ হলে দুঃখে এবং লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'মার খেলে তার আঘাত কি লাগে না শরৎ? কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?'— দেখেছ, কি কাল্‌চার, কি শিক্ষা-দীক্ষা, কি অসাধারণ সহিষ্ণুতা! কোনো দিন মুখ খুলে এতটুকু প্রতিবাদ করেন নি। ঋষিতুল্য মহাপুরুষ তিনি, সৌম্য শান্তমুখে নীরবে সব সহ্য করেচেন। তাঁর মত ধৈর্য্য কি আমার আছে? আমি এই ত তোমার কাছেই আমার নিজের কত কথা বলে ফেললুম!

—এক একবার ইচ্ছে করে, এই রকম অযথা malici-ously যারা তাঁকে নিন্দা করে, তাদের প্রতিবাদ করে খুব করে একবার চুটিয়ে লিখে দিই। উনি নেহাৎ ভালো মানুষ, ওঁর দ্বারা ত এ-কাজ হবে না। আমি মুখ্যু-সুখ্যু পাড়াগাঁয়ের লোক, সব কথা খোলাখুলি ভাবে সোজা কাঠ্-খোট্টা রকমে বোল্‌তে পারব।

দেশের লোকের হাতে রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনার কথা বলিতে বলিতে শরৎবাবু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। একটা নিগূঢ় মর্ম্ম-বেদনার ছায়া মুখের উপর, ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা বাহির হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল। উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, অথচ যাঁরা তাঁকে অযথা নিন্দা করতেন তাঁদের জন্য সাহিত্য-সমাজে তাঁদের সুপরিচিত করবার জন্য তিনি কত না চেষ্টা করেছেন! —বাবু 'ঘরে-বাইরে'র সমালোচনা লিখ্‌তে গিয়ে এমন সব কথা লিখলেন, যা কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়! ললিত ব্যানার্জ্জী মহাশয় রবিবাবুর উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন না। তিনি পর্য্যন্ত সুরেশ সমাজপতিকে বলেন যে, এ-লেখা যদি আপনি 'সাহিত্য'-এ ছাপান তবে 'সাহিত্য'-এর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। তবু সুরেশ বাবু সেটা প্রকাশ করলেন!

* * * *

আশ্চর্য্য! কেউ একটা 'ক্যারেক্টার' সৃষ্টি করতে পারবে না?

আবার কহিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্য আমাদের যে, এত বড় কবিকে আমরা চিন্‌তে পারলুম না। পশ্চিমের লোকেরা অনুবাদের মধ্য দিয়ে কি ছাই পেয়েচে, তাঁর প্রতিভার দশ ভাগের এক ভাগেরও পরিচয় তারা পায় নি। তবু তারা যেটুকু ওঁকে বুঝেচে আমরা তাও বুঝি নি। এত বড় কবি আমাদের দেশে আর হয় নি।

* * * *

মানুষের হৃদয়ের যতরকম অনুভূতি থাকতে পারে তার কি আশ্চর্য্য প্রকাশ হ'য়েছে তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে! সৌন্দর্য্যের কি একটা অবিরাম বিচিত্র জীবনব্যাপী প্রবাহ!

—এই ত ৬৫ বছর বয়স হ'ল, আমাদের কপালে আর কত দিনই বা টিঁকে থাকবেন? তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—আমাদের এই পরাধীন দেশে সাহিত্য ছাড়া গর্ব্ব করবার আর কি আছে? আর কিছু চাই নে ওঁর কাছে, আরো কয়েকটা বছর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন। যে-দিন তিনি থাকবেন না, সে-দিন যে আমাদের কত বড় দুর্দ্দিন তা' ভাবতেও ভয় হয়। কতদিন যাবৎ এই মরণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন। শেষ বয়সের কবিতাগুলিতে মৃত্যুকে যে কত-রকম মূর্ত্তিতে দেখতে চেষ্টা করেছেন তার ঠিক

নেই। এই কালও একটা কবিতা পড়ছিলুম, তা'তেও সেই একই কথা।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবের কথা উঠিল। কহিলাম, আমাদের তথাকথিত সমালোচকেরা ত এ পর্য্যন্ত বলতে ছাড়েন নি, রবীন্দ্রনাথ ইব্‌সেন-ম্যাটারলিঙ্কের অনুকরণ করেছেন।

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া শরৎবাবু কহিলেন, অনুকরণ? —ইব্‌সেন-ম্যাটারলিঙ্ক আমাদের 'গীতাঞ্জলি' আমাদের 'বলাকা' আমাদের 'খেয়া' 'নৈবেদ্য'র মত সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছেন—তিনি যাবেন তাঁদের অনুকরণ করতে! তাঁদের একটা ভাব বা আইডিয়ার সঙ্গে ওঁর একটা ভাব বা আইডিয়ার মিল দেখলেই তাকে চুরি বলতে হবে? দু'জনের মনে কি একই রকম ভাব, একই রকম চিন্তা আস্‌তে পারে না?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, দেখতে পাচ্ছ না, সাহিত্যের ধারাটা কেমন বদলে দিয়েছেন। আমায় একদিন বল্‌ছিলেন, 'কি বল শরৎ তুমি, আমি জানি আমার কবিতার দু'শ পাঠকও নেই।' আমি বল্লুম, 'কি যে বলেন, আজকাল এমন একটা কবিতা আপনি দেখতে পান যার মধ্যে আপনার প্রভাব নেই? আমি অনুকরণ বল্‌ব না, কিন্তু কাব্যের যে ধারা বইয়ে দিয়েছেন সেই ধারা অনুসরণ করে পরবর্ত্তী সমস্ত কবিরা চলেছেন।'—আর শুধু কবিতার কথাই বলি কেন? উপন্যাসের ক্ষেত্র, ভাষায়ও কি তিনি সেই কাজ করেন নি? আজ কাল কি কেউ বঙ্কিম বাবুর ভাষায় লেখে বা সেই রকম উপন্যাস রচনা করে?

—হাওড়া কি অন্য কোথায় ঠিক মনে নেই, একটা ছোট মতন সাহিত্য সম্মিলনে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যা লেখেন তা বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, আর বেশ ভালোও লাগে; কিন্তু রবিবাবুর লেখা মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না,—কি যে তিনি লেখেন তা' তিনিই জানেন।'—ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন তাঁর এই কথা শুনে নিজেকে অলঙ্কৃত মনে করে আমি খুব খুসি হব। আমি উত্তর দিলুম, 'রবিবাবুর লেখা তোমাদের ত বুঝবার কথা নয়। তিনি ত তোমাদের জন্যে লেখেন্ না। আমার মত যারা গ্রন্থকার তাদের জন্যে রবিবাবু লেখেন, তোমার মত যারা পাঠক তাদের জন্যে আমি লিখি।'

কিছুকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, তাঁর কথা বলো না—তিনি আমার গুরু, আমার গুরু।

গল্প লেখার সময় সমস্ত প্লটটা মনে মনে আগে ঠিক করিয়া লন কিনা জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, সমস্ত আগা গোড়া মনের মধ্যে আমার ঠিক হয়ে যায়, এমন কি ভাষাটা পর্য্যন্ত আগে থেকেই অনেকটা জানতে পারি।

এত সব খুঁটিনাটি 'ডিটেলস্‌' কি করে এত মনে রাখতে পারেন?

হাঁ, ওদিকে 'মেমরি' খুব 'শার্প'। তবে যে সব খুঁটি নাটির গল্পের উপর কোনো 'ডাইরেক্ট' প্রভাব নেই, বা দু' একটা সামান্য উপমা—এ সব ত আর আগে থেকে মনে হয় না, ও লিখতে লিখতে এসে পড়ে। রবিবাবু ও-রকম করেন না। তাঁর অন্য রকম 'টেম্‌পারামেণ্ট' বলেই হোক কি যার জন্যই হোক, আগে থাকতে সমস্তটা ভেবে চিন্তে গুছিয়ে নিয়ে লিখতে পারেন না। আরম্ভ করেন, কোথায় গিয়ে যে পৌঁছুবে তা অনেক সময় নিজেই জানেন না।

—আমাকে একদিন রবিবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শরৎ, শুনতে পাই তুমি নাকি গল্পের শেষ থেকে আরম্ভ করে উল্টোদিকে গোড়ায় এসে পৌছও?' আমি বল্লুম, 'তা নয়, তবে মাঝখানে পাঁচ-ছ'টা পরিচ্ছেদ ছেড়ে দিয়ে পরের দিকের একটা পরিচ্ছেদ অনেক সময় লিখি। —একটা চরিত্রের 'ডেভেলপ্‌মেণ্টে'র জন্য আমি খুব সতর্ক থাকি। কোনো ঘটনা চরিত্রের উপর মুখ্যভাবে, কোনো ঘটনা গৌণভাবে কাজ করে, কোনোটা একটু influence করে, কোনোটা বা সামনের দিকে একটুমাত্র ঠেলা দেয় মাত্র,—এই রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষণে যে সব সৃষ্ট চরিত্র উপরের দিকে উঠ্‌তে বা নীচের দিকে নামতে থাকে তাকেই আমি চরিত্রের ডেভলপ্‌মেণ্ট বলি।

অন্ত কোনো বই এখন হাতে আছে কি না জানিতে চাওয়ায় বলিলেন, না আর কিছু নেই, 'পথের দাবী'টা শেষ করেচি ; শীগ্‌গীরই বেরুবে। ওটা পড়েচ ?

আমি বলিলাম, কবে বই হয়ে বেরুবে সেই অপেক্ষায় আছি। ও রকম একটু একটু করে কৃপণের মত পড়তে পারি নে। — •

শরৎবাবু কহিলেন, না ওটা ত সে রকম নয়। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। প্লটের উপর ত আমি জোর দিই নি—কাজেই খণ্ড খণ্ড ভাবে পড়তে আটকায় না।

ভবিষ্যতে আরো বই লিখিবার ইচ্ছা আছে কিনা জানিতে চাহিলাম। উত্তরে কহিলেন, আরো দু'তিন-খানা লেখবার ইচ্ছে আছে। তারপর ভাবছি নাটক লিখব। নাটকের ধারাটার একটা পরিবর্ত্তন করবার জন্তে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। প্ল্যানটাও মনে মনে অনেকটা ভেবে রেখেছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার প্রথম লেখা কোন্‌টা ?

কহিলেন, 'বড়দিদি', 'দেবদাস'—ওইগুলো। আমি দেখেছি আমার লেখার কয়েকটা স্তর আছে। প্রথম স্তরে 'দেবদাস' 'বড় দিদি' ইত্যাদি পড়ে। দ্বিতীয় স্তরে 'পরিণীতা', 'রামের সুমতি', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি পড়তে পারে। তৃতীয় স্তরে 'গৃহদাহ' 'দত্তা' ইত্যাদিকে ফেলা যেতে পারে। চতুর্থ স্তরের আরম্ভ 'পথের দাবী'তে সুরু হয়েচে।

ইতিমধ্যে গাড়ীর সময় ঘনাইয়া আসিল। আমি বিদায় লইতে চাহিলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সে কি ? না খেয়ে যাবে কি ? গেরস্তের বাড়ীতে দুপুর বেলায় অতিথি অভুক্ত গেলে কি গেরস্তের মঙ্গল হয় ? তোমার বাড়ীতে অতিথি গেলে না খাইয়ে তাকে বিদায় দিতে পার ?

আহারান্তে লাইব্রেরীর ঘরটা ঘুরিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, খালি গায়ে মাটিতে বসিয়া কুকুরের গায়ের পোকা বাছিয়া দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, কিহে, আমার গলায় তুলসীর মালা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছ ? যে লোকটা এমন দুর্নীতিপরায়ণ লেখার সৃষ্টি করে, সে তুলসী-মালা পরবে এ-কথা ভাবতে পার ?

রৌদ্র-তপ্ত মাঠের মধ্য দিয়া যখন রেল-ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিলাম তখন মনে হইতেছিল যে, পৃথিবীতে এই আন্তরিক অকৃত্রিম আতিথেয়তা কত সুদুর্লভ, অথচ মানুষের পক্ষে ইহার প্রয়োজন কত সুগভীর।

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

সুকুমার

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

একান্তই সুকুমার শিশু ধরণীর,
আওতায় বেড়ে-ওঠা অঙ্কুরের মত ;
মুখে চেয়ে মনে হত আলো আর নীর,
পায় নাই প্রাণ তার চেয়েছিল যত।
তাই এলো না ক' তার সরস যৌবন,
বসন্তের সমারোহে সাজাতে উৎসব,

শাখায় পল্লবে পুষ্পে সতেজ শোভন,
ঝরে প'ড়ে গেল ছুঁয়ে না যেতে শৈশব।
বনভূমে তারি লাগি জাগিছে বেদনা,
যে অঙ্কুর করিল না কোন অশ্রুপাত,
আশায় ভঙ্গুর স্বপ্ন জীবন-সাধনা
এল রাত্রি, অনাগত রহিল প্রভাত

---

* কবি এই কবিতাটি ৺ সুকুমার ভাদুড়ীকে মনে করিয়া লিখিয়াছেন :—সম্পাদক

মানব

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

হে যাত্রী মানব !
তোমার পথের পারে বাঁধিয়াছে বাসা তব
জীর্ণ ত্যক্ত জীবনের মৃত্যুহীন শব।
আজি তাই প্রভাতের রৌদ্র দীপ্ত পূর্ব্বাকাশে
যে ইঙ্গিতখানি
তোমার এ কর্ম্মবন্ধ শৃঙ্খলিত জীবনেরে
দেয় হাত ছানি,
যে উদ্দাম মুক্তি মত্ত বাতাসের প্রতিশ্বাসে
ডাকিছে তোমারে,
উল্লাসে ছুটিয়া যেতে সে আলোক-উদ্বেলিত
প্রভাতের দ্বারে
থমকি' দাঁড়াও তুমি আতঙ্কে বিহ্বল হায়
হে ভীত মানব!
তোমার পথের পাশে ক্রূর অট্টহাসি হাসে
ভুলে-যাওয়া জীবনের মৃত্যুহীন শব।

হে মত্ত মানব!
তোমারে ঘিরিয়া তব পরিত্যক্ত জীবনের
কৃষ্ণকায় কঙ্কালেরা করে কলরব।
বসন্তের স্নিগ্ধবায়ু উচ্ছ্বসি' উলসি' উঠে
কোকিলের স্বরে,
ভ্রমরের গুঞ্জরণে সুপ্তপুষ্প উঠে ফুটে'
বিশ্বের কাননে,
ধরণীর তপ্তশ্বাসে আনন্দ-কম্পন জাগে
ব্যোম পূর্ণ করি',
তারি সাথে কণ্ঠ দিতে সহসা থামিয়া যাও
শিহরি' শিহরি'।
তোমার সঙ্গীত ছাপি' কঙ্কালের করতালি
করে কলরব,
তোমার বক্ষের মাঝে আজো জাগে, হে মানব,
তব জীর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন শব!

মানহানির মোকদ্দমা

শ্রীজগৎবন্ধু মিত্র

বহুদিন পরে বাড়ী আসিয়াছি। বিদেশে চাকুরি করিতে হয়, তা'র উপর বদলিও লাগিয়াই আছে, সুতরাং ছুটি লইয়া বাড়ী আসা—এ আর হইয়া উঠে না।

সে বার বড়বাবুকে কিছু ভেট্ পাঠাইয়া, সাহেবকে সেলাম ঠুকিয়া ছুটি ত পাইলাম কিন্তু তাও মাত্র পনেরো দিনের জন্ত; কিন্তু এই কটা দিনও কেমন করিয়া যে অযথা কাটিল টেরও পাইলাম না—অযথাই বা বলি কেন? একদিক দিয়া দিনগুলা কাটিল মন্দ নয়।

প্রায় চার বৎসর পরে দেখা—বন্ধুবান্ধব আদর আপ্যায়নে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। স্নেহের অত্যাচার বড় বিষম অত্যাচার, ইহাকে রোধ করিবার উপায় নাই। আতিথ্য এত উপর্য্যুপরি ঘটিয়া ছিল যে, শেষে ডাক্তারের নিকট ছুটিলাম।

মা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, খালি খেয়েই বেড়াবি, একদিন বন্ধুদের ডেকে খাওয়া না।

লজ্জা পাইলাম কিন্তু আমার মধ্যে ও-বিষয়ে কোন দিন উদারতা বা বোকামি ছিল না, আমি জানতাম, সাধিয়া খাওয়ানোর মত বোকামি জগতে দুইটা নাই। কথাটা পার্শ্বপরের মত—তা হোক!

তগুয়া চাকর সুবিধা বুঝিয়া 'বোথার' ডাকিয়া আনিল এবং 'লুগা' মুড়ি দিয়া 'কোঁ' 'কোঁ' করিতে লাগিল।

মা বলিলেন, তাহোক, তুই না হয় হাট-বাজারটা করে দে।

আর উপায় নাই, বাজারে যাইতে হইল কিন্তু ভাগ্য আমার—সব দিক হইতেই মারিয়াছে!…অনেকদিন এ সব দিকে আসি নাই - সব নূতন ঠেকিল।

মাছের বাজারে ঢুকিতে যাইব, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিল। হঠাৎ একটা 'হৈ চৈ' করিয়া শব্দ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে এক ধারে খুব ভিড় জমিয়া উঠিল এবং 'জল আন্' 'পাখা আন্' ইত্যাদি অসম্পূর্ণ বাক্যরাশি কানে আসিতে লাগিল। বুঝিলাম, মারাত্মক কিছু একটা ঘটিয়াছে—খুন জখম ঐ রকম কিছু একটা নিশ্চয়।

শুনিয়াছি কোন একটা বীর কাহিনী শুনিলে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ধমনীতে উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ ছুটিত কিন্তু সেই সব কাহিনী শুনিলে আমাদের রক্তও হিম হইয়া আসে বলিয়া বোধ হয়, তবে এক বিষয়ে আমাদের রক্ত নৃত্য করিতে থাকে, চলিত কথায় তাহাকে বলে হুজুগ। বলা-বাহুল্য, ভিড় দেখিয়া আমারও রক্ত কৌতূহলে নাচিয়া উঠিল। গিয়া দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছি, ঠিক তাহাই।

কিছু দূরে একটি স্ত্রীলোকের ফিট্ হওয়ায় সে মাটিতে পড়িয়া 'গোঁ গোঁ' করিতেছে আর তাহারই একটু দূরে একটি লোক নাকে মুখে হাত চাপা দিয়া ধুঁকিতেছে। মাথা ও মুখ কাটিয়া রক্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। কতকগুলি লোক জল, পাখা লইয়া ছুটিয়া গেল আর সকলে 'থ' হইয়া মজা দেখিতে লাগিল। ব্যাপারটা চোখে দেখিলে রক্ত হিম হইয়াই আসে বটে!

জিজ্ঞেস-পড়া - করিয়া জানিলাম, মেয়েটির নাম সুন্দরী। সে-ই ঐ বেচারা বেচারামকে ঘায়েল করিয়াছে। সুন্দরী? - কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগিল, যাহা হোক্…

দেখিলাম স্থানীয় জেলেনীদের সকলেরই সুন্দরীর উপর কেমন একটা আক্রোশ আছে। সকলেই চুপ করিয়া মজা দেখিতেছে, বাক্যবাণ হানিতেছে, তবু নড়িবে না। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া মেয়েটির জ্ঞান-সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বেচারাম তখন মুখে মাথায় কাপড় জড়াইয়া মড়ার মত পড়িয়া আছে।

দেখিলাম, মেয়েটি সুন্দরী বটে। সেও নাকি মাছের ব্যবসা করে। বয়স কুড়ি একুশের বেশী মনে হইল না। টক্‌টকে লাল চওড়া পাড় সাড়িখানি আঁট সাঁট করিয়া পরা এবং মাথার উপর রক্ত-সিঁদূরের টিপটা অনেকখানি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। মনে হইল, আগে কখন ইহাকে নিশ্চয় দেখিয়াছি, তবে তখন ইহার বয়স অল্প ছিল। নামটার সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়া গেল।

একটি আধা-বয়সী মেছুনী বলিতেছিল, মাগীর ঢলানি-পনা দেখে দেখে গা জ্বলে গেল! কিনা বাবু একটা পান চেয়েচে—তাই না শুনে বঁটি নে মাগী মারমুখী। ভাগ্-গিস্ আমার কেষ্ট গে পড়্‌ল, তা নইলে ঐখেনেই পাঁটা-কাটা কর্‌ত বেচারাকে। ওমা কি খুনে মাগী গো!…বলিয়া মোক্ষদা গালে হাত দিয়া, চোখ দুইটা বাহির করিয়া উপস্থিত সকলের দৃষ্ট আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল।

ইহার কথা কাড়িয়া লইয়া পরশী বলিয়া একটি কম বয়সের মেয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, সব সতীত্ব গো মাসী সতীত্ব, রূপের গোমরে ফেটে পড়্‌ছেন! ও মাগীর হাঁড়ির খবর আমি যত জানি… হেঁ…।

দেখিলাম সুন্দরীর উপর পরশীরই আক্রোশটা অধিক, কারণ তাহারও বয়স কম। 'হাঁড়ির খবরের' কথা উঠিতে আর এক জন বলিয়া উঠিল, থাম্ লা থাম্, মেধো সে দিনকে কি বলছ্যাল শুনিচিস্?

কিন্তু মেধো কি বলিয়াছিল শুনিবার পূর্ব্বে সুন্দরী উঠিয়া বসিয়া মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিল। অকস্মাৎ বচসাও থামিয়া গেল — দেখিলাম, ইহারা সুন্দরীকে শুধু হিংসা করে না ভয়ও করে, তাই সুন্দরীর অচেতন অবস্থায় ইহাদের গলা যতখানি স্ফীত হইয়াছিল তাহার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ততখানি চুপ হইয়া গেল।

আমাকে কাছে দেখিয়া সুন্দরী মাথার কাপড়টা আরও একটু টানিয়া দিল এবং ডাকিয়া কহিল—একবার পুলিশে খবর দিতে পারেন বাবু? বলিয়া সে মুখনীচু করিল, যেন সে আমাকে চিনিতে পারিয়া লজ্জা পাইতেছে।

পুলিশকে ডাকিতে হইল না—দুই তিনটা 'লাল পাগড়ি' পূর্ব্ব হইতেই খবর পাইয়া আসিয়া হাজির। সব শুনিয়া তাহারা বলিল, থানায় যাইতে হইবে। সুন্দরী ত তাহাই চায় কেবল বেচারাম একটু ভয় পাইল। কৌতূহলের নিবৃত্তি হইয়াছে, বেগতিক দেখিয়া ভিড় পাতলা হইয়া গিয়াছে। দু একটা লোককে সাক্ষী দিবার জন্ত পাহারা-ওয়ালারা আটক করিয়া রাখিল।

আমার দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া সুন্দরী কহিল—একবার সঙ্গে যাবেন না বাবু?

আমি আর কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি এক সময় আমাদের বাড়িতে থাক্‌তে না? সুন্দরী স্বীকার করিল। মাকে গিয়া বলিয়া আসিলাম, নিমন্ত্রণটা সদিনকার মত স্থগিদ রহিল—মা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

থানায় দারোগার প্রশ্নে সুন্দরী কহিল, ঐ লোকটি তাহাকে অপমান করিয়াছে এবং অপমানের বিষয়গুলি যদি প্রয়োজন হয় আদালতে প্রকাশ করিবে, এখন আর তাহার কিছু বলিবার নাই। সে যে বেচারামকে লাথি মারিয়াছে একথা সত্য, তবে যে বঁটির দ্বারা কাটিতে গিয়াছিল এ-কথা সত্য নহে।…শেষোক্ত অভিযোগটি পরশী সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিল।

বেচারাম হাত পা নাড়িয়া তাহার নির্দ্দোষীতাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু উত্তরে দেখিলাম সুন্দরীর চোখ দুইটা আবার জ্বলিয়া উঠিল।

সুন্দরীর জামিন দাঁড়াইয়া ছিলাম আমি—বেচারামও খালাস পাইল। থানার বাহিরে আসিয়া সুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ আগে সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে যে দীপ্ত তেজ দেখিয়া ছিলাম, তাহার চোখের জলে সে তেজ একটুও ম্লান হইয়া গেল না বরং বৃষ্টির কণায় সূর্য্য-কিরণ যেমন অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে সুন্দরীর তেজ যেন সেইরূপ, অথচ তাহা ক্ষুণ্ণ মর্য্যাদার বেদনায় স্নিগ্ধ।

ঠিক এই তেজ এই মেয়েটির মধ্যে আর একদিন দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন ও আমাদের বাড়িতে কাজ করিত। বয়স অল্পই, ষোলর বেশী হইবে না। হঠাৎ একদিন মা'র কাছে মেয়েটি আসিয়া কহিল—মা, আপনাদের হেথায় একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই দেবেন? তখন ওর পরনে একখানি সাদা থান, হাতে অলঙ্কার কিছুই নাই, সধবা বা কুমারী বলিয়া ভুল করিবার কিছুই ছিল না।

মা বলিলেন—আহা মেয়েটি বিধবা, দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউ নেই। যে বুড়োটার হাতে ওর মা ওকে সঁপে দিয়ে মরে গেল সেও মরে গেছে এখন ওর উপকার করবার কেউ নেই, অপকার করবার আছে। কিন্তু এখানে আমার স্ত্রীর উহার উপর কেমন মায়া পড়িয়া গেল মা বলিলেন—ভেবে দেখ, বাছা, রাখ্‌বে কিনা। এক্ ত বিধবা, তায় রূপ আর বয়স আছে, আমার ও ভয় করে!

আমি বলিলাম সেই জন্যেই ত মা আরও বেশী রাখ্‌বার দরকার। আহা বেচারা!

সুন্দরী থাকিয়া গেল। নীচু ঘরের মেয়ে হইলে কি হয়, মেয়েটির একটি শান্ত, সংযত স্বভাবের অস্তিত্ব আমরা সকলেই যেন উপলব্ধি করিতাম। উহাকে খুব বেশী জানিবার সুযোগ হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তবু যখনই তাহাকে দেখিয়াছি একটা সংযত তেজস্বিতা যেন তাহার মধ্যে অনুভব করিয়াছি। তার পর সস্ত্রীক আমি বিদেশে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

হঠাৎ একদিন মা'র চিঠি পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন—জনার্দ্দনকে মেরে সুন্দরী কোথায় উধাও হয়েছে…আমি তখনই বলেছি, ওসব মেয়ে কখন ভাল হয় না ..।

জনার্দ্দন আমাদের বাড়ির ছোক্‌রা চাকর।

যাহাই হোক্, তবু সুন্দরীকে অবিশ্বাস করিতে পারি নাই, কারণ নিজের চোখ ও অনুভূতিকে উপেক্ষা করিব কি করিয়া?

মাকে লিখিলাম—তুমি মেয়েটিকে ভালবাস্‌তে পার নি মা, ওকে আরও নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল।

তার পর জনার্দ্দনকে তাড়াইয়া দিয়াছি।

কিন্তু সেই সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে আজ সধবার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হইয়া গেলাম। মা'র অনুমানই কি তাহা হইলে সত্য! মেয়েটি কি সৎ নয়? একটা অস্বাভাবিক তিক্ততায় সর্ব্বাঙ্গ 'রি রি' করিতে লাগিল। ইহার উপর আবার মমতা!

রুদ্ধকণ্ঠে সুন্দরীকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, সে নিজেই অনুনয় করিয়া বলিল—আমাকে খারাপ ভাব্‌বেন না, বাবু—যদি দয়া করে শোনেন...।

সে আর বলিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু তাহার কণ্ঠরোধ করিল। তখন বেলা বাড়িয়াছে আমি তাহার থাকিবার জায়গাটা জানিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

বিকালে সুন্দরীর কাছে গেলাম। একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মাটির ঘরে সে আমাকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঘরে জিনিষপত্র যাহাই থাকুক্, বুঝিলাম ব্যবসা করিয়া উপার্জ্জন তাহার মন্দ হয় না। কুটিরে প্রবেশ করিতে যাইব, একটি সাতাইশ আঠাশ বছরের ছোক্‌রা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া আমার পায়ের ধুলা লইল, বলিল—কি ভাগ্যি, আপনার পায়ের ধুলো পেনু আমরা। ও সুন্দর, একটা পিঁড়ি পেতে দে দেব্‌তাকে।

লোকটির একটা পা নাই, ভাবিলাম সুন্দরীর দূর সম্পর্কের কেহ হইবে বোধ হয়। একটা তিন চার বছরের উলঙ্গ শিশু এতক্ষণ দস্যি-বৃত্তি করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। লোকটি বলিল—ওরে ক্যাব্‌লা, হাঁ করে দেখ্‌চিস্ কি? গড় কর্ বেটা বাবুকে।

সুন্দরী আসিয়া সলজ্জ ভাবে বলিল—আমার সোয়ামী আর ছেলে বাবু। বলিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুমা দিল।

অধৈর্য্য হইয়া বসিয়াছিলাম, এই বার ঘামিয়া উঠিলাম। স্বামী পুত্র, বলে কি! তাহা হইলে মা ত মিথ্যা বলেন নাই! রাগে মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল—এই কদর্য্য সংস্পর্শে ভদ্রলোকে আসে? উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, লোকটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া 'হাঁউ মাউ' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—বাবু, আমি চল্‌তে পারি না বলে আমার বউকে শালারা যাচ্ছে তাই কয়বে? যা-হয় এর একটা...সবটা শুনিবার আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম, কেবল একটা ব্যথিত আওয়াজ কানে আসিল—বাবু, আমি খারাপ নই।

বাড়িতে আসিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল, তাড়'তাড়ি চলিয়া আসিয়া ভাল করি নাই, সবটা শুনিলেই বা দোষ কি ছিল? তার উপর মেয়েটির ঐ ব্যথাভরা কথাগুলি কেমন যেন একটা রহস্যের মধ্যে লইয়া যাইতেছিল। ঐ যে তেজ দু দু'বার এই রমণীটির মধ্যে দেখিয়াছি তাহা কি এতই মিথ্যা? তাহার পরিণতি কি এতই কদর্য্য?

সকালেই সুন্দরীর কাছে গিয়া দেখি, সে ঘরে নাই। দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম, বেচারাম সুন্দরীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে এড়াইয়া গেল। লোকটাকে এখানে আশা করি নাই।—তখনও তা'র মাথায় ব্যাণ্ডেজ জড়ানো ছিল।

সুন্দরীর স্বামী পায়ের ধূলা লইয়া জানাইল, বেচারাম বাড়ি 'চড়োয়া' হইয়া মারি'ত আসিয়াছিল, কিন্তু—বলিতে বলিতেই লোকটার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই মুখে সহজ ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া জানাইল—

সুন্দরীর মত সতী-সাবিত্রী স্ত্রী নাকি বড় দেখা যায় না, তাহার প্রমাণ বেচারাম চূড়ান্ত পাইয়াছে কিন্তু সে এত অযোগ্য স্বামী যে, স্ত্রীর এই অপমানের প্রতিশোধ সে নিজে হাতে লইতে পারিতেছে না, তাহা না হইলে কি বেচারাম আজ অমনি ফিরিয়া যায়? জান যাক্ সো বি আচ্ছা।

এত করিয়াও কিন্তু লোকটা আমাকে খুশী করিতে পারে নাই। কিছু না বলিয়া বাড়ীতে আসিতেছিলাম, পথে সুন্দরীর সহিত দেখা—আপনার সাথে একবার দেখা কর্‌তে গেছনু বাবু।

মনটা তিক্ত হইয়াছিল, ঝাঁজালো সুরে কহিলাম—বাবুরও আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কি বলবার আছে বলে ফেলো।

—এখানে, বাবু?

—এখানে না ত কোথায়? বাড়ীতে মা আছেন, তোমাদের ওখানে যেতে চাই না, কাজেই আর কোথায় যাওয়া চলতে পারে?

তাহার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া সুন্দরী তাহার এতদিনের ইতিহাস সংক্ষেপে কহিয়া গেল—মাকে বলেছিনু, জনার্দ্দন থাকলে আমার থাকা পোষাবে না মা, ও আমার সঙ্গে ঠিক ঝিয়ের মত ব্যাভার করে। তার পর একদিন ঠিক মেজাজ রাখ্‌তে পারি নি, মার ধোর করে নিজেই সরে এনু। তার পর কলে ভর্ত্তি হই কিন্তুক সেখানকরের নোকগুলো আরো বজ্জাত বা'বু—বাড়ি হতে না বেরুলেই ভাল করতুম। কত নোক আম'কে বে করতে চাইত, শেষে দেখনু এই সব হতচ্ছাড়া লোকদের সাথে আর থাকা যায় না। আমার সোয়ামী, সেও ত্যাখন কলে জাজ করত, কিন্তুক আমি ওকে চিনতুন নাক—ও ত্যাখন খোঁড়াও ছেল না।

সুন্দরী একটু চুপ করিল, তারপর সলজ্জভাবে বলিল—একদিনকে ওর ঘরে গে বলনু, 'আমাকে বে করে বাচাও'… ওর কেউ ছেল নাক! মাইরি বাবু, আমি ত্যাখন এই সব লোকদের সাথে একদম টেঁকতে পারছিনু না—ভদ্দর নোকের ঘরেও যেতে ভরসা ছেল না। ও রাজি হল—তার পর ছু বচর পরে ক্যাবলা জন্মেচে।

দেখিলাম সুন্দরীর এইবার চোখ দুটা ছল ছল করিয়া উঠিল। সে পুনরায় বলিল—সোয়ামীই আমাকে খাওয়াত কিন্তু সেবার আশ্বিনে কলে ওর একটা পা ভেঙে যায়—পা কেটে ফেলতে হ'ল। সেই হতে আমি মাছের ব্যবসা ধরিছি, বাবু, কিন্তুক কতকগুনো ডাকরা মড়া এখনও আমার পেছনে নাগে—হাবাতে মিন্‌ষেকে খুন করি নি, এই ঢের।

সুন্দরী রাগে আর কিছুই বলিতে পারিল না, শেষে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে, যাহা হয় কিছু একটা ব্যবস্থা করিব। সুন্দরী চলিয়া গেল, আমি ভাবিতে লাগিলাম, আশ্চর্য্য এই নারী! ছোট ঘরের মেয়ে? —হোক্! এরূপ মর্য্যাদাজ্ঞান কবে কোথাই বা দেখিলাম?

দুপুরে সুন্দরীর পক্ষের যিনি উকিল, তাঁর বাড়িতে গেলাম,—

কি দেখলেন, লোকটাকে জেল দেওয়া যেতে পারে না? সত্যই সুন্দরীর জন্য ব্যথিত হইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, একটা নারীর সম্মানের জন্য আমার অর্থ বৃথাই ব্যয়িত হইবে না।

উকিল বাবু কহিলেন—লোকটার হয় ত কিছুই হবে না, উল্‌টে মেয়েটির জেল কিংবা জরিমানা হতে পারে, কারণ জজ সাহেব নীচু ঘরের মধ্যে এইটুকুর জন্য এতটা সম্মানজ্ঞান হয় ত স্বীকার করবেন না।

আমি উত্তেজিত হইয়া কহিলাম নীচু ঘর? এদের মধ্যে কি ভাল মেয়ে নেই বলতে চান? ঠিক এই কারণে জজ সাহেবের স্ত্রী কি করতেন বলতে পারেন?

আমার উত্তেজনায় উকিল বাবু হাসিয়া ফেলিলেন—হয় ত গুপ্তভাবে লোকটার ফাঁসীই হত কিন্তু বাইরে কথাটা প্রকাশই পেত না বোধ করি। এরা নেহাৎ বোকা কিনা। তাই থামকা ঢাক পেটাপিটি করে ফেলে।

আমিও হাসিয়া ফেলিলাম কিন্তু সুন্দরীর উপর শ্রদ্ধা আমার বাড়িয়া গেল।

বাড়িতে ফিরিয়া দেখি, বেচারাম দরজার কাছে দাঁড়াইয়া। বেচারাম আমার কাছে? গা রিরি' করিয়া উঠিল। ভাবিলাম লোকটাকে এইখানেই উত্তম মধ্যম দিয়া বিদায় দিই। ও কি জানে না, আমি সুন্দরীর পক্ষের লোক? দেখিলাম বেশ জানে। বেচারাম আমাকে প্রণাম করিয়া কহিল—অনেক উকিল বাবুর কাছকে জেনেচি বাবু। সুন্দরীকেই হার্‌তে হবে, আমার জরিমানা হতে পারে এইমাত্র। কিন্তুক সুন্দর্‌ হাজতে থক্‌বে এ আমি সইতে পারব না বাবু। মাইরি বলচি, আমি ত পুলিশে খবর দিতে চাই নি! ও আমাকে মারুক কাটুক, আমি কিছু মনে করি নি, বাবু, কিন্তুক ঐ খোঁড়া শালা, ও ফুটুনি মারবে!

আমার মুখের দিকে চাহিয়া বেচারাম ভয়ে চুপ করিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম—বেচারাম আসিয়াছে সুন্দরীর পক্ষ লইয়া? ও সুন্দরীর শত্রু! সব যেন গুলাইয়া গেল।

—আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারিস, সুন্দরীর সঙ্গে তোদের সম্পর্কটা কি?

বেচারাম স্পষ্টই বলিল, আমি সুন্দরকে ভালবাসি বাবু। যখন কলে খাটতুম তখন হতেই ওর সাথে চেনা। ঐ শালা

খোঁড়া কি যে তুক করলে...শালার আর একটা পা যদি ভাঙতে পারতুন ত—

—লোকটার নামটা কি ?

—অনন্ত !

দেখিলাম অনন্তর উপর বেচারামের আক্রোশটা কিছু জোরাদা, তবে অস্বাভাবিক নহে। ভালবাসার আইনে যাহাই বলুক না কেন, শাসনের আইনে পরস্ত্রীর উপর অনুরাগটা তেমন ভাল চোখে দেখে না। এই কথাটাই বেচারামকে সেদিন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, একটু নরম স্বরে কহিলাম - তুই হয় ত ভালবাসিস্ কিন্তু সুন্দরীত তোকে চায় না, আর ও যখন অনন্তকে বিয়ে করেছে—

প্রথমটা বেচারামের মুখ এতটুকু হইয়া গেল তারপর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল - বে করেছে! শালা খোঁড়াকে আমি যদি না দূর করতে পারি ত দেখে লেবেন। আমি ত মেটাব না কেস!

একটা সহজ প্রেমের উপসংহারে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলাম—ব্যাপারটা একটা রেষারিষি লইয়া বইত নয়, ও মিটিয়া যাইবে! কিন্তু একি সমস্যায় পড়িলাম, সুন্দরী তবে কি অনন্তকে বিবাহ করে নাই ? ফিরিয়া দেখিলাম, বেচারাম চলিয়া গিয়াছে।

মা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আমিও হইয়াছিলাম। কি মিথ্যা কাজে ঘুরিয়া বেড়াই! বন্ধুবান্ধব লইয়া একদিন আমোদ করিব, তাও হইয়া উঠিল না! ভাবিলাম, আজি যা-হোক একটা মীমাংসা করিয়া আসিব!

সুন্দরীর কাছে শেষবার গিয়াছিলাম, দেখিলাম সে তখন অনন্তের গা হাত পা টিপিয়া দিতেছে আর ছেলেটি তাহার বুকে পড়িয়া স্তন পান করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সুন্দরী সম্বৃত হইয়া বসিল, আর অনন্ত আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। বেশ বুঝিয়াছিলাম, সে জাগিয়া আছে কিন্তু আমাকে দেখিয়া ঘুমাইবার ভাণ করিতেছে। কদিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছি অনন্ত আমাকে এড়াইয়া চলিতে চায় কিংবা অস্বাভাবিক ভাবে তোষামোদ করে।

বেচারামের কথাটা আমাকে সর্ব্বদাই বিঁধিতেছিল, মমতা বলিয়া কিছু আর যেন ছিল না। সুন্দরীকে বাহিরে ডাকিয়া আনিলাম, সে শুষ্কমুখে কহিল—ওর কাল থেকে গাটা গরম হয়েচে, কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না, বাবু— আমার সোয়ামীর!

তবে আর কি, মাথা কিনেছ আমার। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিলাম—ঐ লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি আজ জানা গেছে—আর ভুগিও না যাও।

সুন্দরী কিছুই যেন বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল। শেষে শুষ্ক মুখে কহিল—ক্যাবলা যে আমার সোয়ামীর ছেলে একথা কি আপনার বিশ্বেস হচ্ছে না বাবু!

সুন্দরীর চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। তাহাকে যে এরূপ ভাবে আঘাত করিব একথা আদৌ ভাবি নাই, বস্তুত ওরূপ কোন প্রশ্ন আমার মস্তিষ্কে আসেই নাই। সুন্দরী তাহার সরলতায় কথাটা ঘুরাইয়া ভাবিয়াছে। আঘাতের গুরুত্ব ও লজ্জায় আমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। শেষে বেচারামের কথা বিশ্বাস করিলাম ? আমাকে কি ভূতে পাইয়াছিল ?

কথাটা বোধ হয় একটু জোরেই বলিয়াছিলাম! অনন্ত ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমতা আমতা করিয়া কহিল—বেচারাম আপনার কাছকে গেছল বাবু, ওকে বিশ্বেস কর না হুজুর, আমি ওকে সেদিন মেরেই ফেলতুম।”

দেখিলাম, লোকটা কাপুরুষ—বেচারামকে দস্তুরমত ভয় করিয়া চলিতেছে! কেন ?

* * * *

দিন তিন চার পরে শুনানির দিন পড়িল, ‘তলব’ আসিয়াছিল—কোর্টে যাইতে হইল। যে রকম দেখিলাম, বেচারাম যে মিটাইয়া লইবে এমন বোধ হইল না, সুতরাং ফল কি হইবে বলা যায় না! তাই সুন্দরীকে বলিলাম—কিছু যদি বাড়িয়ে বল্‌তে পার ত বেচারাম খুব জব্দ হয়ে যায়। কিন্তু বেচারামকে জব্দ করিবার মত উত্তেজনাও আর আমার ছিল না! নিজের হীনতায় কেবল আমি লজ্জা পাইতেছিলাম— একটা সামান্য কারণে মিথ্যা বলিব!

অনন্ত সাগ্রহে কহিল—আমি বল্‌তে ছাড়্‌ব না হুজুর, আপনিও যদি রাজি হও—দেখে নব বেটাকে, অনন্ত

মিস্ত্রীকে ত চেন না! বলিয়া অনন্ত মিস্ত্রী চক্ষু ও হাত আস্ফালন করিল।

সুন্দরী আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—দরগার নেই বাবু, আপনি যা জানেন তাই কইবেন, ধর্ম্ম মাথায় থাক্!

সুন্দরীর অভিযোগ পড়া হইবার পর, আসামী বেচারামের শুনানির তলব পড়িল। ভয় করিয়াছিলাম, সে কি না কি বলিবে, কিন্তু দেখিলাম, সে সব কিছু সংযত ভাবে বলিয়া গেল, কোথাও অত্যুক্তি করিল না। সে যে পান চাহিয়াছিল একথা স্বীকার করিল কিন্তু ইহাও বলিতে ছাড়িল না যে সে তজ্জন্য কিছু মাত্র অন্যায় করে নাই, কারণ একদিন ছিল, যখন সে যে সুন্দরীর কাছে কত পান খাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজই না হয় সুন্দরী বিরূপ হইয়া তাহাকে মারিয়াছে কিন্তু আঘাত এমন কিছুই নহে। তারপর বেচারাম উত্তেজিত হইয়া অনন্তের দিকে একবার রোষ কটাক্ষে চাহিয়া কহিল—কিন্তুক ঐ যে শালা বলে সুন্দরকে বে করেচে, একথা একদম মিথ্যে হুজুর, ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না হুজুর…

সুন্দরী জ্বলিয়া উঠিল—ও আমার সোয়ামী নয়! ড্যাক্‌রা মিন্‌সে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ক্যাবলা ওর ছেলে নয়? ওর সাথে আজ পাঁচ বছর ঘর করি নি আমি?……

তারপর হাকিমের দিকে ফিরিয়া কহিল—এখেনেই ড্যাক্‌রা অপমান কর্‌বে আমায়? ও আমার কাছ্‌কে পান চাইবে, কাপড়, সামিজ কিনে দেবে, আমার ছেলের হাতে লুকিয়ে ট্যাকা দে যাবে, আর আমি কিছু বল্‌ব না? আমার কি ট্যাকা নেই, আমার সোয়ামী কি আমায় খাওয়াতে পরাতে পারে না? ও শুখোর ব্যাটা মিথ্যে কয়েচে হুজুর, আমি ত ওকে বঁটিতে কাট্‌তেই গেছ্‌লুম। হয় ওকে জেল দাও, নয় আমায় দাও, হুজুর…

থানায় সুন্দরী কহিয়াছিল, বঁটিতে কাটিতে যাওয়া কথাটা মিথ্যা কিন্তু সেই মিথ্যাটাই নিজের মুখে ব্যক্ত করিয়া নিজেকে কেন সে বিপন্ন করিতে চায়? আর আশা নাই, নিজের বিপদ সুন্দরী নিজেই ডাকিয়া আনিল, আর সত্যই যদি সে অনন্তের বিবাহিতা স্ত্রী না হয়, আইনের চোখে তাহা হইলে সে পতিতা সুতরাং বেচারাম তাহার কাছে পান চাহিয়া এমন কিছু অন্যায় করে নাই। ঘৃণায় আমার সমস্ত হৃদয়-মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল কিন্তু সুন্দরীর সে অগ্নিমূর্ত্তি আজও ভুলি নাই!

কথাটা পুনরায় উঠিল, সুন্দরী যে অনন্তের বিবাহিতা স্ত্রী নয় ইহার সাক্ষ্য দিবে কে? সকলের আগে দিল অনন্ত …একটা সদ্য পরিহিত পৈতা টানিয়া বাহির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অনন্ত মিস্ত্রী কহিয়া গেল—আমি বামুনের ছেলে হুজুর, আর ও মাগী কৈবর্ত্ত হুজুর। খুব ঠকান্ ঠকিয়েছে মাগী। জাতও দিয়েচি আবার ধর্ম্মও দোব? মিথ্যে কইতে পার্‌ব না দেবতা—সে ছেলে অনন্ত চক্কোত্তিই নয়। ঐ বেচার সাথেই মাগী কত ঢলাঢলি করেছে, সে কি আর আমি জানি নি—হেঁ! ছোঃ, আবার বে কর্‌বে। মাঝ্‌ থেকে মাগীর তরে গতর পিষে আমার পা গেল দেবতা। এই নাকে কানে খৎ দিচ্ছি হুজুর, আর ও মাগীর ঘরে থাকে? কাশীতে গে পেরা-চিত্তির কর্‌ব কালই…" বলিয়া অনন্ত চক্কোত্তি চারিদিকে চাহিয়া বীরত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের হাসি হাঁসিল।

ইহার আগে অনন্তের গায়ে কখনও পৈতা দেখি নাই—আজ দেখিলাম। বুঝিলাম বেচারাম লোকটাকে অনেক টাকা খাওয়াইয়াছে। অনন্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুন্দরীর 'গোঁ গোঁ' করিয়া ফিট্ হইল—ক্যাব্‌লা কাঁদিয়া উঠিল।

সুন্দরীর জ্ঞান ফিরাইতে বহুক্ষণ লাগিল কিন্তু বিচার শেষে সুন্দরীর জেল হইল না।

সুন্দরী প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—এ বিচের হ'ল না হুজুর, আমায় জেল দাও, আমি ত ওকে খুনই কর্‌তে গেছনু।…কিন্তু তাহা আর হইবার নহে, বিচারক উত্তরে শুধু একটু হাসিলেন। সুন্দরী পুনরায় পড়িয়া যাইতেছিল, একজন ধরিয়া ফেলিল।

কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, সুন্দরীও সঙ্গে আসিল। অনন্তকে কোথাও দেখিলাম না—একটা পা লইয়া খোঁড়া কোথায় ভাগিয়াছে।

বাহিরে আসিয়া দেখি বেচারাম আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। হঠাৎ এ কি ব্যাপার ঘটিয়া গেল! চোখকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! সুন্দরী টলিতে টলিতে গিয়া বেচারামের হাত ধরিয়া কহিল— চ আজ থেকে তোর ঘরে থাকিব।

আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

দিন কয়েক পরে একদিন সকাল বেলা সুন্দরী আসিয়া অতিশয় কাতরভাবে আমাকে অনুরোধ করিল, বাবু, আপনি যদি কারখানার ডাক্তার বাবুকে বলে একবার অনন্তকে দেখ্‌তে পাঠিয়ে দেন। কয়দিন ধরে ব্যামোতে বড় কাতর হয়ে পড়েছে।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, তুমিই ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে গেলে পারতে!

সুন্দরী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, আমি যে ওর কাছে থাকি না বাবু।

সুন্দরী বিদায় হইয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর ছুটির বাকী কয়েক দিন মা'র কথা মত বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছি, সুন্দরীর কথা লইয়া গল্পও করিয়াছি। কেহ কেহ ঘটনাটি লইয়া আমাকে ঠাট্টাও করিয়াছেন, কিন্তু সত্যই আমি বহুকাল অবধি এই অদ্ভুত নারীটিকে ভুলিতে পারি নাই।

— — —

কাক-কোকিল-কথা

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মধুমাস। জোস্না-ধোওয়া ফুট্‌ফুটে রাত্তির! ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে বসে আছি একটা মেহগনী গাছের নীচে, একদম চুপ্‌-চাপ। ফুর্‌ফুরে মলয়ানিলে, খেয়ালী মানুষ হেঁয়ালী রচনায় মশ্‌গুল তখন।

স্বপন দেখ্‌ছিলাম—স্বপ্ন, স্বপ্ন। যেন কোনো এক বিজন কাননে পথ ভুলে এসে পড়েছি আমি। সেই উপত্য-কার মাঝ দিয়ে, জ্যোস্না রাতে ঝর্ণা-বালা অভিসারে চলেছে, কুল্‌ কুল্‌ করে' গাইতে গাইতে! অপূর্ব্ব সুন্দরী পূর্ণ যুবতী অপ্সরীরা, তাদের ভোম্‌রা-কালো কোমর্‌-ছোঁওয়া চুল এলিয়ে, পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে নীল শাড়ীতে নিটোল শরীর ঢেকে হেলে-দুলে নিতম্ব দুলিয়ে, আস্তে ধীরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, ওই তৃণ-শ্যামল ভূমির ওপর দিয়ে দিয়ে! তাদের স্বর্ণ বর্ণ সুতনু গন্ধে নয়ন মুদে আস্‌ছিল আমার! হঠাৎ চোখ মেলে' দেখি, পরীরা কেউ নাই আর! তার বদলে দেখ্‌লাম, কাছেই একটা পাতাঘন বেনুবনের সুখ-সম্মিলনে যোগ দিয়েছে এক ঝাঁক্‌ কাক। তাদের সেদিনকার আলোচ্য বিষয় ছিল, এখানে বিক্রমাদিত্যের আমোল থেকে কোকিলদের এত আদর কেন? বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে, আমিও যোগ দিলাম গিয়ে, তাদের সম্পূর্ণ অলক্ষ্যেই। ওদের সভাপতি কেউ নেই, সভায় সবাই স্ব স্ব প্রধান! একটি জাঁদরেল দাঁড়কাক ঝট্‌পট্‌ পাখ্‌সাট্‌ মে'রে জোর গলায় বল্‌তে লাগ্‌লো, "বন্ধুগণ, রহস্য আবিষ্কার করেছি, শুনুন! শুনুন! লোকে যা-ই বলুক, একান্ত ভাবপ্রবণ কোকিলদের চাইতে আমরা আকারে বৃহৎ, সুতরাং মহৎ এবং গলাবাজিতেও পটু সুতরাং তাদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বটু বৈ কি!"

এই জাতীয় গভীর যুক্তিতর্কপূর্ণ বক্তৃতা শুনে' বায়স বর্গ বক্তার সকল কথা সমস্বরে সমর্থন কর্‌লো। অনেক বকাবকির পর স্থির হোলো এই, যে, দুনিয়াটা তাদেরই একচেটে ভোগের স্থান বটে, যেহেতু শ্রীমান্‌রাই নাকি একমাত্র বুদ্ধিমান্‌ ও বস্তুতান্ত্রিক; কোকিলরা নাকি ঠিক তা নয়। কথাটা পাকা করে' রাখার জন্যে, সভার সম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটি, বনরাজ্যের বর্ত্তমান বিহঙ্গরাজ গৃধ্র জরদগবের কাছে জানানোই স্থির হোলো শেষে।

কারণ, তার মতো নাকি সমজ্‌দার আর নেই এযুগে। তারপর অধিক রাত্রিসমাগমে সভা ভাঙ্‌লো সেদিন।

পরদিন প্রভাতে প্রবীণ পাকুড়বৃক্ষবাসী পরম ভাগবত শ্রীমন্মহারাজ বৃদ্ধ গৃধ্র সমীপে সমুপস্থিত হয়ে, কয়েকটি কাক তাদের পাকা প্রস্তাব নিবেদন কর্‌লে, একান্ত বিনীত ভাবে। তাদের বিনয়নম্র বচনে বিমুগ্ধ হয়ে, গৃধ্রদেব তাঁর গলার নীচেকার লাল গল-কম্বল সগর্ব্বে দুলিয়ে, সানন্দচিত্তে বল্‌লেন, "ভো, ভো, সেবকবৃন্দ! সাধু, সাধু! তোমাদের এ অতি উত্তম প্রস্তাব। বোকা কোকিলকুলকে বন থেকে নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য। ওরা বাংলাদেশের ছায়া-সুনিবিড় তরুর আব্‌ডালে, সরু সরু ডালে বসে', প্রায় বারমাসই কুহুধ্বনি করে' কেবলি কুআলাপ করে। এতে বাঙ্‌লার কল্পনাপ্রবণ কিশোর-কিশোরী যুবা যুবতীর অন্তরের অন্তরে কি-যেন কেমন একটা অভাবের আকুলতা জেগে ওঠে। ফলে মনোরাজ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেক পটোল্-চেরা ঢুলু ঢুলু আঁখি জোড়াতে, নিশিদিন বে-তার বার্ত্তা আনাগোনা করে। বুঝ্‌তে পার্‌ছ তো? এ ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার! তবে কিনা কাউকে তাড়াবার আগে, তাদের কি বক্তব্য আছে, তাও নিরপেক্ষভাবে শোন্‌বার ভাণ করা দরকার। নইলে— নাঃ, আর বল্‌বো না সে কথা। যাক্, এখন চট্ করে' উড়ে' গিয়ে, কোকিল-দের কয়েকজনকে আমার সাথে দেখা কর্‌তে, খবর দিয়ে এস দেখি, বাপু!"

"জো হুকুম" বলে' বায়সকুল-তিলকগণ শোঁ করে' উড়ে গেল, হুকুম তামিল কর্‌তে ঝট্‌পট্।

কাকের মুখে খবর পেয়ে, স্বভাবচতুর মিষ্টালাপী কোকিলদের এক প্রতিনিধি এসে, হাসি চেপে বিহঙ্গরাজের কাছে হাজির। ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে আদব্‌কায়দায় বদ্‌লে' নিয়ে, ডানে ও বাঁয়ে দু'বার গলা কাৎ করে', পরে সোজা হয়ে সে বল্‌লে, "হুজুর, কি হুকুম?"

গৃধ্র একটু ভারিক্কি চালে গলা লম্বা করে' বল্‌লেন, "ছাখো বাপু, তোমরা দুনিয়ার কারুরই তোয়াক্কা রাখো না! এটা আদপেই কেউ পছন্দ করে না, জেনো। মনে রেখো, স্বাধীনতাটা সকলেরই চক্ষুশূল জগতে। মাথা তুলেছ কি ডাণ্ডা মেরে' ঠাণ্ডা করে' রাখার ব্যবস্থা আছে এখানে। বনের ফল খেয়ে, গানে আকুল করে', নেহাৎ অকেজো বিলাসীর মতো, কেবলি উড়ে' বেড়াও কেন, বলো তো? দেখ্‌ছ না, কাক কেমন চালাক, বস্তুতান্ত্রিক এবং কেজো জীব? ওরা ভাগাড়ে দেখা করে আমার সাথে এবং কত মান রেখে চলে আমার! সে যাক্ তোমাদের এই উদ্ধত স্পর্দ্ধা ও গর্ব্বিত বেয়াদবি, বরদাস্ত কর্‌তে না পেরেই তো শেষে কৈফিয়ৎ তলব কর্‌লাম আমি। এখন বলো, বলো দেখি তোমাদের কি বক্তব্য আছে, শুনি!"

"আজ্ঞে, কৈফিয়ৎ? কৈফিয়ৎ? যারা কারুরই তোয়াক্কা রাখে না, তারাই কি আপ্‌নার দর্‌বারে ঘোর অপরাধী? তা বেশ! আর অকেজোই বা কেমন করে' হোলাম, তাও তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে! প্রকৃতির মুক্ত-করাস্‌ই আজ কেজো, আর তার গায়কপাখী কেউ নয় আজ? হা অদৃষ্ট! তবে শুনুন, পক্ষীরাজ! এই ভাব-প্রবণ হৃদয়বান্ জাতির অন্তরে আঘাত কর্‌বেন না, বলে' দিচ্ছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষুদ্র হ'লেও তুচ্ছ নই, জান্‌বেন! বসন্তের অগ্রদূত আম্‌রা! আম্‌রাই আকাশ বাতাস সঙ্গীতে মুখর করে' রাখি! আমাদের কুহুতানেই তরুলতিকারাও জেগে জেগে সবুজ স্বপ্ন দ্যাখে। প্রভু, সেই গান গাওয়াটাই কি এত দোষের হোলো শেষে? কণ্ঠরোধ কর্‌তে চান আপ্‌নি? ভয় পান এত? কি দুর্ব্বলতা! মনে রাখ্‌বেন, যে গাইতে না পারে, সে গান পছন্দ করে নিশ্চয়ই। যে গাইতেও পারে না, পছন্দও করে না, সে না পারে হেন কার্য্য নেই দুনিয়ায়! তারপর, বোকা আমরা, না— যারা চোখ বুঁজে' প্রকাশ্য চালের ভিতরে খাদ্য লুকিয়ে রেখে ভাবে, কেউ তা দেখ্‌লো না, আপ্‌নার আদরের সেই তোষামুদেরা? বল্‌তে হাসিও পায়, দুঃখও হয়—নিজেদের লুকানো সেই খাদ্য নিজেরাই খুঁজে' পায় না শেষে! চমৎকার বুদ্ধি বটে! তা ছাড়া, তাদের বুদ্ধির দৌড়্ দেখুন আরো। বরাবর তাদের বাসাতেই ডিম পাড়ি আম্‌রা, তাদেরকে দিয়েই তা' দেওয়াই আবার এবং ডিম ফোটার পর সেয়ানা শাবক যখন উড়ে' চলে' আসে তাদের বাসা থেকে, তখন আপ্‌নার বুদ্ধিমন্ত বায়সগণই হাঁ করে' পস্তান্

শুধু। তবুও বল্‌তে হবে তারা বুদ্ধিমান্ বৈকি! আরো শুনুন, যারা পোড়া পেটের দায়ে যেখানে যা পায় তাই খায়; খাঁ-খাঁ রোদে কা-কা রব করে' গেরস্তের প্রাণে ভয় বাড়ায়; তারাই বুঝি বেশী কেজো হোলো আপ্‌নার কাছে? ও, বুঝ্‌লাম, তারাই বেশী কেজো, যারা চেঁচায় বেশী! জয় হোক্ আপ্‌নার! তবু ভুলবেন না, ভুল্‌বেন না কথনো, যে, যমুনাকে উজান বহানো সম্ভব হয়েছিল প্রাচীন যুগে, শুধু সঙ্গীতেই। আর এই যুগে বিষধর সর্পও সঙ্গীতে নৃত্য করে, জান্‌বেন!"

এত কথা নীরবে হজম করার ক্ষমতা সকলের থাকে না বটে; বিহঙ্গরাজেরও তা ছিল না। তাই রাগ চেপে তিনি বিদ্রূপের স্বরেই বল্লেন, "আহে রসিক চূড়ামণি, তুমি তো বেজায় বাচালও দেখ্‌ছি! একটু চুপ করো না হে! আমাকেও বল্‌তে দাও কিছু। অত কথা একলাই এক নিশ্বাসে বল্‌লে চল্‌বে কেন?"

"আহা, বলুন! বলুন! বাচাল তো বটেই। তবে কি জানেন, বাচাল হ'লেও বেচাল নই। যারা শুধু সত্য-শিব সুন্দরের বন্দনাই গাইতে এসেছে, সেই সব বৈতালিকেরা বাচাল না হ'লে বাচাল আর কে-ই বা হবে, বলুন!" এই বলে' কোকিলটা বার কয়েক কুহুধ্বনি করার পর নীরব হোলো।

গৃধ্র কিছুক্ষণ চিন্তাকুল চিত্তে নীরব থাকার পর বল্‌লেন, "তাই তো হে! আমায় বড় ভাবিয়ে দিলে দেখ্‌ছি। আজ যেন মনে হচ্ছে, সবই রহস্যে ভরা! তোমার আওয়াজ মিষ্টি, মধুর দৃষ্টি! এ কী অনাসৃষ্টি ব্যাপার! বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি এখন, আমি দীর্ঘায়ু বটে, কিন্তু দৃষ্টি আমার ভাগাড়েই! তুমি স্বল্পায়ু অথচ দৃষ্টি তোমার আকাশেই! তাই তুমি এত শক্তি সঞ্চয় করেছ! নইলে এমন কেন হবে আজ! তোমার কুহুধ্বনিতে এই জীবন ভুবন, আকাশ বাতাস, যেন কল্প কল্পান্তকাল পর, স্বপ্নলোক থেকে, এক লহমায় নতুন রূপ ধরে' এসে দাঁড়ালো আমার সাম্‌নে!"

এবার কোকিলটা সোল্লাসে আবার কয়েকবার ঘন ঘন কুহুধ্বনি করার পর বল্‌লো, "যাক্, আপ্‌নার সারল্যে খুব মুগ্ধ হ'লাম আমি। আপনি মান্ধাতার আমোলের রাজতান্ত্রিক হ'লেও, এই গণতন্ত্রযুগের বৈশিষ্ট্যও ধর্‌তে পেরেছেন বেশ করে'। স্মরণ থাকে যেন, নিখিল মনের রংমহলের সেই কাঞ্চন-কুঞ্চিকা, কাঁচাদের কাছেই। আর আকারে বৃহৎ হ'লেই যে তাকে মহৎ হ'তে হবে, তার কোনো মানে নেই। যে প্রাণকে যত তুচ্ছ কর্‌তে পেরেছে, তার প্রাণই তত উচ্চ হয়েছে; এ স্বীকার কর্‌তেই হবে আপ্‌নাকে। মনে কিছু ভাব্‌বেন না, আম্‌রা বাঁচ্‌বার জন্তেই খেয়ে থাকি; শুধু খাওয়ার জন্তেই বেঁচে নই। বনজাত ফল মূলই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।"

ঠিক এমন সময়ে কোত্থেকে এক বোম্বেটে কাক কা-কা কর্‌তে কর্‌তে উড়ে' এসে জুড়ে' বস্‌লো সেখানে। সে গৃধ্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করে' শুধালো, "প্রভু, এত শীগ্‌গির বদ্‌লে গেলেন কেমন করে'? তাজ্জব ব্যাপার বটে!"

"বাস্তবিকই, উচ্চাভিলাষ মহত্ত্বের সিঁড়ি। নরকে রাজত্ব করার চেয়ে স্বর্গে দাসত্ব করাও ভালো!" এ রকম দু'চারটে স্বগতোক্তি করার পর উপস্থিত কাকটার দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে গৃধ্র বল্‌লেন, "দ্যাখো, এই কোকিলদের চিরতারুণ্য, সারল্য ও সর্ব্বোপরি মধুর কণ্ঠ আমাকে বড়ই আনন্দিত করেছে আজ! আর তোমরা? তোমরা পা:-চাটার দল শুধু তোষামোদ কর্‌তেই এসেছ দুনিয়ায়। যাও! আর এসো না আমার কাছে!" এই বলে' গৃধ্র ঠোঁট দিয়ে পিঠ্ চুল্‌কাতে লাগ্‌লো আপন মনে।

বায়সপুঙ্গব মনে মনে প্রমাদ গণে' মৃদু স্বরে বল্‌লো, "আপ্‌নি কোকিলদের দেশ্‌ছাড়া কর্‌তে চেয়েছিলেন; তা না, এখন দেখ্‌ছি সম্পূর্ণ তার বিপরীত!—কী জাদুই জানে এই কোকিল জাতটা!"

গৃধ্র আগের চেয়ে আরো বেশী গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "জাদুই জানুক্ আর যাই জানুক, বেশী বোকো না আর। এতকাল তো শেয়াল্-শকুন, কাক-কুকুরের কোলাহলে মত্ত ছিলাম; এখন শেষকালে না হয় একটু সঙ্গীতেই মন দেওয়া যাক্। যে সত্য বলে, সে শত্রু নয়; যে তোষামোদ করে, সে-ই পরম শত্রু। সুধার সন্ধান বলে' দ্যায় যারা, তারাই

তো অমৃতের অধিকারী! সেই তাদের কাছে তুমি আমি? কেউ নই! কিছু নই!"

দেখলাম, আয়সকৃষ্ণ বায়সবর বিরস বদনে বসে,' বিড়্ বিড়্ করে' বক্‌তে লাগলো, "ঘোর কলি! ঘোর কলি! অবাক্ কাণ্ড! বুড়োটার সত্য সত্যই ভীমরতি ধরেছে! আজ এক কথা, কাল আর এক কথা, পর্‌শু হয় তো সবই উল্টো! নাঃ এমন ধারা হ'লে কি পারা যায় আর! কি দুর্দ্দিনই পড়েছে! কুটিল কোকিলগুলোর দেখাদেখি মানুষের ছানাগুলোর পর্য্যন্ত মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে! কোনোখান্ থেকে একটা কাক ডাক্‌লো তো আর রক্ষে নেই। কেউ লাঠি, কেউ ধনুক, কেউ হয়তো বা ঢিল নিয়েই বেচারাকে তাড়া করে' দেশ্‌ছাড়া করবার উপক্রম কর্‌লো! বুড়োটাকে আশ্রয় করে' দিব্যি কাল কাটাচ্ছিলাম। এ কোত্থেকে এক উড়ো আপদ এসে সব মাটি কর্‌লো!"

কোকিলটা এতক্ষণ চুপ করেই শুন্‌ছিল সব। কাকের কথা শেষ হওয়ামাত্র, খুব একচোট্ কু-উ, কু-উ, কু-উ, কু-উ করে' গাইতে গাইতে, কোথায় যে ফুড়ুৎ করে' উড়ে' চলে' গেল, তার আর দিশে পেলাম না। আমি আনন্দ যে জোগায় প্রাণে, তার কাছেই সে গেল বুঝি!

ঠিক এই সময়েই এক বালিকা বন্ধু-কন্যা গান সুরু কর্‌লো, "যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী!"

তথ্‌খুনি বাস্তব-জগতের সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায়, স্বপ্নলোকের 'বিমল তটে', সৌন্দর্য্যশ্রীর 'রূপের হাটে' হঠাৎ হারিয়ে গেল, ওগো, হারিয়ে গেল আমার কল্পনার 'নীলকান্তমণি'!

রজনী হ'ল উতলা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

মেঘ্‌নার ঘোলা জল চিরে' ষ্টিমার সাম্‌নের দিকে চল্‌ছে; তার দু'পাশের জল উঠচে, পড়্‌চে, দুল্‌চে—তারপর ফেনা হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে' যাচ্চে, জলকন্যার নগ্নদেহের মত শুভ্র, দ্রাক্ষারসের মত স্বচ্ছ। একদিকে তরু-পল্লবের নিবিড় শ্যামলিমা, অন্য দিকে দূর দিগন্তরেখার অস্পষ্ট নীলিমা!

খুব জোরে বাতাস বইছে, কোন্ দিক থেকে, ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিনে। এখানে ওখানে ছোট ছোট নৌকাগুলো তীব্র বেগে ছুটে' চলেছে; ওরা সব পাল তুলে' দিয়েছে—বাউলের গাত্রবাসের মত নানা রঙের তালি-দেওয়া পাল। আমাদের ষ্টিমার্ এদের মধ্যে পরিচারিকা বেষ্টিতা রাণীর মত চল্‌ছে, সাম্‌নের দিকে চল্‌ছে।

এই মাত্র সূর্য্য অস্ত গেল। আমাদের সাম্‌নে পুব দিক—সন্ধ্যারাণীর লাজনম্র রক্তাভ মায়াটুকু আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—আমরা দেখ্‌ছি খুব মস্ত এক টুক্‌রা আকাশ—কুয়াশার মত অস্পষ্ট;—তার রংটা ঠিক চেনা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে, কে যেন তার মুখ থেকে সমস্ত রঙের ছোপ্ মুছে' নিয়েছে—অমন বিবর্ণ, বিশ্রী, ম্লান চেহারা আমাদের দেশে আকাশের বড় একটা হয় না।

আমরা দু'জন পাশাপাশি ডেক-চেয়ারে বসে' আছি, কারো মুখে কথা নেই। ওদিকে হয় তো রঙের হোলী-খেলা চল্‌ছে—কিন্তু আমাদের দিকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে এল—নিখিল গগন ব্যাপী এক নিষ্ঠুর নিশাচর পাখীর ডানার মত। নদীর ঘোলা রঙ্ কালো হ'য়ে উঠ্‌ল—বিবর্ণ আকাশের বুকে একটি তারার মনিকা ফুটে উঠ্‌ল।

আমি মুখ ফিরিয়ে ওর চোখের দিকে চাইলুম—আশ্চর্য্য! ওর চোখের কোনো রঙ্ আমি আজ অবধি ঠিক কর্‌তে পার্‌লুম্ না। ও যেন ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লায়! কখনো সন্ধ্যার এই ছায়াটুকুর মত ধূসর, কখনো ঐ সুদূর তারকার মত সবুজ, কখনো এই নদীর জলের মত কালো, কখনো দিগন্ত রেখার অপরূপ ভঙ্গিমার মত নীল।

নীলিমা ফিক্ করে' হেসে ফেল্‌লে—কি দেখ্‌ছ?

আমি তার মাথাটি কাছে টেনে এনে তার ঐ মায়াময়

চোখ দুটির উপর ঠোঁট রেখে নিঃশব্দে জবাব দিলুম। নীলিমার চোখ দুটি অবশেষে মুদ্রিত হ'য়ে এল। আমি এই অবসরে তার সারাদেহের উপর একবার ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে গেলুম। অপরূপ! বিশ্ব-শিল্পী তাঁর কত স্নেহ, কত সুধা, কত মমতা দিয়েই না এই নারী-দেহ গড়েছেন! এ যেন একটি বীণা—তা আপনি আপ্‌নি বাজে না—তাকে কোলে তুলে' নিয়ে কোনো সুর-রসিক সুর-সাধনা কর্‌বে, এই তার সার্থকতা। আমি আর পার্‌লুম না। সন্তর্পণে ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে তুলে নিয়ে বিপুল আবেগে জড়িয়ে ধরলুম।

নীলিমা আস্তে-আস্তে নিজেকে মুক্ত করে' নিয়ে তার চেয়ারটি আমার কাছে আরো একটু এগিয়ে এনে বল্‌লে—তোমার সেই কথাটা বল্‌বে না?

কোন্ কথাটা?

সেই যে একদিন বলেছিলে—মনে নেই?

এই উত্তেজনার ফলে তখনো সে একটু একটু কাঁপ্‌ছিল। ওর বুক তীব্র নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুল্‌ছিল—এক একবার ফুলে' ফুলে' উঠে' ব্লাউসের নির্দ্দিষ্ট বন্ধনের সীমা প্রায় অতিক্রম করে' যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল, যেন পাত্র বেয়ে সুরা উছ্‌লে পড়্‌তে চাচ্ছে!

আমি অনিচ্ছা সত্বেও সে দিকে চোখ রেখে বল্‌লুম, হুঁ।

নীলিমা ছোট মেয়ের মত আব্‌দারের সুরে বলে' উঠ্‌ল—না গো!

হঠাৎ যেন আমার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল! আমি গলার সুরটা যথাসম্ভব সহজ কর্‌বার চেষ্টা করে'-বল্‌লুম, আমার একটা অনুরোধ, নীলিমা—তুমি এই একটি কথা আমার কাছ থেকে কোনোদিন শুন্‌তে চেয়ো না।

ওর তরল আঁখির করুণ কামনা এক সঙ্গে মিনতি ও অভিযোগ জানালে।

আমি পাশের একটা ইজি-চেয়ারের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, আচ্ছা, বল্‌ছি। কিন্তু যখন বুঝ্‌বে, এ-কথাটা তোমার না শোনাই উচিত ছিল, তখন কিছু আমায় দোষ দিতে পার্‌বে না।

নীলিমা মাথাটি একটু পেছন দিকে হেলিয়ে বল্‌লে, আহা-তোমায় আবার দোষ দেবো! তুমি যে আমার বর!

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—বর বটে—কিন্তু এখনো তো স্বামী হই নি। আমি এখন যা বল্‌বো, তা শোন্‌বার পর বর হবার সম্ভাবনাই লোপ পেতে পারে।

সেই জন্যেই তো আরো বেশি ক'রে শুন্‌তে চাচ্ছি।

* • * •

ছ' বছর আগে আমি যখন প্রথম কল্‌কাতায় যাই, তখনো আমাদের সেখানে বাড়ী হয় নি। কাজে কাজেই ভবানীপুরের এক ব্যারিষ্টারের আতিথ্য স্বীকার কর্‌তে হ'ল। বাবার সঙ্গে ওঁদের পুরাণো বন্ধুত্ব ছিল নামও কি শোনা দরকার, নীলিমা?

নাম না হ'লে কি গল্প চলে?

অন্য কোনো গল্প না চল্‌তে পারে, কিন্তু আমার এ গল্প চল্‌বে।

আচ্ছা, বলে' যাও।

তখন গ্রীষ্মের ছুটি। কলেজ থেকে সবে আই, এ পরীক্ষা দিয়েছি। তখন আমার বয়স কাঁচা—দেহে মনে সবে নবযৌবনের রং ধরেচে। পৃথিবীর অনেক কিছুই তখন আমার কাছে রহস্যময় আর তার মধ্যে সব চেয়ে বড় রহস্য হ'ল—

নারী?

হাঁ, নারী। মনে রেখো, নীলিমা, তখন আমার সেই বয়স, যে বয়সে একটুখানি শাড়ির আঁচল দেখ্‌লেই বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, একটু চুড়ির রিনিঝিনি শোন্‌বার জন্যে মন্‌টা যেন তৃষিত হ'য়ে থাকে—যে বয়সে মানুষ অঙ্কশাস্ত্র ছেড়ে কাব্য চর্চ্চা সুরু করে, ফিজিক্সের এক্‌স্পেরিমেণ্টের চেয়ে বায়োস্কোপের অভিনয় বেশি পছন্দ করে।

সত্যি কথা বল্‌বো, নীলিমা? তখন যখনি যেখানে কাঁচা বয়েসের মেয়ে দেখ্‌তুম, ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে ওকে আমার নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসি তারপর—ওর সঙ্গে কথা কই, ওকে খুব আদর করি। আমাদের বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে মেয়ে ইস্কুলের গাড়ি আসা যাওয়া কর্‌তো—কত-দিন তাদের কারো সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় কর্‌বার ব্যর্থ

চেষ্টা আমি করেছি। আমার মগজের মধ্যে তখন অহর্নিশ যে সব চিন্তা ঘুরে' বেড়াতো, তা শুনলে এখন নিশ্চয়ই খুব খুসি হবে না।

আমার সেই সদ্য-জাগ্রত প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে আমি সে বাড়ীতে গিয়ে একেবারে অগাধ জলে পড়ে' গেলুম। বাবার বন্ধুটি তিন পুরুষ যাবৎ সাহেবী চালে থাকেন—তাঁর বাড়ীর সব কায়দাকানুন, রীতিনীতি আমার জন্মগত সংস্কারে কেমন বিসদৃশ ঠেকতে লাগ্‌ল! হাজার হোক্, খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে তো আমি! প্রথম প্রথম দু'চার দিন চল্‌তে, ফিরতে, পদে পদে এমন অস্বোয়াস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল, যেন আমি জলের মাছ, ডাঙ্গায় উঠে' এসেছি। তারপর, ক্রমে ক্রমে সবই এমন সয়ে' গেল, যেন আমি জন্মাবধি এই আব্‌হাওয়াতেই বেড়ে উঠেছি। সত্যের খাতিরে বল্‌তে হচ্ছে, দিনগুলো দিব্যি সুখেই কাট্‌ছিল।

আমি হঠাৎ চুপ্ করে' গেলুম। নদীর জল আর দেখা যাচ্ছে না—রাত্রির কালোয় সব কালো হ'য়ে গেছে। পূবের আকাশে যেখানে ছোট মণিকটি জল্‌ছিল, সেখানে অনেক তারা দেখা দিয়েছে; ওরা বুঝি অমরাবতীর দুয়ারে জ্যোতির্ম্ময়ী উষার ললাটের শিশির-বিন্দু! ডেকের উপর ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলো দুল্‌ছে। নীলিমার কণ্ঠ শুন্‌তে পেলুম—বলে' যাও না! চুপ্ করে রইলে কেন?

আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছি না, নীলিমা। একটু আলোতে এসো না! অন্ধকারে মুখ ঢেকে আছ কেন?

নীলিমা আমার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কোমল সুরে বল্‌লে, এই যে আমি। আমি তো দূরে সরে' যাই নি! তুমি হাত বাড়ালেই যে আমায় ছুঁতে পাও!

হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম। মনে হ'ল, যেন আমি জলের নীচে ডুবে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ উঠে' এসে আবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের অমৃত সেবন করছি। চেয়ারের হাতলের উপর ঝুঁকে পড়ে' তার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ নিয়ে বল্‌লুম, আঃ এই যে তুমি নীলিমা! এত কাছে! আমি তোমার কেশের সৌরভ পাচ্ছি, তোমার নীল চোখ দুটির মধ্যে আমার নিজের চোখের ছায়া দেখ্‌তে পাচ্ছি! আমার আর ভয় নেই—আঃ, নীলিমা, তুমি কত সুন্দর!

নীলিমা শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে, তারপর কি হ'ল?

দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত আমি হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত বল্‌তে লাগ্‌লুম—ও বাড়ী তো বাড়ী নয়—যেন রূপের মেলা! যেন ফুলের বাগান! তাতে কত ফুল ফুটে রয়েছে—তারা রূপের জৌলুশে চাঁদনী রাতকে হার মানিয়ে দেয়, সৌরভের মাদকতায় বাতাসকে মাতাল করে' তোলে! বলেইছি তো, আমার সেই সদ্য-জাগ্রত অসীম তৃষ্ণা নিয়ে আমি তাদের মধ্যে গিয়ে পড়্‌লুম। পড়ে' হঠাৎ যেন জীবন-সূত্রের খেই হারিয়ে ফেল্‌লুম।

গৃহস্বামীর নিজের সাতটি মেয়ে, তার মধ্যে তিনটি বিবাহযোগ্যা। তা ছাড়া, তাঁর দূর সম্পর্কিতা নব-যৌবনা আত্মীয়ার সংখ্যাও কম নয়। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মোট সংখ্যা বোধ হয় বারো কি তেরোতে পৌঁছেছিল। তখন রোজই একবার করে' গুন্‌তুম, তবু ঠিক সংখ্যাটা এখন আর আমার মনে নেই।

এই মেয়ের দল আমাকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেল্‌তে লাগ্‌লো। অনায়াসে নাচিয়ে বেড়ানোর পক্ষে আমার মত অমন সুপাত্র তারা বোধ হয় তখন পর্য্যন্ত পায় নি। তাছাড়া, আমার বাপের টাকা আছে, নিজের চেহারাটাও নেহাৎ মন্দ নয়—কেউ কেউ যে আমার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ অভিপ্রায় পোষণ না করতেন, এমনও মনে হয় না। মাঝে-মাঝে চাউনির বিজলী হেনে তাঁরা সে কথাটা আমায় জানিয়ে দিতেও ছাড়্‌তেন না। ওদের লীলাচাতুরী, কলা-ছলা-ছলনাই বা কত ছিল! কথা কইবার সময় মুখটাকে থাম্‌কা-খুব কাছে এনে হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া, চল্‌তে চল্‌তে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে চাবির গোছা দুলিয়ে আমার গায়ে ছোট্ট চড় মারা, ড্রেসিং রুম থেকে চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে হঠাৎ দরজার আড়াল থেকে আমায় ডেকে নিয়ে কানে কানে একটা নেহাৎ অর্থহীন কথা বলে চট্ করে' সরে' যাওয়া—এ সব তো ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার! সন্ধান যে একটিরও ব্যর্থ হয় নি, তা আমি স্বীকার করবো। এদের কৌতুক-লীলার মধ্যে পড়ে' আমি যেন একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গেলুম—কি যে হচ্ছে তা ঠিক ভালোমত বোঝবার চেষ্টাও করলুম না। সে উদ্দাম বন্যায় নিজকে

একেবারে নিঃসহায় করে' ভাসিয়ে দিলুম। কি করবো বলো? তখন তো আমার নিজের ওপরে কোনো হাত ছিল না।

* * * *

গলার স্বর হঠাৎ নামিয়ে ফেলে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, আরো শুন্‌তে চাও?

নীলিমা রুদ্ধস্বরে জবাব দিল—চাই।

আমার কল্‌কাতায় আস্‌বার পর দিন-কতক কেটে গেছে। একদিন রাত্রে খুব আস্তে আস্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খুব আস্তে-আস্তে—কি রকম, জানো? মধ্য-রাতে দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ যেমন ধড়্‌ফড়্‌ করে' জেগে উঠে খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে, সে রকম নয়। ভোরবেলা শোবার ঘরে কেউ কথা বল্‌লে বা চলাফেরা কর্‌লে যেমন তা প্রথম স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়—তারপর ধীরে-ধীরে বাস্তব হ'য়ে উঠে মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে যায়—সে জেগে উঠে চুপি চুপি হেসে নিয়ে আবার চোখ বুজে পাশ ফিরে' শোয়, অনেকটা সেই রকম। খুব আস্তে আস্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ মেলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালুম—তাকাতেই মনে হ'ল—

মনে হ'ল, প্রকৃতি চল্‌তে-চল্‌তে যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে—যেন উৎসুক আগ্রহে কার প্রতীক্ষা কর্‌ছে। নাটকের প্রথম-অঙ্কের যবনিকা উঠবার আগ-মুহূর্ত্তে দর্শকরা কেমন হঠাৎ স্থির, নিঃশব্দ হ'য়ে যায়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃসাড় হ'য়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিমিকি খেল্‌চে না, গাছের পাতা আর কাঁপ্‌চে না, রাত্রে যে সমস্ত অদ্ভুত, অকারণ শব্দ চার্‌দিক থেকে আস্‌তে থাকে, তা যেন কার ইঙ্গিতে মৌন হ'য়ে গেছে, নীল আকাশের বুকে জ্যোছ্‌না যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—এমন কি, বাতাসও যেন আর চল্‌তে না পেরে ক্লান্ত পশুর মত নিস্পন্দ হ'য়ে গেছে—ওঃ নীলিমা, অমন সুন্দর, অমন মধুর, অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শান্তি আর আমি দেখি নি। আমি নিজের অজানিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে' উঠলুম—কেউ আস্‌বে বুঝি?

অম্‌নি আমার ঘরের পর্দ্দা সরে' গেল। ঘরের বাতাস মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল, আমার শিয়রের উপর যে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল, তা যেন একটু নড়ে'-চড়ে' সহসা নিবে গেল—আমার সমস্ত দেহ মন এক স্নিগ্ধ অবসাদে শ্লথ হ'য়ে এল—আমি যেন কিচ্ছু দেখ্‌ছি না, শুন্‌ছি না, ভাব্‌ছি না—এক তীব্র মাদকতার ঢেউ এসে আমাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল—তারপর—

নীলিমা, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? তোমার চুলের ফুলটি যে মাটিতে লুটোচ্চে! তোমার আঁচল যে ধূলোয় খসে' পড়েচে! নীলিমা—

তারপর?

আজ এতদিন পর সবি কেমন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। যেন অনেক দিন আগে দেখা স্বপ্ন—হাজার বছর, লক্ষ বছর আগেকার—গত জন্মের স্মৃতি! আমার কি তখন চৈতন্য ছিল? আমি কি তখন পরিষ্কার ভাবে সব বুঝ্‌তে পেরে-ছিলুম? কি জানি! কিন্তু আজকে কিছুই সত্য বলে' মনে হচ্ছে না—সব আব্‌ছায়া, বাসি ফুলের মত ম্লান, অশ্রুপূর্ণ চোখে দেখা জিনিষের মত ঝাপ্‌সা!

হাঁ। তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খস্‌খসে জিনিষ এসে পড়্‌ল—তার গন্ধে আমার সর্ব্বাঙ্গ রিম্‌ঝিম্‌ করে' উঠ্‌ল। প্রজাপতির ডানার মত কোমল দু'টি গাল, গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত দু'টি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয় হ'য়ে নেমে এসেচে, চারুকণ্ঠটি কি মনোরম, অশোক গুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দু'টি বক্ষ—কি সে উত্তেজনা, কি সর্ব্বনাশা সেই সুখ, তা তুমি বুঝ্‌বে না, নীলিমা।

তারপর ধীরে-ধীরে দু-খানি বাহু লতার মত আমায় বেষ্টন করে' যেন নিজকে পিষে চূর্ণ করে' ফেল্‌তে লাগ্‌লো—আমার সারাদেহ থেকে-থেকে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—মনে হ'ল, আমার দেহের প্রতি শিরা বিদীর্ণ করে' রক্তের স্রোত বুঝি এখুনি ছুট্‌তে থাকবে!

বিপুল উত্তেজনার পর যে অবসাদ আসে, তা'র মত ক্লান্তিকর বোধ হয় জগতে আর কিছু নেই। বাহু বন্ধন ধীরে-ধীরে শিথিল হ'য়ে এল।

সত্যি বলচি, তখন আমার মুহূর্ত্তের তরেও মনে হয় নি যে, এ ঘটনার মধ্যে কিছু আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক আছে বা থাকতে পারে। আমারো মনের মধ্যে তখন কৌতূহল প্রবল হ'য়ে উঠল—এ কে? কোন্‌টি? এ-ও-না সে? তখন সব নামগুলো জপমালার মত মনে-মনে আউড়ে গেছলুম, কিন্তু আজ একটি নামও মনে নেই।—সুইচ্‌ টিপবার জন্যে হাত বাড়াতেই আরেকটি হাতের নিষেধ তার উপর এসে পড়ল। আমার কণ্ঠের জড়তা কেটে গিয়েছিল—বেশ সহজ ভাবেই বললুম—তোমার মুখ কি দেখাবে না?

চাপা গলায় উত্তর এল—তার দরকার নেই।

কিন্তু ইচ্ছে করচে যে!

তোমার ইচ্ছে মেটাবার জন্যেই তো আমার সৃষ্টি! কিন্তু ঐটি বাদে!

কেন? লজ্জা?

লজ্জা কিসের? আমি তো তোমার কাছে আমার সমস্ত লজ্জা খুইয়ে দিয়েছি।

পরিচয় দিতে চাও না?

না, পরিচয়ের আড়ালে এ রহস্যটুকু ঘন হ'য়ে উঠুক।

আমার বিছ'নায় তো চাঁদের আলো এসে পড়েছিল—

আমি জানালা বন্ধ করে' দিয়েছি।

ও, কিন্তু আবার তো খুলে' দেওয়া যায়।

তার আগে আমি ছুটে' পালাবো।

যদি ধরে' রাখি?

পারবে না।

জোর?

জোর খাটবে না।

একটু হাসির আওয়াজ এল। শীর্ণ নদীর জল যেন একটুখানি কূলের মাটি ছুঁয়ে গেল।

তুমি যে-টুকু পেয়েছ, তা নিয়ে কি তুমি তৃপ্ত নও?

যা চেয়ে নিই নি, অর্জ্জন করি নি, দৈবাৎ আশাতীত-রূপে পেয়ে গেছি, তা নিয়ে তো তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথা ওঠে না।

তবু?

তোমার মুখ দেখতে পাওয়ার আশা কি একেবারেই বৃথা?

নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্যেই?

না, তা হবে কেন? তা যে অফুরন্ত সুধার আধার।

তবে?

আমি হার মানলুম।

আমি আবার দু' হাত বাড়িয়ে ওর লতায়মান দেহটি সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম। নিঃশব্দে ও আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়ল।

আমাদের মাথার উপরে কোথায় যেন চাঁদ উঠেছে! নদীর কালো বুক হলদে হয়ে উঠেছে—এখানে-ওখানে রূপোর ছিটা! নীলিমা বুকে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ও কি আমার সমস্ত কথা শুনেছে! ওর ঠোঁট দুটি পাপড়ির মত শুকিয়ে গেছে। ও আমার পানে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? কি যেন বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। কিছু জিজ্ঞেস্ করতেও ভয় করছে। না জানি ও কি বলে বসে! জলেতে জ্যোছনায় মিলে যেখানে ছুটোছুটি করছে, সেই দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালুম। ধোঁয়াগুলো উঠছে, নীল, মসৃণ সরু রেখার মত। ষ্টিমারটা কি বিশ্রী শব্দ করছে। ও কি অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে? কোনো-খানেই কি থামবে না? নীলিমার মুখখানা যে মরুভূমির উপরকার আকাশের মত শুষ্ক হয়ে উঠছে!

নীলিমা ব'ল, এইখানেই কি তোমার গল্প শেষ হ'ল?

মাষ্টারের কাছে ছাত্রের পড়া-বলার মত করে জবাব দিলুম—না, এইখানে সবে সুরু হ'ল। কিন্তু এর শেষেও কিছু নেই—এই শেষ ধরতে পারো।

নীলিমা আর কিছু বললে না। আমি বলে যেতে লাগলুম—সেই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জেগে দেখি, বিছানার উপর রোদ এসে পড়েছে। সমস্ত বালিশে, চাদরে—সারা বিছানায় গত রজনীর তার গায়ের সৌরভটুকু স্নিগ্ধ-স্মৃতির মত লেগে রয়েছে।

পরের দিন সকালে আমার কি লাঞ্ছনাটাই না হ'ল! মৌমাছির মত ওরা সব চারদিক দিয়ে আমায় ঘিরে বসল—

রোজকার মত ওদের কথার স্রোত বইতে লাগলো জল-তরঙ্গের মত মিষ্টি সুরে, ওদের হাসির রোল ঘরের শান্ত হাওয়াকে আকুল করে ছুটতে লাগলো, হাত নাড়বার সময় ওদের বালা চুড়ির মিঠে আওয়াজ রোজকার মতই বেজে উঠল—সবাকার মুখই ফুলের মত রূপময়, মধুর মত লোভনীয়!—কিন্তু আমার কণ্ঠ মৌন, হাসির উৎস অবরুদ্ধ। গত রাত্রির পাগলামির চিহ্ন আমার মুখে, আমার চোখের কোণে লেগে রয়েছে মনে করে আমি চোখ তুলে কারো পানে তাকাতেও পারছিলুম না। তবু একবার লুকিয়ে প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলুম—যদিই বা ধরা যায়। যখন যাকে দেখি, তখনই মনে হয়, এই বুঝি সেই! যখনি যার গলার স্বর শুনি, তখনই মনে হয়, কাল রাত্রিতে এই কণ্ঠই না ফিস্‌ফিস্ করে আমায় কত কি বলছিল! অথচ কারো মধ্যেই এমন বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন দেখলুম না, যা দেখে, নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায়। সবাই হাস্‌চ, গল্প করছে। কে? কে তা হ'লে? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? তখন স্বপ্ন বলে সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করতে পারতুম, যদি না তখনো আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা গভীর অবসাদ অপ্রকাশ্য বেদনার মত জড়িয়ে থাকতো।

আমার অবস্থা দেখে একজন বলে উঠলেন—আপনার কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি নাকি?

আরেকজন বললেন—তাই তো! আপনার চেহারা যে ভারি শুকনো দেখাচ্ছে!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমি তাড়াতাড়ি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম। এই তো সুযোগ! এ-সময়ে কারো মুখ যদি একটু শুকিয়ে যায় বা একটু লাল হয়ে ওঠে—যদি কেউ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা একটু বিশেষ ভাবে হাসতে থাকে, তা হলেই তো আর বুঝবার কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু সবাই ঠিক একভাবে ঠোঁটের এক কোণে একটু হাস্‌চে—কাউকে আলাদা করে' নেবার জো নেই। আমার মনে হ'ল, ওরা সবাই যেন আমার গোপন রহস্য জেনে ফেলেছে, যেন সবাই মিলে পরামর্শ করে' আমায় নিয়ে একটু রসিকতা করছে। কিন্তু এ কোন্-ধারা রসিকতা? আমি কি একটা খেল্‌বার পুতুল—না, কি? তারপর প্রত্যেকের প্রত্যেকটি চাউনি, প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী আমার এই সন্দেহকে দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর করে' তুল্‌ল—ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম বোধ হ'ল, আমি অভদ্রের মত কাউকে কিছু না বলে ছুটে বাগানে চলে গেলুম—একটু খোলা হাওয়ায় থাক্‌বার জন্য।

দুপুর পর্য্যন্ত আমার সময়টা যে কি ভাবে কেটে গেল, তা আর মনে করতে ইচ্ছে করছে না। রাস্কল্‌নিকফ্‌ বোধ হয় খুনী হ'য়েও অমন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে নি। উঠ্‌তে, বস্‌তে, চল্‌তে ফির্‌তে আমার গায়ে সর্ব্বদা যেন কাঁটা ফুট্‌তে লাগ্‌ল। কারো সঙ্গে কথা কইতে পার্‌লুম না—যখনই যে কাছে আসে, মনে হয়, এই বুঝি সে!

প্রত্যেকের সম্বন্ধেই সন্দেহ অন্যের চেয়ে দৃঢ়তর হ'য়ে ওঠে। আমার ঘরের মধ্যেও থাক্‌তে পারি নে! মেঝের কার্পেট্‌ থেকে দেয়ালের চুণকাম পর্য্যন্ত সব যেন আমার দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাস্‌তে থাকে,—অথচ, সবাকার দৃষ্টি হ'তে নিজকে লুকিয়ে রাখাও তো চাই! কাজের অছিলা করে সারাটা দিন কলকাতার রাস্তাময় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লুম।

কিন্তু দুপুরের পর থেকে আর এক নতুন সংশয় আরম্ভ হ'ল। আজ রাত্রেও কি সে আস্‌বে? আমার মধ্যে যা কিছু ভদ্র ও মার্জ্জিত ছিল, সমস্ত একযোগে বলে' উঠ্‌ল—না। আর আস্‌বে না। আর, বাঁচা গেল। আমার আহত দর্প বল্‌লে—যাক্‌, অপমান থেকে রেহাই পেলুম। কিন্তু আমার পিতৃ-পুরুষের রক্ত অস্থির হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—না, আস্‌বে, আস্‌বে, নিশ্চয়ই আস্‌বে। যাও, ফেরো—বাসায় ফেরো।

আমার মন ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ কর্‌লে—না, যাবো না।—নীলিমা, তুমি আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করো? Jane Eyre বহুদূরে থেকেও তার প্রিয়তমের আকুল আহ্বান শুন্‌তে পেয়েছিল, এ তুমি সম্ভব মনে করো?...এখন অবশ্য আমিও করি না—কিন্তু তখন—তখন আমার বাস্তবিক মনে হয়েছিল, সমস্ত ইঁট্‌-পাট্‌কেলের বেড়া যেন স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে—আমি তার ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি, কে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকচে রাস্তার সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে

একটি ক্ষীণ, মধুর আহ্বান আমার কানে ভেসে আস্‌ল—সে কি অদ্ভুত, কি বিপুল, কি ভয়ানক, নীলিমা, তা মনে করে এখনো আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে। আমি ছুটে গেলুম—দিনের আলো নিভে যাবার আগে—ছুটে ফিরে গেলুম আমার সেই ঘরে—সে আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না, নীলিমা।

আমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ হ'য়ে এলো। নীলিমার মুখের পানে তাকাতে সাহস হচ্ছে না—ইচ্ছে করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। সোজা সামনের দিক থেকে বাতাস আস্‌ছে, আমার চুল উড়ে'-উড়ে' কপালে এসে পড়্‌ছে—নীলিমার শাড়িও বোধ হয় নড়্‌ছে—দেখতে পাচ্চি না, কিন্তু বুঝতে পার্‌ছি। ও চেয়ারের দুই হাতলে হাত রেখে স্থির হ'য়ে বসে' আছে—নিঃশ্বাস পড়ছে না, চোখের পলক নড়্‌চে না। ষ্টিমারের গতি বোধ হয় ঘুরে গেছে—একাদশীর চাঁদের আধখানা আমার চোখে পড়্‌ছে, কামধেনুর স্বর্ণশৃঙ্গের মত। ডাইনিং সেলুনে বসে সাহেব মেমগুলি ডিনার খাচ্ছে—মদের বোতল খোলার শব্দ, সোডার বোতল ভাঙার শব্দ, কাঁটা চাম্‌চে প্লেটের শব্দ, ভাঙ'-ভাঙা কথাবার্ত্তার টুক্‌রো—সব ভেসে আস্‌ছে—সব কান পেতে শুন্‌চি। নীলিমা ষ্টিমারে ডিনার খেতে ভারি ভালোবাসে—ওকে কি জিজ্ঞেস কর্‌বো? কি জানি! আঘাত যা দেবার, তা তো দিলুম, এখন কি অপমানেরও কিছু বাকি রাখ্‌বো না? অথচ আজকেই সূর্য্য অস্ত যাবার আগে ওকে বল্‌ছিলুম, নীলিমা, তোমার মত কাউকে কখনো ভালোবাসি নি।

অনেক দূরে দিগন্তরেখার কোলে কিসের একটা আলো জ্বলে উঠ্‌ল! আরেকটা! আরেকটা! পাঁচ—নয়—তেরো—আর গুণ্‌তে পার্‌ছি না। কিসের এত আলো! অতল-শায়ী বাসুকীদেব কি আজ চিরন্তন শয্যাতল ছেড়ে তাঁর সহস্র মাথায় সহস্র মণি জ্বালিয়ে উঠে এলেন? না, এ বুঝি গোয়ালন্দ ষ্টিমার ঘাটের আলো! ষ্টিমারের গতিও কমে' আস্‌ছে—আমরা যে প্রায় এসে পড়্‌লুম। আর তো সময় নেই!

অকস্মাৎ ক্ষিপ্তের মত বলে উঠ্‌লুম—নীলিমা, এতখানি যখন শুন্‌লে, তখন দয়া করে বাকীটুকুও শুন্‌বে না কি? এইটুকু দয়া আমায় করো, নীলিমা। বাকীটুকু না বল্‌তে পার্‌লে আমি পাগল হ'য়ে যাবো।

—বলো।

চম্‌কে উঠ্‌লুম। এ কণ্ঠস্বর যে একেবারে অপরিচিত। এ কি নীলিমার?

ভেবেছিলুম, সমস্ত রাত জেগে থাক্‌তে হবে। মনের সে অবস্থায় সচরাচর ঘুম আসে না। কিন্তু অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনার ফলেই হোক্ বা পায়ে হেঁটে সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর দরুণ শারীরিক ক্লান্তিবশতই হোক্, সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমে আমার সারা দেহ ভেঙে গেল—একেবারে নবজাত শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। তারপর—আবার আস্তে-আস্তে ঘুম ভেঙে গেল—আবার প্রকৃতির সেই স্থির, প্রতীক্ষমান, নিষ্কম্প অবস্থা দেখ্‌তে পেলুম—আবার আমার ঘরের পর্দ্দা সরে গেল—বাতাস সৌরভে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল—জোছ্‌না নিবে গেল—আবার দেহের অণুতে অণুতে সেই স্পর্শসুখের উন্মাদনা—সেই মধুময় আবেশ—সেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট ক্ষইয়ে ফেলা—সেই বুকের উপর বুক ভেঙে দেওয়া—তারপর সেই স্নিগ্ধ অবসাদ—সেই গোপন প্রেম-গুঞ্জন—তারপর ভোরবেলায় শূন্য বিছানায় জেগে উঠে প্রভাতের আলোর সাথে দৃষ্টি বিনিময়!

আবার দুপুর পর্য্যন্ত এই রহস্যময়ী গোপন চারিণীর পরিচয় জান্‌বার অদম্য লালসা আমাকে যেন টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌তো—তারপর, বিকেল হ'তেই সেই নিষ্ঠুর কামনা, সেই অলঙ্ঘনীয় আহ্বান, সেই অপরাজেয় আকর্ষণ! দিনের পর দিন—রাতের পর রাত কাট্‌তে লাগ্‌লো। এর মধ্যে আমার চেহারা এত বদ্‌লে গেল যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। দেহের সে লাবণ্য শুকিয়ে গেছে, সে স্নিগ্ধশ্রী ঝরে' পড়ে' গেছে। কিন্তু তখন আমার স্বভাবতঃ শান্ত চোখদুটি নিরন্তর কোন্ উৎকট তৃষ্ণায় হিংস্র পশুর মত ধক্‌ধক্ করে জ্বল্‌তো। সে ভীষণ চাউনি মনে হ'লে এখনো আমার গা শিউরে ওঠে।

ক্রমে আমার এমন অবস্থা হ'ল যে আমার সমস্ত